হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঊর্দ্ধবাহুর্ব্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।

মহাভারত

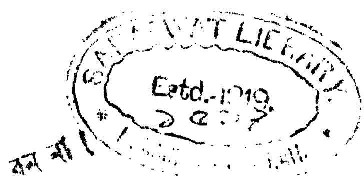
১৯৩৩

প্রকাশক—
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র
৪।৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৫৬৪

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস।
প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়।
৭১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী পত্র।



হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চদেবতা।

হিন্দুরা পঞ্চদেবতা-উপাসক বলিয়া একটি কথা আছে, কথাটি সত্য, তবে ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে এই পঞ্চদেবতাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই হইল পাঁচটি প্রধান সম্প্রদায়। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে মহাভারত হইতে বিশেষ

কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, সৌর পূজা-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, পরে দেখিব। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ব্যতীত আর যে চারিটি সম্প্রদায় উপরে উল্লিখিত হইল, তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিষয় আছে। ঐ চারিটি সম্প্রদায় প্রথমে অবৈদিক সম্প্রদায় ছিল, পরে বৈদিক সম্প্রদায়ে পরিবর্ত্তিত হয়; এইরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ প্রশ্নটি বিস্তারিত ভাবে বিচার করিবার এ স্থান নহে; তখন বিপ্লবের ফলে অবৈদিক ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সকল, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; সেইরূপ, কতকগুলি পন্থা, যাহারা প্রথমে অবৈদিকদিগের পন্থা ছিল, ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদিগের মতে পরিবর্ত্তিত হইল, শিবপূজা বোধ হয় তাহার একটি উদাহরণ। মহাদেব প্রথমে ছিলেন যজ্ঞবিরোধী, তাঁহার এক নাম মখঘ্ন (অর্থাৎ যজ্ঞঘ্ন); ৫৩—৩৩ অঃ কর্ণ। 'বৌদ্ধাবতাররূপেণ বা যজ্ঞঘ্নঃ'; ৫২—১৭ অঃ অনু। বুদ্ধদেব মহাদেবের অবতার ছিলেন, তাঁহার নাম যজ্ঞারি; ১০১—১৭ অঃ অনু। মহাদেব নিশাচরদিগের অধিপতি; ভূত অর্থে প্রেত; ৫৮—১১৭ অঃ ভীষ্ম। তিনি মাতৃপতি, মা=জ্ঞান, তৃ—যে নাশ করে; মাতৃকারা রাক্ষসী ছিল; মহাদেব গণপতি; ৪৮—২০১ অঃ দ্রোণ।

মহাদেবের মুখ হইতে অনিল উৎপন্ন হয়; ১২২—২০১ অঃ দ্রোণ।

বায়ুর্বৈ গৌতম; ১৪—৯০ অঃ আদি টীকা।

বারুণো বা অশ্ব ইতি শ্রুতেঃ; ৩৬—৪৬ কর্ণ টীকা।

মহাদেব দেবাসুরনমস্কৃত, দেবাসুরগণাশ্রয় (১৪৫—১৭ অঃ

অনু), এবং দেবাসুর-বরপ্রদ (১৪৬—১৭ অঃ অনু)। ভূত প্রেত হইল তাঁহার অনুচরগণ।

মহাদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যখন মরুত্ত রাজা তাঁহাকে যজ্ঞে পুরোহিত হইতে অনুরোধ করেন, তিনি তাঁহার যাজন কার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; ৫১—২২৩ অঃ আদি। মহাদেব শ্মশানবিহারী, শ্মশানে যক্ষ রাক্ষস থাকে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে শূদ্রের পদবিক্ষেপস্থানকে শ্মশান বলে; শ্মশান হইল কলিসঙ্কুল শ্মশান; ৪৯—৭২ অঃ উদ্। তণ্ডীকৃত মহাদেবের স্তব বেদ হইতে বিভিন্ন; ৩—১৭ অঃ অনু। মহাদেবের এক নাম রুদ্র; রুদ্র অর্থে দেবানামপি রোদয়িতা, যিনি দেবগণকে রোদন করান, মহাদেবের দুই মূর্ত্তি, ঘোরা ও শিবা। মহাদেব দৈত্যগণের সহায়।

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে শৈব মত এক সময়ে যজ্ঞপন্থাবিরোধী ও অবৈদিক সম্প্রদায়ের মিত্র ছিল; পরে এ ভাব দূর হয়। রাবণ মহাদেবের আশ্রিত, মহাদেব 'ধনপতেঃ সখা'; ৩৮—১০ অঃ সভা। কুবের যক্ষ ছিলেন। দৈত্যেরা বলিল—পূর্ব্বে আমরা মহেশ্বর হইতে তোমাকে (দুর্য্যোধনকে) লাভ করিয়াছি; ৬—২৫১ অঃ বন। দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাদের কথা মহাভারতে নানাস্থানে আছে। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন যজ্ঞপন্থার সহায়, এই বিরোধে পরস্পরের যুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের

গলা টিপিয়া ধরিলেন, তাহাতে তাঁহার গলা নীলবর্ণ হইল, সেই কারণে তাঁহার নাম নীলকণ্ঠ। পক্ষান্তরে মহাদেব ত্রিশূলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল তাড়না করিলেন, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ ত্রিশূলাঙ্কিত হইল, সেই লাঞ্ছন বিষ্ণু বক্ষে ধারণ করেন। এই বিবাদের পর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব উভয়ের মধ্যে মিত্রতাস্থাপন হয়, এক অপরকে স্তব করেন ও উভয় উভয়কে নমস্কার করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, শৈব মতের সহিত বৈষ্ণব মতের সমন্বয় হইল। পরে স্থির হইল—যিনি হরি, তিনিই মহাদেব। নারায়ণের বিশেষণ হইল শম্ভুনারায়ণ; ১৬—৩৬ অঃ সভা। শিব হইলেন ব্রহ্মার পুত্র; ৪৫—৫০ অঃ দ্রোণ; অর্থাৎ শৈবমত বেদ হইতে উৎপন্ন।

রুদ্রো নারায়ণশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধা কৃতম্।

২৭—৩৪১ অঃ শান্তি।

রুদ্র এবং নারায়ণ দ্বিধাকৃত একসত্ত্ব। পরে মহাদেব হইলেন দেবরক্ষক; ৩৮৬—১৪ অঃ অনু; এবং দেবগণের গতি; ১০—৭ অঃ সৌপ্তিক।

দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনায় যজ্ঞপন্থা লইয়া একটি সামাজিক বিপ্লবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দক্ষ ছিলেন প্রচেতা, প্রাচে দেশায় অততি যজ্ঞার্থং গচ্ছতি ইতি প্রাচেতস।

উমা, দুর্গা, কালী, প্রকৃতি এসকলেরই উল্লেখ মহাভারতে আছে। মহাদেব-কল্পনায় যেমন অবৈদিক ও বৈদিক উভয় পন্থার সংমিশ্রণ

দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্গাপ্রভৃতি কল্পনায়ও সেইরূপ মিশ্রণের ভাব প্রকাশ পায়। যে জ্যোতিষিক ঘটনা লইয়া দুর্গাপূজার তিথি নিশ্চিত হয়, সে ঘটনা খৃষ্টাব্দের বার শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। দুর্গাপূজা পদ্ধতি কবে হইতে চলিতেছে, তাহা বলা কঠিন, বোধ হয় বৌদ্ধ যুগের সময়ে দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়। মহাভারতের সময় দুর্গা-কল্পনার মধ্যে যথেষ্ট অবৈদিকতার ভাব প্রবেশ করিয়াছে; ২৩ অঃ ভীষ্ম। অর্জ্জুন দুর্গাকে অনেক প্রকার নাম দিয়া স্তব করিতেছেন; ২৩ অঃ ভীষ্ম। কালী, কপালী, ভদ্রকালী, চণ্ডী, চণ্ডা, করালী, গোপেন্দ্র-কন্যা, নন্দগোপকুলোদ্ভবা, কৌশিকী, উমা, শাকম্ভরী, বেদশ্রুতি, মহাপুণ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, দুর্গা, স্বাহা, স্বধা, বেদমাতা, শিখিপুচ্ছধ্বজধারিণী, পীতবাসিনী, কৈটভনাশিনী ইত্যাদি। অর্জ্জুন দুর্গাকে উমা বলিয়া স্তব করিতেছেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাও বলিতেছেন। কেনোপনিষদে উমার নাম ব্রহ্মবিদ্যা; "উমা চ ব্রহ্মবিদ্যা" তাঁহাকে বেদশ্রুতি বেদমাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। মহাভারত যে একখানি রূপককাব্য ও ব্যাসদেব যে কল্পিত নাম এই উভয়ের সুন্দর উদাহরণ এই স্থানে পাওয়া যায়। বেদব্যাসের মাতার নাম হইল সত্যবতী; তাঁহার অপর নাম কালী; ১৯—১৪৭ অঃ উদ্, গন্ধকালী; এই কালীর পুত্রের নাম বেদব্যাস। আর দুর্গার নাম বেদমাতা। একপক্ষে কালী অর্থে পরমেশ্বর; *কালো হি পরমেশ্বরঃ।* *কাল ও কালী একই কথা,* যেমন পুর ও পুরী, নদ ও নদী ইত্যাদি। এই সকল শব্দ হইতে দুর্গা-কল্পনায় বৈদিক ভাব প্রকাশ হয়। অপর পক্ষে দুর্গার নাম চণ্ডী; কপালী, চণ্ডা, করালী, কৌশিকী, তাঁহার আরও এক নাম আছে মাতঙ্গী। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি হইতে অবৈদিকতার ইঙ্গিত

আসে। চণ্ডাল ও চণ্ডী শব্দ এ উভয়েই চণ্ড শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। চণ্ড শব্দে আসুরিক অর্থাৎ অবৈদিকতার ভাব আসে। চণ্ড নামে এক দৈত্য ছিল, আর এক জন চণ্ড দৈত্য শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর ছিল। চণ্ড শব্দের উত্তর ঈ করিয়া চণ্ডী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদ্ভিন্ন দুর্গার নাম কৌশিকী। বেদ-অপহরণকর্ত্তা বিশ্বামিত্রের নাম কৌশিক, বুদ্ধদেব কুশী নগরে দেহত্যাগ করেন। দুর্গার আর এক নাম মাতঙ্গী; মাতঙ্গ চণ্ডালের সহিত পূর্ব্বে আমাদের অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহাদেবের পরে একত্ব হইল, সেইরূপ কৃষ্ণের সহিত দুর্গার একত্বের অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষ্ণ হইলেন যশোদার পুত্র, দুর্গা হইলেন যশোদার কন্যা; ২—৬ অঃ বিরাট। "যশোদাগর্ভ-সম্ভূতাং" তিনি নন্দগোপকুলে জাতা "কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্"; ৩—৬ অঃ বিরাট। "বাসুদেবস্য ভগিনীং" তিনি পৃথিবীর ভার লঘু করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা" দস্যুবধের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দুর্গাস্তবে বলিতেছেন—

দস্যুভির্ব্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্।

২১—৬ অঃ বিরাট।

হে দুর্গে! যাহারা দস্যুগণদ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তুমি সেই সকল মানবের গতি।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দুর্গাও পীতবসনা, এবং শিখিপুচ্ছধারিণী; কৈটভনাশিনী; ৬ অঃ বিরাট। শ্রীকৃষ্ণের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য হইতে দুর্গা বৈদিক ও যজ্ঞপন্থার সমর্থনকারিণী তাহা অনুমান

করা যায়। তাঁহার চণ্ডা রূপ হইতে যজ্ঞবিরোধের ভাব আসে। বিকৃত বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ে উমার ডাকিনীরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি মহাদেবের সহিত শ্মশানে বিচরণ করিতেন। আমরা কালীকে প্রকৃতিরূপে জানি; কালী, চণ্ডী, প্রকৃতি, মহামায়া, এই সব ভাবেই বাঙ্গালাদেশে কালী পূজিত হন। মহাভারতের সময়ে আমরা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত পাই; ২২৯—১৪ অঃ অনু। বীরাসন, বীরব্রতচারী এসকল কথা দেখিতে পাই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট মদ্য মাংস দেবতাকে অর্পণ করিয়া খাইতেন; ১—২২১ অঃ শান্তি। ইহা বৈদিক আচার বলিয়া মনে হয় না; শুক্রাচার্য্য মদ্য ব্রাহ্মণদিগের অপেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই মদ্যমাংস দিয়া যক্ষ-রাক্ষসেরা অর্থাৎ অবৈদিকেরা পূজা করিত; ৬১—৯৮ অঃ অনু।

বলয়ঃ সহ পুষ্পৈস্তু দেবানামুপহারয়েৎ।
দধিদুগ্ধময়াঃ পুণ্যাঃ সুগন্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥
কার্য্যা রুধিরমাংসাঢ্যা বলয়ো যক্ষরক্ষসাম্।
সুরাসবপুরস্কারা লাজোল্লাপিকভূষিতাঃ॥ ৬০।৬১—৯৮ অঃ অনু।

দধিদুগ্ধযুক্ত পবিত্র প্রিয়দর্শন বলিসকল পুষ্পের সহিত দেবগণকে উপহার প্রদান করিবে। যক্ষরাক্ষসদিগকে রুধির ও মাংসযুক্ত বলি-সকল প্রদান করা কর্ত্তব্য। সেই সমুদয় বলির উপরিভাগ সুরা-আসব ও লাজলেপনপূর্ব্বক বিভূষিত করিবে। তান্ত্রিক পূজার বিধি তখনও দেখিতে পাওয়া যাইত; ২২৭—১৪ অঃ অনু। প্রকৃতি পুরুষের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে, 'প্রকৃতিং মায়াম্ পুরুষং তত্র প্রতি-বিম্বিতং'; ৬—১৪ অঃ অনু। উমা হইলেন প্রকৃতি, আর মহাদেব

হইলেন পুরুষ। মহেশ্বর প্রকৃতি পার্ব্বতীর সহিত হিমালয়ে নিত্যকাল বিহার করিতেছেন।

অত্র বৈ হিমবৎপৃষ্ঠে নিত্যমাস্তে মহেশ্বরঃ।
প্রকৃত্যা পুরুষঃ সার্দ্ধং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভঃ॥

অত্রত্য হিমালয়পৃষ্ঠে যুগান্ত হুতাশনপ্রতিম পরম পুরুষ মহেশ্বর প্রকৃতি পার্ব্বতীর সহিত নিত্যকাল বিহার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কল্পিত হইয়াছিল, মহাদেবসম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা যায়। মহাদেব প্রথমে যজ্ঞবিরোধী পরে যজ্ঞ-অনুমোদনকারী হন; কিন্তু তিনি চিরদিনই শ্মশানবিহারী ও ভূতগণপরিবেষ্টিত বলিয়া বর্ণিত আছেন। পরে তাঁহাকে ডাকিনী-রূপিণী উমার সহিতও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে মনে হয়, কোন অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া হরপার্ব্বতীর পূজা আমরা পাইয়াছি। উমাকে ব্রহ্মবিদ্যা হইতে চণ্ডীরূপে আমরা পূজা করি।

গণপতি-পূজা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত নাই, এ পূজাও বোধ হয়, প্রথমে অবৈদিকগণের ছিল, পরে বৈদিকেরা গণপতিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অন্তর্গত করে। গণপতি নাম হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাক্ষস পিশাচদিগের রক্ষাকর্ত্তার নাম গণেশ হইতে পারে। মহাদেব বোধ হয় নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন না; আমরা গণেশাদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াঃ দেখিয়াছি। ক্ষত্রিয়-নামধারীদিগের বৈদিকতাসম্বন্ধে অনেক সময় সংশয় হয়, তাহার উপর আর এক কারণে গণেশের বৈদিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। গণেশের মাথায় হাতীর শুঁড় আছে; এই হাতীর শুঁড়ের সহিত মতঙ্গের বোধ হয় সম্বন্ধ আছে। আমরা গণেশ-আদি চতুর্দ্দশ মাতৃকা দেখিতে পাই; ১ খণ্ড কাত্যায়নসংহিতা।

গণেশপূজা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার ভাই কার্ত্তিকের পূজা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত আছে। কার্ত্তিকসম্বন্ধে কোন ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। যেমন শিবের দুই মূর্ত্তি, সেইরূপ কার্ত্তিকের আমরা দুই মূর্ত্তি দেখিতে পাই। মহাভারতের সময়েও দুর্গার পাশে কার্ত্তিকের স্থান ছিল; ২৭৮—১৪ অঃ অনু।

কার্ত্তিকের নাম স্কন্দ, স্কন্দনামে একটি গ্রহ ছিল; ৪৪—২২৯ অঃ বন।

কার্ত্তিক অগ্নিপুত্র, রুদ্রপুত্র, কৃত্তিকাপুত্র, গঙ্গাপুত্র; ১৩—১৩৭ অঃ আদি। অগ্নি হইল বেদের নামান্তর, রুদ্রের অবতার বুদ্ধদেব, কৃত্তিকাগণ হইল মাতৃকাগণ, রাক্ষসী; আর গঙ্গা হইল চেতন-সলিলা। এই কয়টি কথা হইতে কার্ত্তিকের কল্পনায় মিশ্রিত ভাব পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাই।

বেদ-অপহরণকারী বিশ্বামিত্র ছিলেন কার্ত্তিকের প্রিয়; ১৫—২২৫ অঃ বন। তিনি কার্ত্তিকের অভিষেক করেন; কার্ত্তিক যেমন বিশ্বামিত্রপ্রিয় ছিলেন, সেইরূপ তিনি বাসুদেবপ্রিয় ছিলেন; ৮।৯—২৩১ অঃ বন। কার্ত্তিকও দেবগণের সহিত যুদ্ধ করেন; ৯…১১—২২৬ অঃ বন। বরুণ কার্ত্তিককে বারণসমুদয় দান করিয়াছিলেন; ২৫—৮৬ অঃ অনু। সাগর হইল অসুরালয় ও বারণ অর্থে মাতঙ্গ, রাক্ষসগণ এবং অসুরগণ কার্ত্তিকের অনুগত হইয়াছিল; ২৬—৮৬ অঃ অনু। আমরা কার্ত্তিকের সহিত বিষ্ণুর প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই; ১৫…৩১৭ অঃ শান্তি। এই হইল কার্ত্তিকের অবৈদিক রূপের ইঙ্গিত।

অপর পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তারকাসুর-বধের নিমিত্ত

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম দেবসেনাপতি, তিনি সেনানায়ক হইয়া অসুরকে বধ করেন; বিষ্ণু তাঁহাকে বৈজয়ন্তীনাম্নী বলবিবর্দ্ধিনী মালা প্রদান করিয়াছিলেন ; ৪৮—৪৬ অঃ শল্য। এই দুই ভাবের পর আমরা দেখিতে পাই কার্ত্তিক পিশাচ ও দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলেন ; ২৯—২২৮ অঃ বন। কার্ত্তিকের অভিষেকের সময় পুলস্ত্য, পুলহ উপস্থিত ছিলেন, ইঁহারা হইলেন সপ্ত ঋষির মধ্যে অন্যতম, অথচ ইহাঁরা রাক্ষসদিগের পূর্ব্বপুরুষ। এই সকল কথা হইতে মনে হয় যে, বৈদিক ও অবৈদিক মতের মিশ্রণে কার্ত্তিক-কল্পনা হইয়াছে।

বৈষ্ণব ও শৈবদিগের ন্যায় সূর্য্য-উপাসকদিগকে ভারতবর্ষে অধিকসংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না ; তথাপি এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক এদেশে যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক পূজা না হইলেও সূর্য্যের উপাসনা, সূর্য্যের পূজা, সূর্য্যের স্তব এখনও হিন্দুদিগের পূজার অঙ্গ। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যের পূজা করিতেছেন ; ১৮—১৭১ অঃ আদি। স্বয়ং ইন্দ্র সূর্য্যের উপাসনা করিতেন ; ১০...১২—২২৮ অঃ শান্তি। সপ্তমী ও ষষ্ঠীতে সূর্য্যপূজা বিধি ছিল ; ৬৪—৩ অঃ বন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্য-রূপ দেখিতে পাই ; ২১—১৫৮ অঃ অনু। আবার দেখিতে পাই সূর্য্যকে আচার্য্যেরা ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন ; ৬০—৩ অঃ বন। তিনি সবিতা অর্থাৎ প্রসবিতা-রূপে জগৎ-উৎপাদক পরমাত্মা। আবার অন্য মতে জগৎ-প্রসবধর্ম্মা মায়ারূপ উপাধিযুক্ত ঈশ্বর ; ১—৪৬ অঃ উদ্। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ স্বস্বশাখোক্ত মন্ত্রদ্বারা যথাকালে সূর্য্যোপাসনা করিয়া থাকেন ; ৩৯—৩ অঃ বন। এই সকল অংশ

হইতে সূর্য্যের পূজা যে বেদোক্ত ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তথাপি সূর্য্যপূজার উপর যে অবৈদিকতার কিছু ছায়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি ঘোরমূর্ত্তি অসুরদিগকে ও নানাবিধ মর্ত্ত্যগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সূর্য্যের অপর নাম পূষা; ২১—১০৩ অঃ দ্রোণ। মহাদেব পূষার দন্ত ভগ্ন করেন; সূর্য্যের অনুচরগণের মধ্যে মাতৃকাগণকে দেখিতে পাওয়া যায়; ৬৮—৩ অঃ বন।

যখন সূর্য্য কর্ণের নিকট আগমন করেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ ও 'বেদবিদ্ভূত্বা' বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ সাজিয়া আসিয়াছিলেন।

এস্থলে বেদবিৎ শব্দের অর্থ যদি ব্রহ্মবিৎ হয়, তাহা হইলে অবৈদিকতার যথেষ্ট ইঙ্গিত আসে। বুদ্ধদেবের নামান্তর অর্কবন্ধু, বন্ধু শব্দের এক অর্থ পিতা, যেমন বন্ধুধনে পুত্রগণের অধিকার। কর্ণ হইলেন সূর্য্যপুত্র, কর্ণ শব্দ বলা বাহুল্য, শ্রুতি কথার খেলা। তিনি ও দুঃশাসন অর্থাৎ কুশাস্ত্র, কলি (বৌদ্ধ মতের) অংশে জাত দুর্য্যোধনের বন্ধু। এই অর্ক শব্দ লইয়া মহাভারতে অন্যত্রও রহস্য আছে। আয়োদধৌম্যের শিষ্য উপমন্যু অর্কপত্র খাইয়া অন্ধ হয়, এস্থলে অন্ধ শব্দের অর্থ যে জ্ঞানান্ধ তাহা স্থির করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা দেখিলাম বেদমধ্যে সূর্য্যের উপাসনাবিধি আছে; কিন্তু সূর্য্যবেদ বলিয়াও স্বতন্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ আছে দেখা যায়। একথাটি বুঝিতে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ প্রয়োজন।

ভরদ্বাজ ও রৈভ্য নামে দুইজন মহামুনি ছিলেন, এবং উভয়ে সখা ছিলেন। ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে এক পুত্র ছিল ও রৈভ্যের অর্ব্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র ছিল। বেদজ্ঞানসম্বন্ধে ভরদ্বাজ রৈভ্য অপেক্ষা হীন ছিলেন এবং রৈভ্য যেরূপ স্বকীয় বিদ্যার নিমিত্ত

পূজা প্রাপ্ত হইতেন, ভরদ্বাজ সেরূপ আদর প্রাপ্ত হইতেন না। যবক্রীত এই দুঃখে বেদলাভের জন্য স্বয়ং চেষ্টা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। গুরুসাহায্যে বেদশিক্ষা সময়সাপেক্ষ বলিয়া তিনি স্বয়ং নিজ চেষ্টায় বেদপাঠ করিতে স্থির করিলেন। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে প্রতিদিন একমুষ্টি বালি নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গায় সেতুবন্ধন যেমন অসম্ভব সেইরূপ গুরুর সাহায্যব্যতীত বেদপাঠ অসম্ভব। পরে যবক্রীতের প্রার্থনায় ইন্দ্র তাঁহাকে বর দিলেন যে তোমার বেদজ্ঞান হইবে।

রৈভ্যের পরাবসু নামে পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল ও তাঁহার স্ত্রী রৈভ্যের আশ্রমে থাকিত। একদিন ভরদ্বাজের পুত্র যবক্রীত রৈভ্যের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরাবসুর স্ত্রীকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হয়। রৈভ্য একথা শুনিতে পাইয়া এক রাক্ষস ও রাক্ষসী সৃজন করেন, তাহারা যবক্রীতকে ভরদ্বাজের অগ্নিহোত্রগৃহে বধ করে। ভরদ্বাজ নিজ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অগ্নি-প্রবেশপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন।

ইহার পরে বৃহদ্দ্যুম্ন নামে এক নরপতি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্ব্বাবসু ও পরাবসু দুই ভাই সেই যজ্ঞে পুরোহিত হন। সেই সময়ে এক রজনীতে পরাবসু নিজের আশ্রমে আসিবার সময় মৃগভ্রমে স্বীয় পিতা রৈভ্যকে বধ করেন। তিনি যজ্ঞবাটে ফিরিয়া গিয়া নিজ ভ্রাতা অর্ব্বাবসুকে পিতার হত্যার কথা জ্ঞাপন করেন ও যাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয়, তাঁহাকে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করেন। অর্ব্বাবসু যজ্ঞত্যাগ করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত ব্রহ্মহা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, পরে অর্ব্বাবসু পুনরায় যখন যজ্ঞস্থলে

আসিলেন পরাবসু রাজাকে বলিলেন—এই অর্ব্বাবসু ব্রহ্মহা; অনুচরেরা রাজাজ্ঞায় অর্ব্বাবসুকে যজ্ঞস্থল হইতে দূর করিয়া দিল। তিনি অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় দিবাকরকে আশ্রয় করিয়া উৎকট তপস্যা আরম্ভ করতঃ সূর্য্যসম্বন্ধীয় রহস্য বেদ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে অগ্রভুক্ অব্যয় মার্ত্তণ্ড স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেবগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠমধ্যে গণ্য করিলেন এবং পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারা অর্ব্বাবসুকে বরদানে উদ্যত হইলে তিনি স্বীয় পিতা, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের উত্থান, ভ্রাতার নিরপরাধ, পিতার বধবিষয়ে অস্মরণ এবং স্বকৃত সৌরবেদের প্রতিষ্ঠা এই সকল বর প্রার্থনা করিলেন। দেবতারা তথাস্তু বলিয়া তাঁহার প্রার্থিত সকল বর দান করিলেন; ১৩৮ অঃ বন।

আখ্যায়িকাটি যে একটি রূপক তাহা বলা বাহুল্য। ইহা হইতে গুটিকতক কথা প্রকাশ পায়; ভরদ্বাজ মুনি বেদে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না; এ ভাব আমরা পরেও দেখিব। গুরু ভিন্ন বেদপাঠ হয় না, ইহা যবক্রীতের রহস্য; সেই কারণে তাহার মৃত্যু হইল, মৃত্যু অর্থে অজ্ঞানতা। অর্ব্বাবসু বিনা অপরাধে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অভিযুক্ত হইল। ব্রহ্ম অর্থে বেদ, অর্ব্বাবসু কিন্তু বাস্তবিক বেদদূষক ছিলেন না। বেদহনন অথবা বেদদূষণ তাঁহার উপর মিথ্যা অভিযোগ, কিন্তু তিনি রহস্যবেদের কর্ত্তা। এ রহস্যবেদটি বুঝা কঠিন, কারণ সরহস্যবেদপাঠ বেদপাঠের নিয়ম ছিল; তিনি কিন্তু বৈদিক পথানুসারে অগ্নিকে না স্তব করিয়া সূর্য্যকে স্তব করিলেন। অগ্নি হইলেন যজ্ঞের অগ্রভুক্; এস্থলে কবি সূর্য্যকে অগ্রভুক্ নাম

দিয়াছেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায় অর্ব্বাবসু হইলেন সৌরবেদের কর্ত্তা। এস্থলে অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতারা এই সৌর বেদের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে তাঁহাকে বর দিলেন। এই সকল অংশ হইতে মনে হয় যে অর্ব্বাবসু বেদের মতানুযায়ী অথচ রহস্য-আকারে লিখিত সৌর বেদের কর্ত্তা ছিলেন। ইহা বেদের প্রতিকূল নহে, কারণ অর্ব্বাবসুর ব্রহ্মহা অখ্যাতি অমূলক।

কাশী চিরদিনই হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান; কাশীস্থিত পণ্ডিতদিগকে তর্কে জয় করিতে বুদ্ধদেব সারনাথে আসেন, তথায় তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন। পরে ঐ স্থান বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান আড্ডা হয়। কতদিন বৌদ্ধপ্রভাব কাশীতে প্রবল ছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও কাশী হইতে বৌদ্ধপ্রভাব এককালে দূর হয় নাই, চৈতন্যদেবের সময়েও কাশীতে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। প্রবাদ আছে, দিবোদাস নামে রাজা কাশী স্থাপন করেন, এই রাজা দিবোদাস বীতহব্যের বন্ধুগণ দ্বারা (বীতহব্যদায়াদৈঃ) গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নিহত হন। বীতহব্য-অর্থে যাঁহারা যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরশুরাম ইহাদিগকেই বিনাশ করেন; সেই যজ্ঞত্যাগীরা কাশী-প্রতিষ্ঠাতা দিবোদাসকে পরাজয় করে; তাহা হইলে মনে হয় যে, এক সময়ে যজ্ঞপন্থা-বিরোধীরা কাশী জয় করে এবং কাশীতে অবৈদিক মত প্রচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কাশীজয়ের উল্লেখ আমরা পাই অর্থাৎ কাশীতে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জয় হইল বুঝা যায়। কাশীতে শিবপূজারও মহাভারতে উল্লেখ আছে। "ততো বারাণসীং গত্বা অর্চ্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্।" ৭৮—৮৪ অঃ বন। তাহার পর বারাণসীতে গিয়া মহাদেবকে অর্চ্চনা করিবে।

কাশীতে বৈষ্ণব ও শৈবমত স্থাপনের পরে, উভয় মতের সমন্বয় হইয়াছিল কিনা বলা যায় না? শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, যে, তিনি কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া পথে যাইতেছিলেন, তখন তিনি সম্মুখে কুক্কুরযূথবেষ্টিত একজন চণ্ডালকে দেখিলেন; শুচি অবস্থায় চণ্ডালের দর্শনে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিলেন। চণ্ডাল তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—শঙ্কর! তুমি নাকি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রচার কর, আর আমাকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছ। শঙ্কর একথা শুনিয়া নিজের আচরণে লজ্জা বোধ করিলেন এবং সেই চণ্ডালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যকে অনেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিত। গল্পটির মূলে কতদূর সত্য আছে, তাহা বলা যায় না, তবে ইহা স্থির যে, নবম শতাব্দীতেও কাশী হইতে বৌদ্ধপ্রভাব এককালে অদৃশ্য হয় নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। তাহা হইতে কাশী যজ্ঞের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ইহাই মনে হয়। তবে ঐ গ্রন্থে সে সময়ে নানাবিধ অবৈদিক পন্থাও কাশীতে প্রচলিত ছিল, তাহারও যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল কথাগুলি একত্রিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, যাহা দেশমধ্যে ঘটিতেছিল, কাশীতেও তাহা হইয়াছিল। প্রথমে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহার পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তাহার পর শৈব মত, এ সকলই কাশীতে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশমধ্যে যেমন বিরোধ ও সমন্বয় চলিতেছিল, কাশীতেও তাহা ঘটিয়াছিল। সময়ে সকল পন্থা কাশীতে আশ্রয় লইল, তবে কাশীর শিক্ষা প্রধানতঃ বেদান্ত দর্শন হইল এবং সন্ন্যাসিগণ হইল তাহার শিক্ষক; তাহাদের শিক্ষা হইল বৈরাগ্য।

মহাভারতের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া দেশমধ্যে যে তুমুল বিরোধ চলিতেছিল এবং সে সম্বন্ধে কাশীর মত যে সকলের চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইত, তাহার প্রমাণ মহাভারতমধ্যে একটি কথা হইতে সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়, সে কথাটি জিতকাশি।

যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকল নামগুলিরই দুই অর্থ আছে। দ্রৌপদী হইলেন যজ্ঞাভিমানিনী কল্পিত স্ত্রীমূর্ত্তি। এ সকল কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে (মহাভারতের রহস্য) দ্যূত-ক্রীড়া, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, অর্জ্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ এ সকলই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ নহে, মত লইয়া যুদ্ধ। যুধিষ্ঠির, শকুনির সহিত পাশা খেলিতেছেন, একে একে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, চার ভাই ও নিজেকে হারিলেন, পরে যখন দ্রৌপদীকে হারিলেন তখন কবি শকুনির সম্বন্ধে জিতকাশি শব্দ ব্যবহার করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞপন্থার পরাজয় হইল। সেইরূপ যখন গদাযুদ্ধে (অর্থাৎ তর্কে, গদ ভাষণে) ভীম দুর্য্যোধনকে (দ্রৌপদীরূপ যজ্ঞপন্থা-ধর্ষণকারীকে) পাতিত করিলেন, তখন কবি পাণ্ডবদিগকে বলিতেছেন 'জিতকাশয়ঃ' এবার যজ্ঞপন্থার জয় হইল। এইভাবে জিতকাশি শব্দ ব্যবহার করিবার উদাহরণ মহাভারতমধ্যে শতাধিক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাণস্যাস্তু জ্ঞানভূমিত্বং সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং। (টীকা)

২০৩...২০৮—৮৩ অঃ বন।

উপরে যে পাঁচটি পন্থার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি হিন্দুদিগের ধর্ম্মপন্থা বলা যায়, কিন্তু এ কথাটি সাধারণ ভাবে সত্য। ইংরাজীতে একটি কথা আছে 'অথরাইজ্‌ড্‌ ভার্‌সন্‌' ইহাকে

প্রমাণলিপি বলা যাইতে পারে। এমন লোক যাহাদের কথাই প্রমাণ বলিয়া সকলে গ্রহণ করে, তাহারাই এই লিপি প্রণয়ন করেন; হিন্দুদের সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা সম্ভব নয়। সকল পন্থাগুলিই বেদমূলক, বেদ ভিত্তি করিয়া পন্থাগুলি রচিত হইয়াছে। রচনা করা কাহারও একায়ত্ত নহে। যাঁহার প্রবৃত্তি ও শক্তি আছে, তিনি স্বেচ্ছামত ঐ মত অথবা পন্থাগুলিকে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মতগুলির অগণিত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ও তাহার ফলে অসংখ্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, ও আজও পর্য্যন্ত হইতেছে। যাঁহারা অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষের উপাসকসম্প্রদায় নামক গ্রন্থ দেখিয়াছেন তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে না। বাঙ্গালা-দেশে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কিশোরীভজন, নরেশপন্থী প্রভৃতি অসংখ্য দল এই প্রকার পরিবর্ত্তনের উদাহরণ।

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পন্থাই হউক কিংবা তাহাদের অগণিত পরিবর্ত্তিত এবং বিকৃত রূপান্তরই হউক, সকলের সম্বন্ধে একটি কথা খাটে। হিন্দুদিগের সকল পন্থা, সকল মত, সকল শিক্ষা বৈরাগ্যপ্রধান; বৈদিক যজ্ঞ অথবা কর্ম্মকাণ্ডের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বর্ত্তমান কালে হিন্দুদিগের বৈদিকধর্ম্ম নূতন পঞ্জিকাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কর্ম্ম করা পাপ, ইহা সন্ন্যাসী-দিগের শিক্ষা, বৈদিকদিগের নহে। আশ্রম-প্রতিপালন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শিক্ষা, আশ্রমপরিত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষা। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বাল্যকাল হইতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, লোকের বিশ্বাস বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার এবং তৎসদৃশ সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষায় আজ সহস্র বৎসরেরও অধিক

হিন্দুদিগের মন গঠিত হইয়াছে। শাক্তেরা এক সময়ে কর্ম্মপন্থা-সেবক ছিলেন; ধনং দেহি, সুতং দেহি, দ্বিষোজহি বলিয়া তাঁহারা প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শাক্তদিগেরও মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সাধক দ্বিজ রামপ্রসাদের পদাবলী সকলই বৈরাগ্যভাবে পরিপূর্ণ। সংসার দুঃখের স্থান, এই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি হইল জীবনের চরম উদ্দেশ্য, হিন্দুজাতির ইতিহাস এই শিক্ষার ফল।

স্মৃতি। (১)

বিপ্লবের পর দেশে স্মৃতিযুগ আরম্ভ হইল, এই যুগকে মৃত্যুযুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগে হিন্দুরা বিদেশীয়দিগের দাস হইল, এবং হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবার পথে বসিল। এই যুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সমাজ কিছু পরিমাণে অবশিষ্ট ছিল, তদ্ভিন্ন সমগ্র দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত যাহাদিগকে শূদ্র অথবা দাস বলিত, তাহারাই রহিল। এই সকল ভাগে অনেক স্থানে বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা বাস করিত, কিন্তু তাহাদের এইরূপ অবনতি হইয়াছিল যে, শূদ্রগণ হইতে তাহাদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। "উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, এস্থানে যে ধর্ম্ম ও আচার তাহাই বিশ্বাসবিধি।" প্রথম খণ্ড বসিষ্ঠসংহিতা। তাহা হইলে বাঙ্গালা উড়িষ্যা ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে পড়িল, যে দেশ চতুর্ব্বর্ণহীন সে দেশ ম্লেচ্ছদেশ, তদিতর

আর্য্যাবর্ত্ত ; ৪—৮৪ অঃ বিষ্ণুসংহিতা। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থান আর্য্যাবর্ত্ত (মধ্যদেশ) ইহা কোন কোন মতে উক্ত হয় ; ১ম খণ্ড বসিষ্ঠসংহিতা।

স্মৃতিগুলির অর্থ বুঝিতে হইলে আরও গুটিকতক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশ হইতে তখন পুরাতন ক্ষত্রিয় বর্ণ, একপ্রকার অদৃশ্য হইয়াছিল। তখন যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিত তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা তখন নূতন ক্ষত্রিয় সৃজন করিতেছিলেন, বলশালী ব্যক্তি কিংবা যে কেহ, ব্রাহ্মণদিগকে অবৈদিকগণ হইতে রক্ষা করিতে পারিত সেই ব্যক্তিই রাজা বা ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিত, এবং ব্রাহ্মণেরাও তাহা অনুমোদন করিতেন। কোন কোন স্থানে রাজাজ্ঞায় চতুর্ব্বর্ণ গঠিত ও স্থাপিত হইত। ভীষ্ম বলিতেছেন, —

যশ্চ ত্রয়াণাং বর্ণানামিচ্ছেদাশ্রমসেবনম্।
চতুরাশ্রমদৃষ্টাংশ্চ ধর্ম্মাংস্তান্ শৃণু পাণ্ডব॥ ১১—৬৩ অঃ শান্তি।

যে নৃপতি স্বীয় রাজ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণত্রয়কে যথোক্ত আশ্রমধর্ম্মসকল আচরণ করাইতে ইচ্ছা করিবেন, এক্ষণে সেই অবশ্য-আচরণীয় চতুরাশ্রমদৃষ্ট ধর্ম্মসকল শ্রবণ কর।

রাজপুতেরা বৌদ্ধধর্ম্মে দূষিত ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আসিল। বৈশ্যদের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়াছিল, শূদ্রগণ হইতে তাহাদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না ; তাহা হইলে দেশে রহিল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ যাহাদিগকে শূদ্র বলিত। আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন যে সকল স্থানে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যাইত সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মণদের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না।

আরট্টা নাম তে দেশা বাহীকা নাম তে জনাঃ।
ব্রাহ্মণাপসদা যত্র তুল্যকালাঃ প্রজাপতেঃ॥

৪৪—৪৪ অঃ কর্ণ।

যেখানে ব্রাহ্মণাধমেরা প্রজাপতির সমকালিক, অর্থাৎ তদীয় সৃষ্টির বহির্ভূত, সেই দেশসকলের নাম আরট্ট এবং তথাকার লোকদিগেরই নাম বাহীক (পাঞ্জাব)।

বাঙ্গালাদেশে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে বেদপাঠ ও যজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছিল; বৈদিকেরা সহজে ম্লেচ্ছদেশে যাইত না। "শূদ্র-রাজ্যে বাস নিষিদ্ধ", "অধর্ম্মবহুল দেশেও বাস নিষিদ্ধ"; ৬৩—৭১ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

ম্লেচ্ছদেশে শ্রাদ্ধ দূষণীয়। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ দেশান্তরে গমনকালে বলিয়া যাইত যে অন্য ব্রাহ্মণ তাহার হইয়া যেন অগ্নি-হোত্র করে। "সাগ্নিক প্রবাসী ব্রাহ্মণ যথাকালে পবিত্রভাবে নিত্য-কর্ম্মাদি, মানসে স্মরণ করিবে।" ১৯ খণ্ড কাত্যায়নসংহিতা।

দেশে ধর্ম্ম লইয়া তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল, আমরা দেখিতে পাই, পররাষ্ট্রজয়ে তদ্দেশের ধর্ম্ম-উচ্ছেদ নিষিদ্ধ; ২৬—৩ অঃ বিষ্ণুসং।

দেশের এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিগুলি লিখিত হয়, বিশখানি এইরূপ রচনাকে পুরাতন স্মৃতি বলে। স্মৃতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের দ্বারা লিখিত বা সঙ্কলিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক স্মৃতিমধ্যে যাহা আছে অপর স্মৃতিতে তাহা নাই, এক স্মৃতিমধ্যে পরস্পরবিরোধী কথা আছে। আর্য্যাবর্ত্তমধ্যে স্মৃতিগুলি লিখিত হইয়াছিল ইহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। বাঙ্গালাদেশের জন্য যে পুরাতন স্মৃতি ছিল তাহা মনে হয় না। স্মৃতি শব্দের অর্থ

যাহা বেদকে স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহা হইতে অনুমান করিতে হইবে যে, স্মৃতিতে যাহা লিখিত আছে সে সমস্তই বেদমূলক। গ্রন্থগুলির গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত আর এক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। স্মৃতিকারেরা অথবা সঙ্কলনকারীরা এই সকল পুস্তকে নিজেদের নাম না দিয়া ব্যাস, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রভৃতি কল্পিত-রচয়িতৃগণের নাম দিয়াছেন।

হিন্দুসমাজে স্মৃতিগুলির স্থান বুঝিতে হইলে আরও গুটিকতক কথা মনে রাখিতে হইবে। তখন দেশে এক সহস্র বৎসর অবৈদিকদিগের সহিত ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধ চলিয়াছিল, অবৈদিকদিগের হস্তে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য সমাজ, চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম, বেদ, ও বৈদিক ক্রিয়া, সমস্তই এক প্রকার উচ্ছেদ পাইয়াছিল। অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিবার পর, অনেক বিপদের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল; এই অবস্থায় স্মৃতিগুলি লেখা হয়। মহাভারতে আমরা বিপ্লবের চিত্র দেখি; মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব এখন সকলেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন। এ অংশ পরিত্যাগ করিলেও মূল মহাভারত লক্ষ্য করিয়া পড়িলে তাহার মধ্যে স্মৃতিযুগের সূচনা বুঝিতে পারা যায়।

স্মৃতি রচিত হইবার কারণ কি? আমরা আর্য্যাবর্ত্তের সীমাসম্বন্ধে নানা প্রকার মত দেখিয়াছি। মধ্যদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে পুনরায় বিস্তারিত হইতেছিল; পূর্ব্বে যে স্থান বা প্রদেশ অবৈদিকপ্রধান ছিল, সেই অংশে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা ও তাহাদের শক্তির বৃদ্ধি হইতেছিল। স্মৃতিগুলির মূল উদ্দেশ্য হইল, পুনঃরচিত পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের

রক্ষা। মহাভারতে আমরা এক ঘোর বিবাদের চিত্র দেখিতে পাই; লোকে গৃহস্থ হইবে না সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে? বৈদিকেরা গৃহাশ্রমের পক্ষে, সন্ন্যাসীরা, বিশেষ যোগপথাবলম্বীরা গৃহে থাকিবার বিপক্ষে ও সন্ন্যাসগ্রহণের পক্ষে। এ বিবাদে ব্রাহ্মণদিগের জয়ও হইল, পরাজয়ও হইল। দেশের লোকে বিশেষ শূদ্র ও তৎসদৃশ বৈশ্যেরা অগণিত সংখ্যায় সন্ন্যাসগ্রহণ করিল তাহা সত্য, কিন্তু ইহা স্থির হইল যে গৃহস্থ-আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম, ইহাই মহাভারতের শিক্ষা। সমগ্র শান্তিপর্ব্বে এবং কতকাংশ অনুশাসনপর্ব্বে এই প্রশ্নেরই বিচার আছে। শেষকালে সিদ্ধান্ত হইল যে, গৃহস্থ আশ্রমই গ্রহণ বিধি, এই হইল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জয়। সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার প্রভাবে দেশমধ্যে জনসাধারণের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া বৈরাগ্যমূলক হইয়াছিল, কেবল তাহা নহে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সন্ন্যাসীদিগের বৈরাগ্যভাব সম্পূর্ণরূপে আসিয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শঙ্করাচার্য্য এই বৈরাগ্য-ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাদাতা; ইহা হইল ব্রাহ্মণদিগের পরাজয়। ব্রাহ্মণেরা মনে মনে যোগপথাবলম্বীদিগকে বিশেষ সম্মান করিতেন। পরে দেখিব যে উপযুক্ত দানপাত্র নির্ব্বাচন করিতে তাঁহারা যোগ-পথাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিতেন। যজ্ঞ এক প্রকার দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে দেব-পূজা, জপ, দান, তীর্থদর্শন ও ব্রত সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল, নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, যে, অনেক যোগের প্রক্রিয়া আমাদের এ সময়কার নৈত্যিক ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণের এই হইল দ্বিতীয় পরাজয়, বৈদিকপন্থা যোগপন্থা-দ্বারা অভিভূত হইল।

দেশে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম স্থাপিত হইল। স্থানে স্থানে চতুর্ব্বর্ণ লইয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের পুনর্গঠনেরও চেষ্টা হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ আর পুনর্গঠিত হইল না।

সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে চতুর্ব্বর্ণ গঠন করিবার বলও ছিল না; স্থানে স্থানে কোন কোন রাজা চতুর্ব্বর্ণ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ণভেদ যদি কর্ম্মমূলক হয়, তাহা হইলে সে ক্ষমতা দেশমধ্যে কাহারও ছিল না। স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রধর্ম্মা বৈশ্যধর্ম্মা নাবৃত্তিঃ পততে দ্বিজঃ।

শূদ্রধর্ম্মা যদা তু স্যাত্তদা পততি বৈ দ্বিজঃ॥ ৩—২৯৪ অঃ শান্তি।

বৃত্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ধর্ম্মাচরণ করিলে পতিত হন না; কিন্তু শূদ্রের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হন। এস্থলে ব্রাহ্মণের অবনতির পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত।

আমরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণপ্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সেরূপ অবস্থা হইতে দেশের সমস্ত লোককে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া, তাহাদিগকে চতুর্ব্বর্ণোচিত উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া, পুনরায় চতুর্ব্বর্ণে বিভাগ করা এবং পুনরায় চতুর্ব্বর্ণ স্থাপন করিবার শক্তি কাহারও থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না। যখন নূতন করিয়া গঠন করিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন যাহা আছে তাহাই রক্ষা করা প্রধান ভাবিবার বিষয় হইল।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অসংখ্য দেশ ও জাতি ছিল, অগণিত রাজা ও সামন্ত রাজা প্রভুত্ব করিত। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে সেই ভাবের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। তখন সমগ্র ভারতবর্ষ লইলে বোধ হয় পনর আনা ভাগ লোক বৌদ্ধ এবং বিকৃত বৌদ্ধ ছিল।

এ অবস্থায় এ মহাপ্রদেশে কোন এক ব্যক্তির এরূপ শক্তি হইবে যে চতুর্ব্বর্ণ পুনঃ স্থাপিত করে তাহা সম্ভব নয়। আর বাস্তবিক চতুর্ব্বর্ণ পুনঃ স্থাপিত হয় নাই। হিন্দুসমাজ যদি চতুর্ব্বর্ণমূলক হয়, তাহা হইলে প্রকৃত হিন্দুসমাজ বৌদ্ধবিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছিল। সহস্রবর্ষব্যাপী গৃহবিবাদের ফলে যে শ্রান্তি ও অবসাদ দেশমধ্যে আসিয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই।

দেশমধ্যে রহিল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র; স্মৃতিগুলি রচিত হইবার কারণ এখন আমরা কিছু বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আর্য্যাবর্ত্তের সীমা প্রসারিত হইতে লাগিল। চতুষ্পার্শে অব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র-বেষ্টিত স্থানে বাস করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন; সেই নিয়মগুলির নাম হইল স্মৃতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা হইল স্মৃতির মূল উদ্দেশ্য। প্রায় সহস্র বৎসর অবৈদিকদিগের সংঘর্ষে আসিয়া যে সকল দোষ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেগুলি পরিহার করিতে তাঁহারা বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যা সংজ্ঞা বিহিতা লোকে দাসে শুনি বৃকে পশৌ।
বিকর্ম্মণি স্থিতে বিপ্রে সৈব সংজ্ঞা চ পাণ্ডব॥

৫—৬২ অঃ শান্তি।

পৃথিবীতে দাস, কুকুর, বৃক এবং অপর পশুগণের প্রতি যে সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়, ব্রাহ্মণ কুকর্ম্মান্বিত হইলে তাহার প্রতিও সেই সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়।

তাহাদের নিজেদের মধ্যে অনেক দুরাচার প্রবেশ করিয়াছিল; সেইগুলি বর্জ্জন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। লুপ্তপ্রায় বেদ, পুনরায় প্রচলিত করিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। নিজেদের মধ্যে আচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার শিথিলতা প্রবেশ করিয়াছিল। এই সকল দোষগুলি পরিহার করা ও আপনাদিগকে বিশুদ্ধ রাখা এই হইল স্মৃতিলিখিত নিয়মগুলির উদ্দেশ্য।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়ের বল অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাভারতে বর্ণিত দেশের চিত্র হইতে দেখিতে পাই যে, সে সময়ে দেশ ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে দেশ ব্রাহ্মণপ্রধান হইল। মহাভারতে শমীকমুনি নিজ পুত্র শৃঙ্গীকে বলিতেছেন যে,—একজন ক্ষত্রিয় নরপতি দশজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের তুল্য, স্মৃতিতে নিয়ম হইল যে দশবর্ষীয় ব্রাহ্মণ শতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়ের পিতা এবং রাজমান্য, একজন স্নাতক ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। রাজা সকল কার্য্যেই দৈবজ্ঞের অধীন থাকিবে।

ব্রাহ্মণগণ বেদরক্ষার নিমিত্ত বৌদ্ধযুগে ও বিপ্লবের সময়েও সচেষ্ট ছিলেন; সেভাব আমরা অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে অর্থাৎ স্মৃতিযুগের আরম্ভেও দেখিতে পাই। তাঁহারা বলিতেন অনুবাকহীন, নিরগ্নি ও

অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য। বেদশূন্যে ব্রাহ্মণ হয় না; ৩য় অঃ বসিষ্ঠসংহিতা। তাঁহারা বলিতেন—

অনিজ্যয়া কুবিবাহৈর্ব্বেদস্যোৎসাদনেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ॥

২৫—৩৬ অঃ উদ্।

যজ্ঞের অননুষ্ঠান, অবৈধ বিবাহ, বেদের উৎসাদন ও ধর্ম্মের অতিক্রম দ্বারা প্রশস্ত কুলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়।

যে ব্রাহ্মণ বেদভিন্ন অন্যত্র পরিশ্রমী হয়, সে জীবিতাবস্থায় সবংশে শূদ্রতা লাভ করে। ব্রাহ্মণ হইলেন বেদপ্রকাশক; ১ ম অঃ বসিষ্ঠসংহিতা। বেদাধিকারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য থাকে; ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিবাক্য হইল বেদ ও ব্রহ্মা।

আপনাদিগকে নিয়মিত ও বিশুদ্ধ রাখিতে ব্রাহ্মণগণ চিরদিনই গুটিকতক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান উপায় ছিল সংবিভাগ, যাহাদের মধ্যে কতকগুলি দোষ না প্রবেশ করিয়াছে কিংবা কতকগুলি গুণ লক্ষিত হইত, তাহারা আপনাদিগকে পৃথক্ দলভুক্ত করিতেন। বোধ হয় এই প্রকার বিভাগ হিন্দু-রাজগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইত, তাহা না হইলেও ব্রাহ্মণেরা আপনারাই এইরূপ বিভাগ করিতেন। নিজদিগকে নিয়মিত করিতে তাঁহারা সামাজিক দণ্ডের বিধি করিয়াছিলেন, কাহারও বা দানগ্রহণ নিষেধ, কাহারও বা নিমন্ত্রণ বন্ধ হইত, কাহারও সহিত বা এক পংক্তিতে ভোজন নিবারিত হইত; তখন ব্রাহ্মণদিগের ভিতর নানাপ্রকার দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই কুব্রাহ্মণ

দিগকে পৃথক্ রাখিতে সুব্রাহ্মণেরা চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মণকে কায়িক বা অন্যপ্রকার দণ্ডদান করা সম্ভব নয়।

নানুযোগা ব্রাহ্মণানাং ভবন্তি বাচা রাজন্ মনসা কর্ম্মণা বা।

৫৬—১৯২ অঃ বন।

মন বাক্য বা কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতি শাসন নাই। তাঁহারা অন্যপ্রকারে কুব্রাহ্মণদিগকে শাসন করিতেন। শ্রাদ্ধে যাহাতে ইহাদের নিমন্ত্রণ না হয়, তাহার জন্য নিয়ম করিয়াছিলেন। যাহাতে ইঁহারা দান না পায় যাহাতে ইঁহারা সমাজের নিম্নস্থান অধিকার করে তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। "অযথাকার্য্যকারী, বিড়ালব্রতী, বৃথা চিহ্নধারী, গ্রহাচার্য্য, দেবল, চিকিৎসক, বহুযাজী, গ্রামযাজক, শূদ্রযাজক, অযাজ্যযাজী, ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী, পর্ব্বকারক, সূচক, বৃত্তিগ্রহণকারী অধ্যাপক, বৃত্তিদানকারী অধ্যাপিতা, শূদ্রান্নপুষ্ট ব্রাহ্মণ, পতিতসংসর্গী ব্রাহ্মণ, অনধীত ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা-উপাসনা-ত্যাগী ব্রাহ্মণ, রাজসেবক, পিতৃদ্বেষী, পিতৃ-মাতৃ-গুরু-অগ্নি-অধ্যয়ন-ত্যাগী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ নিষেধ"; ৮২ অঃ বিষ্ণু।

বেদপাঠ, বেদাঙ্গ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এইসকলের শিক্ষার প্রতি তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কোথায় বা তাঁহারা তিন শ্রেণীতে ব্রাহ্মণদিগকে বিভক্ত করিতেন, হীন ব্রাহ্মণ, বিদ্যাদি-জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গজ্ঞানী ব্রাহ্মণ; ৯৩ অঃ বিষ্ণুসংহিতা। যাহাতে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বেদশিক্ষা হয়, তাহার প্রতি তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, তাহার কারণ ছিল; অনেক বৌদ্ধ এবং অবৈদিক পণ্ডিত বেদের প্রমাণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এবং বৈদিক মত-খণ্ডনের জন্য বেদপাঠ করিত।

বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাং চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥

৭২—২৩ অঃ অনু।

যাহারা বেদবিক্রয় করে ও বেদসকলের দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকে এবং যাহারা বেদলেখক তাহারা নিরয়গামী হয়।

কোথায় বা তাঁহারা বলিতেন, বেদত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণ সসন্তান শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়; ৩৬—২৮ অঃ বিষ্ণুসংহিতা। কোথায় বা বলিতেন জীবিকাবিদ্যায় ইহ-পরলোকে ফল নাই, বেতনগ্রহণে অধ্যাপন ও বেতনদানে বেদাদি অধ্যয়ন উপপাতক বলিয়া পরিগণিত হইত। মূর্খ দ্বিজাতিকে ভিক্ষা প্রদানে সমস্ত গ্রাম দণ্ডনীয় হইবার বিধি ছিল; ৫৬—১ অঃ পরাশরসংহিতা। সে সময়ে সকল ব্রাহ্মণ বেদপাঠ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন তাহা নহে; অনেকে ব্যবসা করিত, ব্রাহ্মণের বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার নিন্দনীয় ছিল; ৩—৩ অঃ বসিষ্ঠ।

ব্রাহ্মণের তিল, রস, ধান্য বিনিময় ও কাষ্ঠাদিবিক্রয় নিন্দনীয় নহে; ৮—২ অঃ পরাশরসংহিতা। তখনও অনেকে গায়ত্রী মাত্র জপকারী ছিলেন, অনেক স্থলে গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণও দেখিতে পাওয়া যাইত। "গায়ত্রীহীন কৃষিকৃৎ ব্রাহ্মণ নামমাত্র ব্রাহ্মণ।" "গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ শূদ্র অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।" ব্যাসের মতে মূর্খ ব্রাহ্মণ অতিক্রম দূষণীয় নয়; ৩৫—৪ অঃ ব্যাসসংহিতা। প্রীতিপূর্ণমুখ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভুক্ত হইলেও তাঁহাকে ভোজন করাইবে, কিন্তু ষট্‌রাত্র নিরাহার মূর্খ ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদান নিষেধ; ৫২—৪ অঃ ব্যাসসংহিতা।

সমগ্র বেদ অনেক দিন লোপ পাইয়াছিল, তাহার সহিত বেদ-

পাঠও লোপ পাইল; তাহার পর ব্রাহ্মণ গায়ত্রীমাত্র-জপকারী হইলেন। "প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা গায়ত্রীজপে উভয় সন্ধ্যাক্রমে বেদ-পাঠ সিদ্ধ হয়"; ১২—৫৫ অঃ বিষ্ণুসংহিতা। "বেদোক্ত ক্রিয়া ক্ষর, ওঙ্কার অক্ষর, ইনি স্বয়ং প্রজাপতি"; ১৮—৫৫ অঃ বিষ্ণু। এস্থলে ব্রাহ্মণেরা নিজ মুখে ক্রিয়ার নিন্দা করিতেছেন।

তাহার পর হইল ব্রাহ্মণের জপেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়; ২১—৫৫ অঃ বিষ্ণু।

সে সময়ে বেদজ্ঞান কিরূপ হইয়া আসিতেছিল তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। যজুর্ব্বেদের এক অংশের নাম ত্রিনাচিকেত। ত্রিনাচিকেতব্রাহ্মণ পঞ্চাগ্নি-ব্যবস্থাপক, জ্যেষ্ঠ সামগ, বেদাঙ্গ বা একটি অঙ্গপারগ, পুরাণ ইতিহাস ব্যাকরণাভিজ্ঞ, একটি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, তীর্থ-দ্রষ্টা, যজ্ঞনিরত, তপঃপরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, গায়ত্রী-জপপর, ইঁহারা সকলেই নিমন্ত্রণযোগ্য ও পংক্তিপাবন; ৮৩ অঃ বিষ্ণুসংহিতা। শীলাদি পরীক্ষা ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগের যাজন কর্ম্ম নিষিদ্ধ ছিল; ১৪—৩০ অঃ বিষ্ণু-সংহিতা। পরে এরূপ অবস্থা হইল যে লোভ দেখাইয়া বেদ পড়াইতে হইত। "ঋগ্বেদ-অধ্যয়নে পিতৃলোক ঘৃতাহুতিতুল্য তৃপ্ত হয়; যজুর্ব্বেদ-অধ্যয়নে পিতৃলোক মধু আহুতি তুল্য তৃপ্ত হয়; সামবেদে দুগ্ধাহুতি এবং অথর্ব্ববেদপাঠে পিতৃলোক মাংসাহুতিতুল্য তৃপ্ত হয়।" পুরাণ, ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠে পিতৃলোক অন্নদানতুল্য তৃপ্ত হয়; ৩৪—৩৮ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

শেষকালে ব্রাহ্মণদের এমন দুর্গতি হইল যে, বেদ ও অগ্নিত্যাগে ত্রিষবণ অধঃশয্যা ও সকৃৎ ভিক্ষান্নভোজনে সংবৎসরে শুদ্ধিলাভ, ইহাই হইল বেদত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত বিধি; ৫৫ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

ব্রাহ্মণদের এরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার নিমিত্ত নিয়মবন্ধন যে আবশ্যক হইল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যখন নূতন করিয়া গঠন করিবার শক্তি রহিল না, তখন যাহা আছে তাহার রক্ষাই প্রধান চেষ্টা হইল। সমাজবিপ্লবের ফলে নৈত্যিক ও নৈমিত্তিক-কর্ম্মসম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল। শূদ্রেরা অর্থাৎ অহিন্দুরা অথবা বৌদ্ধেরা সর্ব্বোপজীবী ও সর্ব্বভক্ষক ছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বারশতবৎসরব্যাপী বিপ্লবের ফলে অনেক অব্রাহ্মণদিগের আচার প্রবেশ করিয়াছিল।

পূর্ব্বের আচার অথবা নূতন করিয়া শুদ্ধ আচার প্রবর্ত্তিত করিতে তাঁহারা নিয়ম গঠন করিলেন ও যাহাতে শুদ্ধাচার পালন হয় সে সম্বন্ধে যত্নবান্ হইলেন। আচার-রক্ষার উৎকর্ষতাসম্বন্ধে তাঁহারা বলিলেন ;—আচার-সেবায় আয়ু, ঈপ্সিত গতি ও অক্ষয় ধন লাভ হয় ও অলক্ষ্মী দূর হয়। সর্ব্বলক্ষণহীন পুরুষ কেবল আচার সেবায় শতায়ু জীবিত হয়। ৮৯।৯০—৭১ অঃ বিষ্ণুসং। এই হইল লোভপ্রদর্শন। মনু বলিলেন "আচারাৎ বিচ্যুতো বিপ্রঃ ন বেদফলমশ্নুতে" ইহা হইল ভয়প্রদর্শন। নবগঠিত শক্তিহীন ব্রাহ্মণ্য-সমাজে আচাররক্ষাই হইল প্রধান ধর্ম্ম।

কাহাদের নিমিত্ত সংহিতাগুলি লিখিত হইয়াছিল? সংহিতাতে চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু তৎকালীন দেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্থান সমাজে নগণ্য না হইলেও সংহিতাতে তাহাদের উল্লেখ অতি সামান্যই আছে। ব্যবস্থাগুলি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-গণেরই জন্য লিখিত হইয়াছে; তখন দ্বিজাতি শব্দে প্রায় সকল স্থানেই ব্রাহ্মণ বুঝাইত। স্মৃতিগুলির মধ্যে শূদ্রদিগের উল্লেখ যথেষ্ট

আছে; কিন্তু সে উল্লেখ কি প্রকার, তাহা পরে দেখিব। দ্বিজাতির সমস্ত জীবন কি প্রকারে অতিবাহিত করিতে হইবে সেইগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

"আনিষেকাৎ শ্মশানান্তং", গর্ভে ভ্রূণের উৎপত্তি হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত যাহা কিছু কর্ত্তব্য সকলই নিয়মবদ্ধ হইয়াছে। শত শত বৎসর গৃহবিবাদে উচ্ছিন্নপ্রায় ব্রাহ্মণ্য-সমাজে যাহা কিছু পুরাতন ছিল প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন পুনরায় নূতন করিয়া সমাজ গঠিত হইতেছিল, সেই কারণে দৈনন্দিন ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণের জীবনের সকল প্রকার কর্ম্মের নিমিত্ত যাহা করা প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, সেইগুলি লিখিত হইয়াছে; পাছে শিথিলতা বা বিশৃঙ্খলতা ঘটে এই কারণে আজন্ম যাহা কিছু কর্ত্তব্য স্মৃতিমধ্যে তাহা কেবল নিয়মবদ্ধ হইয়াছিল এমন নহে, জন্মিবার পূর্ব্বেও পিতামাতাকে অনেক নিয়ম পালন করিতে হইত। গর্ভের স্পষ্টতায় নিষেকবিধি, তৃতীয় মাসে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন এই সকল নিয়ম পালন কর্ত্তব্য; ২৬ বিষ্ণুসংহিতা। জন্মদিনে জাতকর্ম্ম, জন্ম অশৌচান্তে নাম ধেয়, চতুর্থ মাসে আদিত্যদর্শন, ষষ্ঠ মাসে অন্নাশন, তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ, গর্ভাষ্টমে উপনয়ন, এই সকল বিধি পালনীয়; ২৭ অঃ বিষ্ণু। এই বিধিগুলি দ্বিজগণের পক্ষে, শূদ্র ও স্ত্রীলোকের সংস্কার নাই। ইহার পর গুরুকুলে বাস অথবা ব্রহ্মচর্য্যা; তাহার পর গৃহস্থ-আশ্রম-প্রবেশ, তাহার পর বানপ্রস্থ অবলম্বন ও শেষে সন্ন্যাস-আশ্রমের যাহা কিছু কর্ত্তব্য সে সকলই লিখিত আছে। তাহাদের সহিত এস্থানে আমাদের প্রয়োজন নাই। গুরুকুলবাসের সময়, যে সকল নিয়ম লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে

গুটিকতকের উল্লেখ অনাবশ্যক হইবে না। সে সময়ে যাহারা শিক্ষা করিত, তাহাদের মন কি ভাবে গঠিত হইত, তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইবে।

তিন জন অতি গুরু, মাতা, পিতা ও আচার্য্য। তাঁহাদের নিত্য শুশ্রূষা ও আজ্ঞাপালন বিধি। তাঁহাদের অনাজ্ঞায় ধর্ম্মাদি কার্য্য হিতজনক নয়। ইঁহারাই বেদত্রয়, সুরত্রয়, লোকত্রয় ও অগ্নিত্রয়। মাতৃভক্তিতে ইহলোক, পিতৃভক্তিতে মধ্যম লোক এবং আচার্য্য-ভক্তিতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়; ৩১ বিষ্ণুসংহিতা। তখন প্রায় সকলেই সবর্ণ ও অসবর্ণ উভয় প্রকার বিবাহ করিত। হীনবর্ণা গুরুপত্নীকে দূর হইতে অভিবাদন বিধি ছিল। গুরুগৃহে শিষ্যের অতিক্রান্তি, নিরাহার ও দিবসান্তে গুরুর প্রসন্নতাসম্পাদন কর্ত্তব্য, তাহার পরে শিষ্যের ভোজন বিধি। গুরুর অপ্রিয় কার্য্য অমঙ্গল-জনক। প্রবাসাগত যুবা শিষ্যের তদ্দিনে পাদগ্রহণ এবং প্রতিদিন ভূমিতে অভিবাদন বিধি; ৩২ বিষ্ণুসং। পঞ্চনখ অধ্যয়নস্থানমধ্যে গমন করিলে সেদিন অনধ্যায়। অনধ্যায়ের সময় অধ্যয়নে ইহ এবং অমুত্র ফল নাই এবং গুরুশিষ্যের উভয়েরই আয়ুঃক্ষয় হয়। এই হেতু অনধ্যায় ভিন্ন গুরু ব্রহ্মলোককামনায় সাধু শিষ্যকে বিদ্যাদান করিবেন। শিষ্যের অধ্যয়নের পূর্ব্বে ও পরে গুরুর পাদবন্দন বিধি। লৌকিক বা বৈদিক জ্ঞান-উপদেষ্টার দ্রোহাচরণ নিষেধ। অনাজ্ঞায় অন্যত্র হইতে বেদগ্রহণ নিষেধ, গ্রহণ করিলে বেদচৌর্য্য ও নরক অনিবার্য্য; ৩০ বিষ্ণুসংহিতা।

বেদরক্ষা তখন প্রধান চিন্তা—বেদ বুঝা পরের কথা, নিয়ম ছিল প্রথমে বেদপাঠ, পরে বেদাঙ্গ পাঠ; গুরুশিষ্যসম্বন্ধে অনেক বিধি

লিপিবদ্ধ হইয়াছে, নিয়মগুলির মধ্যে কোনটি দোষের নয়; কেন যে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাও আমরা জানি। কিন্তু এ প্রকার বিধিবন্ধনের যাহা পরিণাম ঘটে তাহাই ঘটিয়াছিল। মনুষ্যের মনের স্বাধীনতা এককালে হরণ করিয়া তাহাকে কেবল মাত্র আজ্ঞা প্রতি-পালক, ন্যায়-অন্যায়জ্ঞান-বিরহিত কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠিত করিবার চেষ্টা করিলে যে ফল হয়, এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। যবক্রীত ও রৈভ্যের উপাখ্যানে দেখিয়াছি লোকে তখন আচার্য্য ভিন্ন বেদ পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেছে, গুরোরপি দোষো বাচ্যঃ, প্রচলিত কথার মধ্যে হইল। আততায়ী গুরুকে বধ করিবে, আততায়ী শব্দের নানা অর্থ, তাহার মধ্যে এক অর্থ ধন ও যশ-লোপকারী। শিষ্যকে এইরূপ জীবনহীন পুতুল বানাইবার প্রথা আমাদের দেশে বোধ হয় সহস্র সহস্র বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের মনের ভাবও তদনুরূপ গঠিত হইয়াছে।

গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, নৈত্যিক কার্য্যের জন্যেও তদনুরূপ নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। গৃহে প্রাত্যহিক কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়েই শিথিলতা বা ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল সেই গুলি দূর করিতে এই প্রকার নিয়ম বন্ধন বোধ হয় প্রয়োজন হইয়াছিল। দন্তধাবনের কাষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিতে সতর প্রকার বিধি লিখিত আছে; ৬১ বিষ্ণুসং। আচমনের বিধি নয় প্রকার, স্নানের নিমিত্ত ৪২ প্রকার নিয়ম, অতিথিসৎকার করিতে ৪৫ প্রকার বিধি, ভোজন করিতে ৪৯ প্রকার, নিদ্রা যাইতে ১৭ প্রকার বিধি বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে; ৬২...৭০ অঃ বিষ্ণু-সংহিতা। এই নিয়মগুলি পাঠ করিবার উপযুক্ত, কতকগুলি উদাহরণ

দিতেছি। দন্তকাষ্ঠ-নির্ব্বাচন ও দন্তধাবনের জন্য যে সতর প্রকার বিধিনিষেধ লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে পাঁচটী নিয়মে কোন্ কোন্ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে নাই তাহার উল্লেখ আছে। মধুর ও অম্ল রসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ দূষণীয়; উর্দ্ধশুষ্ক দন্তকাষ্ঠ অমঙ্গলজনক, রন্ধ্র-যুক্ত দন্তকাষ্ঠ দোষাবহ নহে; পূতিগন্ধ ও পিচ্ছিল রসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ দূষণীয়। দক্ষিণ-পশ্চিম-আস্যে দন্তধাবন নিষেধ, উত্তর পূর্ব্বমুখে দন্তধাবন বিধি; চতুর্দ্দশ শ্লোকে কোন্ কোন্ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার উপযোগী তাহা লিখিত আছে। কষায়, তিক্ত, কটু দন্তকাষ্ঠ প্রশস্ত, দন্তকাষ্ঠ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি স্থূল ও দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ব্যবহার করা উচিত, মৌনে ব্যবহার বিধি, দন্তকাষ্ঠ শুচিদেশে প্রক্ষালনে গ্রাহ্য, অমাবস্যায় ত্যাগ বিধি।

আচমনের নিমিত্ত নয় প্রকার বিধি লিখিত আছে। দ্বিজাতির কনিষ্ঠ অঙ্গুলিমূলে প্রাজাপত্য, অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্ম, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈব, এবং তর্জ্জনীমূলে পিতৃতীর্থ। পবিত্র স্থানে নির্ম্মল শীতল জলে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে সুসংযতভাবে আচমন করিবে। ব্রাহ্ম তীর্থে ত্রি আচমন, দ্বি মুখমার্জ্জন ও চক্ষুরাদির ছিদ্র, মস্তক এবং হৃদয় স্পর্শ করিবে। আচমনজল ব্রাহ্মণের হৃদয়, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ এবং বৈশ্যের তালুগত হইবে; স্ত্রী ও শূদ্র-সম্বন্ধে ওষ্ঠ স্পর্শ মাত্রে শুদ্ধি।

পথগমন-সম্বন্ধে একান্ন প্রকার বিধি লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গুটিকতক উদাহরণস্বরূপ দিতেছি। মঙ্গল জন্য নৃপতি প্রাপ্ত হইবে; একাকী পন্থাগমন নিষেধ, অধার্ম্মিকের সহিত পথগমন দূষণীয়, শূদ্রসহ পথগমন নিন্দনীয়, শত্রুসহ পথগমন অশুভজনক, অতি প্রাতে গমন নিষেধ। সন্ধ্যাগমন ভয়হেতু দূষণীয়, মধ্যাহ্নগমন

দোষাবহ, জলসমীপে পন্থাগমন দূষণীয়, অতিবেগ গমন দোষাবহ, রাত্রিতে পথগমন ভয়াবহ। অন্ধ বা খঞ্জবাহন গমনে দূষণীয়; দুর্ব্বল বাহনকে পরিত্যাগ বিধি, গোযানে গমন নিষেধ, চতুষ্পথে অবস্থান নিষেধ, চতুষ্পথ-বন্দনাবিধি, দেবপ্রতিমা বন্দনীয়া, প্রজ্ঞানত বনস্পতি বন্দনাবিধি; অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গণিকা, পূর্ণকুম্ভ, আদর্শ, ছত্র, ধ্বজ, পতাকা, শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান ও নন্দাবর্ত্ত দক্ষিণাবর্ত্তে ইহাদিগকে অতিক্রম বিধি। তালবৃক্ষ, চামর, অশ্ব, গজ, গো, দধি, ক্ষীর, মধু, সিদ্ধার্থক, এই সকলের দক্ষিণাবর্ত্ত বিধান শুভভাক্। মত্ত, উন্মত্ত ও বিকলাঙ্গ-দর্শনে যাত্রা নিষেধ। কাষায়বাস, প্রব্রজিত, মলিনাদি দৃষ্টে যাত্রা নিষেধ। তৈল, গুড়, শুষ্কগোময়, তৃণপলাসভস্ম, অঙ্গার দৃষ্টে গমন নিষেধ। বৎসতরিলঙ্ঘন দূষণীয়, বর্ষাপাতে ধাবন নিষেধ। বৃথা নদীতরণ দোষাবহ, সন্তরণে নদীতরণ ভয়াবহ; ভগ্নতরণী-আরোহণ দূষণীয়, নদীকচ্ছে অবস্থান ভয়াবহ, কূপলঙ্ঘন ও কূপ-অবলোকন করিবে না; বৃদ্ধ, ভারী, রোগী, স্ত্রী, বরাদির পথ দেয়।

স্নানাদির নিমিত্ত বিয়াল্লিশটি বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহার মধ্যে কতকগুলি এই, পর-নিপানে স্নান নিষেধ, অজীর্ণে স্নান দূষণীয়, রাত্রিতে এবং উভয় সন্ধ্যায় স্নান নিষেধ। অপ্রক্ষালিত বস্ত্র পরিধান অশুভজনক; ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ ও পতিত সহ সম্ভাষণ নিষেধ। অবগাহনে আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রত্রয়, হিরণ্যবর্ণা ইতি মন্ত্রচতুষ্টয় এবং ইদমপে প্রবাহত ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাভিমন্ত্রণ-বিধি। তদনন্তর জলাবস্থানে ত্রি-অঘমর্ষণ-জপবিধি, অথবা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং এই মন্ত্র জপ করিবে, অথবা দ্রুপদা সাবিত্রী জপ বিধি; অথবা যুঞ্জতে মনঃ

এই অনুবাক জপ বিধি, কিংবা পুরুষসূক্ত জপ করিবে। বাসপরিবর্ত্তনে, জলাবতারে, তর্পণাদি বিধি। স্নানে আচমন ও বিধিবৎ মুখাদি ছিদ্র স্পর্শ বিধি, আদিতে দেবতীর্থে দেবতর্পণ বিধি, তদনন্তরে পিতৃতীর্থে পিতৃতর্পণ বিধি। আদিতে স্ববংশের তর্পণ করিবে, তাহার পর সম্বন্ধী বান্ধবের তর্পণ, তাহার পর সুহৃদ্-তর্পণ করিবে; নিত্যস্নায়ীর এই বিধি। অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা স্নানে ক্ষয় হয় ইহা নিশ্চয়। নিত্যস্নায়ীর যাম্য যাতনা দুঃখ হয় না, নিত্যস্নানে পাপকারী পবিত্র হয়। স্নান ও আচমনাদি পরে, দেবপ্রতিমায় বাসুদেব-অর্চ্চনা বিধি, তাহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ১৫ প্রকার বিধি আছে। আহারের জন্য যে ঊনপঞ্চাশ প্রকার বিধি আছে, তাহাদের মধ্যে গুটিকতক এই:—গ্রহণে ও গো-ব্রাহ্মণ-বিপদে ভোজন নিষেধ। অজীর্ণে ও অর্দ্ধরাত্রে ভোজন নিষেধ। মধ্যাহ্নে ভোজন দূষণীয়, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে বিধি। উভয় সন্ধ্যায় ভোজনে রোগী হয়; একবস্ত্রে ভোজন নিষেধ, ঊর্দ্ধজানু অবস্থায়, ছিন্নাসনে, ভগ্নপাত্রে, উৎসঙ্গস্থ পাত্রে ভোজন, কেবল ভূমিতে ভোজন, কেবল হস্ত-রক্ষায় ভোজন নিষেধ। পরের লবণাক্ত দ্রব্য ভোজন নিষেধ। একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভোজন নিন্দনীয়। রাত্রিতে তিলমিশ্রিত দ্রব্য ত্যাগ শুভ; দধিসহ শক্তু ভোজন দূষণীয়; আর্দ্র-পাত্রে আর্দ্রকরমুখে ভোজন দূষণীয়; চন্দ্র সূর্য্য তারকা দর্শন দূষণীয়; পূর্ব্বমুখে ভোজন প্রশস্ত, দক্ষিণ মুখে ভোজন দূষণীয় নয়। অন্নাভি-পূজনে ভোজন বিধি, অন্নাদি নিঃশেষে ভোজন নিষেধ, দধি, মধু, সর্পিঃ, মাংসাদি নিঃশেষে ভোজন দূষণীয় নয়; শূন্যগৃহে, অগ্নিগৃহে, দেবালয়ে ভোজন নিষেধ এবং কেবল হস্তে জলপান ও অধিক

ভোজন দূষণীয়। তৃতীয়বার ভোজন অপথ্য এবং উভয় সন্ধ্যাভোজন অশুভজনক।

স্মৃতি। (২)

স্মৃতিতে নৈত্যিক কর্ম্মের জন্য যে সকল বিধি লিখিত আছে, তাহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। শয়নের জন্য সতর প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আর্দ্রপদে শয়ন দূষণীয়, উত্তর পশ্চিম ও অবাক্ শিরায় শয়ন নিষেধ। আকাশে (ক্ষীণ অবলম্বনে) শয়ন দূষণীয়; পত্র শয়ন দূষণীয়; পঞ্চদারু পর্য্যঙ্কে শয়ন নিষেধ; ভগ্ন পর্য্যঙ্কে শয়ন নিষেধ; শ্মশানে, শূন্যগৃহে, দেবালয়ে শয়ন দূষণীয়; চপলমধ্যে শয়ন দূষণীয়; ধান্য, গো, গুরু, হুতাশন ও স্বর্ণ উপরি শয়ন দূষণীয়। উচ্ছিষ্ট অবস্থায়, দিবসে, উভয় সন্ধ্যায়, ভস্মে, অশুচিদেশে, সিক্ত ভূমিতে ও পর্ব্বতাগ্রে শয়ন দূষণীয়; ৭০ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

এই সকল হইল স্নান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মের উদাহরণ। এতদ্ভিন্ন যাহাকে আচরণ ধর্ম্ম বলা যায়, অর্থাৎ এক অপরের সহিত কিরূপ আচরণ করিবে সে সম্বন্ধেও নিয়ম লিখিত আছে। গুটিকতক উদাহরণ দিতেছি,—কাহাকেও অবমাননা বিধি নহে, হীনাদিতে উপহাস নিন্দনীয়, হীন (শূদ্র)-সেবায় অমঙ্গল হয়, বয়ঃ-অনুরূপ বেশ অনিন্দনীয়। বিদ্যা, বংশ, ধন ও দেশ-অনুরূপ আচরণ বিধি। উদ্ধত বাক্ দূষণীয়, নিত্য শাস্ত্রাদি অবেক্ষণ বিধি। বিত্ত-বর্ত্তমানে মলিন বাসাদি ত্যাগ বিধি, যষ্টি অর্থে বেণুদণ্ড-গ্রহণ বিধি। ব্রতী স্বর্ণকুণ্ডলধারী হইবে, উদয়মান ও অস্তগত আদিত্য দেখিতে নাই; ক্রোধী গুরুর তৎকালে দূরে অবস্থান বিধি; তৈলাদি মলিন

ও মলযুক্ত আদর্শ নিন্দনীয়, পত্নীর ভোজনকালে দর্শন নিন্দনীয়; আলানভ্রষ্ট হস্তী-দর্শন অশুভদায়ী; বিষমস্থিত বৃষাদি-যুদ্ধ দর্শন দূষণীয়; পানমত্ত-পুরুষ-দর্শনে আনন্দ নিষেধ, রোগাদি প্রমত্তকে দর্শন নিন্দনীয়, অগ্নিতে বিষপ্রক্ষেপ নিষেধ। অগ্নিলঙ্ঘন দোষাবহ; কেবল পদদ্বারা অগ্নিতাপগ্রহণ নিষেধ। কুশাসনে পদমার্জ্জন নিষেধ। কাংসপাত্রে পদার্পণ নিষেধ, পদদ্বারা পদাক্রম নিন্দনীয়, লোষ্ট্রমর্দ্দন দূষণীয়, দন্তদ্বারা কেশ ও নখচ্ছেদ দূষণীয়, দ্যূতক্রীড়া অমঙ্গল-বিধায়িনী। বালাতপ-সেবা অহিতকারিণী। উভয় হস্তযোগে মস্তক ও উদর কণ্ডূয়ন নিষেধ। দধি ও পুষ্প প্রত্যাখ্যান নিষেধ, নিদ্রিতকে প্রতিবোধন নিষেধ, দুগ্ধপানরত বৎস বারণ দূষণীয়, বৈদ্যহীন দেশে বাস অশুভজনক, বৃথাচেষ্টা দূষণীয়, নৃত্যগীতে কালক্ষেপ নিন্দনীয়, হস্তে বাদ্যবাদন নিন্দনীয়, মিথ্যাভাষণ অশুভ-জনক, অপ্রিয়বাক্ ত্যাগ বিধি, সর্প বা শস্ত্র-ক্রীড়া দূষণীয়, পরের দণ্ডদান দূষণীয়, শাসনার্হকে শাসন বিধি। লোকনিন্দনীয় ধর্ম্ম দূষণীয়, সর্ব্বদা অলঙ্কৃত থাকিবে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ধর্ম্মকামনায় শ্রুতি, স্মৃতি ও সাধু-নিষেবিত আচার পালন করিবে। আচার সেবায় আয়ু, ঈপ্সিত গতি, অক্ষয় ধন লাভ ও অলক্ষ্মী দূর হয়। সর্ব্বলক্ষণ-হীন পুরুষ কেবল আচার সেবায় জীবিত হয়, এতদ্ভিন্ন চিত্তসংযমের নিমিত্ত সাত প্রকার বিধি লিখিত আছে। ইন্দ্রিয়সংযম, দম, যম, নিয়মাদি অনুষ্ঠান বিধি; দম পবিত্র, মঙ্গলের হেতু। এক দমপ্রভাবে ইচ্ছা পূর্ণ হয়; সমগ্র নদীজল যেমন অচঞ্চল সমুদ্রে প্রবেশ করে তদ্বৎ যাঁহাতে কামনা লীন হয়, তিনি সুখী।

আচরণসম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতায় যে সকল বিধি লিখিত আছে

তাহার গুটিকতক উদাহরণ এস্থানে দিলাম। ইহাদের ব্যতীত অপরাপর সময়ে কি করা উচিত বা অনুচিত তাহারও যথেষ্ট নিয়ম লিখিত আছে। সেগুলি বিস্তারিত ভাবে দিবার প্রয়োজন নাই, তবে কি প্রসঙ্গে কতগুলি বিধি বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে, নিম্নে তাহার এক তালিকা দিলাম।

রাজধর্ম্ম ৭০ প্রকার বিধি, মানলক্ষণ ১৪ প্রকার বিধি, অগ্নি-পরীক্ষা ১২ প্রকার বিধি, দণ্ডবিধি ১৯২ প্রকার, উদক-পরীক্ষা ৮ প্রকার, ঋণদান বিধি ৪৩ প্রকার, বিষপরীক্ষা ৭ প্রকার, লেখ্য বিধি ১৩ প্রকার, কোষ-পরীক্ষা ৫ প্রকার, অসাক্ষী বিধি ৪০ প্রকার, বর্ণভেদ ১৮ প্রকার বিধি, শপথ-নিয়ম ৩৩ প্রকার, ধন-বিভাগ ২৩ প্রকার বিধি ও তুলানিয়ম ১৩ প্রকার, ঋক্‌থবিভাগ ৪৪ প্রকার বিধি, মৃত ব্রাহ্মণের শূদ্রবহনাদি নিষেধ ২৪ প্রকার বিধি, কাল বিধি ৫৩ প্রকার। অশৌচান্তে বিধি ২৩ প্রকার, অশৌচান্ন-গ্রহণে প্রায়শ্চিত্ত ২০ প্রকার বিধি। ব্রাহ্মণের হীনবর্ণ পত্নী, সপিণ্ড ও দান-সম্বন্ধে অশৌচবিধি ২৩ প্রকার। গর্ভস্রাব ও জাত মৃতাদির অশৌচ-বিধি ২৩ প্রকার। রাজা, যাজ্ঞিক, আত্মঘাতী ও পতিতাদির অশৌচ বিধি ১৩ প্রকার। স্পর্শাশৌচ বিধি ৮ প্রকার, আচমন ও প্রক্ষালনে শুদ্ধি বিধি ৬ প্রকার। মলাদি প্রমাণ, ও সংক্ষেপ শারীরিক শুদ্ধিবিধি ১৩ প্রকার। দ্রব্যশুদ্ধি ৬১ প্রকার। ব্রাহ্মণাদি পত্নী বিবাহলক্ষণ ও কন্যাধর্ম্ম বিধি ৪১ প্রকার, স্ত্রীধর্ম্ম বিধি ১৭ প্রকার। সপত্নী ধর্ম্মাচরণ বিধি ৭ প্রকার। নিষেক ও উপনয়নাদিকাল, দণ্ডমেখলাদি বিধি ২৯ প্রকার। ব্রহ্মচারীর গুরুগৃহে বাস বিধি ৫৩ প্রকার। আচার্য্য উপাধ্যায়াদির প্রমাণ ও বেদদানবিধি ১০ প্রকার, বেদাধ্যয়ন-

বিধি ৪৭ প্রকার। অতিগুরু বিভাগ ১০ প্রকার। গুরু-অভিবাদন বিধি ১৮ প্রকার।

হিন্দুদিগের জীবনের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা এই সকল বিধিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্যের উল্লেখ নাই, দেশ, জাতীয়তা, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থসঞ্চয়, পরোপকার, পরস্পর সাহায্য, ভ্রাতৃভাব, দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি, ইহার এক বর্ণও নাই। তাহার পর ব্রাহ্মণের প্রভুত্বরক্ষার এক মহা অস্ত্র নির্ম্মিত হইল, সে কথা পরে বলিব।

পুরুষের রিপু ৬ প্রকার, অতিপাতক ২ প্রকার, মহাপাতক ৬ প্রকার, উপপাতক ৩৫ প্রকার, পাতকতুল্যতা ৮ প্রকার, জাতি-ভ্রংশ পাতক ৭ প্রকার। সঙ্করীকরণ পাতক দুই প্রকার। অপাত্রী-করণ পাতক ২ প্রকার, মলিনীকরণ পাতক ৫ প্রকার। প্রকীর্ণ পাতক দুই প্রকার। নরকসংখ্যা ও পাতকীর গতি ৪৬ প্রকার বিধি। পাতকভেদে তির্য্যক্ জাতি প্রাপ্তি সম্বন্ধে ৪৫ প্রকার বিধি লিখিত আছে। নরকভোগ ও তির্য্যক্ জাতিবিমুক্ত মনুষ্যের লক্ষণ ৩৩ প্রকার। কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত বিধি ২৫ প্রকার। চান্দ্রায়ণ বিধি ১০ প্রকার, যাবকান্ন ভোজন বিধি ২২ প্রকার। তিথিবিশেষে বাসুদেব-অর্চ্চনা ও পাতকক্ষয় বিধি ১০ প্রকার। পাতকভেদে প্রায়শ্চিত্ত বিধি ৫১ প্রকার, অভোজ্যভোজনাদি প্রায়শ্চিত্ত ৭৮ প্রকার, অগম্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত ৯ প্রকার। চৌর্য্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি ১৭ প্রকার। সংকীর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি ৩৪ প্রকার। সর্ব্ববেদসম্মত শুদ্ধি ২৭ প্রকার, পরিত্যাগ বিধি ১৬ প্রকার, গৃহীর ত্রিবিধ অর্থ বিধি ১২ প্রকার, রহস্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি ২১ প্রকার। দন্তকাষ্ঠাদি বিধি ২১ প্রকার,

দৈবাদি তীর্থ ও আচমন বিধি ৯ প্রকার। গৃহীর পাকযজ্ঞবিধি ৩০ প্রকার, নিদ্রাত্যাগ ও প্রাতঃকৃত্যাদি বিধি, ২৬ প্রকার। গমনাদি বিধি ৫১ প্রকার, স্নানাদিবিধি ৪২ প্রকার, জলে বা দেব-প্রতিমায় বাসুদেব-পূজাবিধি ১৫ প্রকার। পুষ্পাদি নিশা কর্ত্তব্য বিধি ১৫ প্রকার। শ্রাদ্ধে চরুহোম বিধি ৪৫ প্রকার, উপরাগে ভোজনাদি নিষেধ বিধি ৪৯ প্রকার, শয়নাদিবিধি ১৭ প্রকার। অনিন্দ্য কর্ত্তব্য বিধি ৯০ প্রকার। চিত্তসংযমবিধি ৭ প্রকার, শ্রাদ্ধবিধি ৩১ প্রকার, পিত্রাদি জীবিতে শ্রাদ্ধে বিধি ৮ প্রকার। অষ্টকা অন্বষ্টকাকাল ও অমাবস্যাদি বিধি ২ প্রকার। কাম্যশ্রাদ্ধবিধি ৯ প্রকার, বার ও নক্ষত্র শ্রাদ্ধবিধি ৫৩ প্রকার, শ্রাদ্ধীয় উদক বস্ত্রপুষ্পাদিবিধি ২৪ প্রকার। বিভিন্ন দ্রব্যাদি দানে পিতৃলোক তৃপ্তি বিধি ১৪ প্রকার। শ্রাদ্ধান্নরক্ষাদি বিধি ২৩ প্রকার, শ্রাদ্ধে বিশুদ্ধব্রাহ্মণ-পরীক্ষা বিধি ৩০ প্রকার। পংক্তিপাবনবিধি ২১ প্রকার। শ্রাদ্ধস্থানবিধি ৪ প্রকার, তীর্থাদি শ্রাদ্ধবিধি ৬৭ প্রকার, বৃষোৎসর্গবিধি ২০ প্রকার, সর্ব্বদূরিত নাশবিধি ১০ প্রকার। গোরূপা ভূমিদান বিধি ৪ প্রকার। কার্ত্তিক মাস কীর্ত্তনবিধি ৪ প্রকার। নক্ষত্রযোগে মার্গশীর্ষাদি পূর্ণিমাকৃত্য ১৬ প্রকার বিধি। তৃতীয়াদি তিথিতে ব্রাহ্মণ প্রীতি ও নিত্যস্নানকৃত্য ১৩ প্রকার, নক্ষত্রযোগে মার্গশীর্ষাদি পূর্ণিমাকৃত্য ১৪ প্রকার। দানাদি ফলবিধি ৩৩ প্রকার, কূপাদি কর্ত্তার ফলাবাপ্তি বিধি ১৯ প্রকার। পাত্রক্রমে দানাধিক্যাদি প্রাপ্তিবিধি ১৪ প্রকার। বানপ্রস্থ বিধি ১৩ প্রকার। বানপ্রস্থের তপস্যাবিধি ১৭ প্রকার। প্রব্রজ্যাশ্রম ও মুমুক্ষুকৃত্যবিধি ৯৭ প্রকার। মুমুক্ষু স্নানাদিবিধি ২০ প্রকার।

বৌদ্ধবিপ্লবের পর যে নূতন হিন্দুসমাজ স্থাপিত হইল তাহাতে

ব্রাহ্মণের কি প্রকার স্থান হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি হিন্দুসমাজ এক সময়ে ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল, এখন সমাজ ব্রাহ্মণপ্রধান হইল। সমাজমধ্যে দণ্ড দিবার ভার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ের ছিল; এখন নিয়ম হইল, রাজা সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণসহ স্বয়ং ব্যবহার দর্শন করিবেন বা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন; ৫০—৩ অঃ বিষ্ণুসংহিতা। রাজ-অধিকারে ব্রাহ্মণ এবং অন্য সাধু ক্ষুধাকাতর হওয়া নিন্দনীয়; ৫৬—৩ অঃ বিষ্ণু। এ শ্লোকটি হইতে দেখা যায় যে, তখনও সাধু শব্দ ব্যবহৃত হইত; এখন সাধু অর্থে সন্ন্যাসীদিগকে বুঝায়। শ্লোকটি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তখনও সন্ন্যাসিগণ যে কোন সম্প্রদায়-অন্তর্গত হউন না কেন, ব্রাহ্মণদের সহিত উদরপূর্ত্তির সম্বন্ধে সমান স্থান অধিকার করিতেন; ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই; মহাপাতক ব্রাহ্মণ কৃতচিহ্নে নির্ব্বাসিত হইবে; ২৫—৫ অঃ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্ববিধ দান প্রদান বিধি; ৬০—৩ অঃ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণদের করদান নাই। ব্রাহ্মণ হইলেন ধর্ম্মকরদ; রাজা তাঁহার ধর্ম্মের এক অংশের অধিকারী ইহাই ব্রাহ্মণের কর। নিমন্ত্রণে ভোজন, বোধ হয় সে সময়ে এক মহা ব্যাপার ছিল। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ-অতিক্রমে এবং নিমন্ত্রিতকে ভোজন-অদানে পঞ্চবিংশতি পণ দণ্ড; ৯৪—৫ অঃ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণকে অভক্ষ্য ভোজনদানে ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ড (৯৭—৫ অঃ বিষ্ণু-সংহিতা), জাতিনাশক অভক্ষ্যদানে শত সুবর্ণ দণ্ড এবং সুরাদানে হত্যা বিধি।

হিন্দুসমাজে চতুর্ব্বর্ণ থাকিবার কথা; অতি অল্প স্থানেই চতুর্ব্বর্ণ অবশিষ্ট ছিল। দেশের অধিকাংশ ভাগে রহিল প্রধানতঃ শূদ্র; শূদ্রদের সম্বন্ধে যে প্রকার বিধি হইল তাহা আমরা সকলেই অল্প

বিস্তর জানি। নমুনার স্বরূপ গুটিকতক এস্থানে দিতেছি। অস্পৃশ্য জাতির স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণাদি স্পর্শে যথার্হ দণ্ডবিধি (১০৩—৫ অঃ বিষ্ণু), হীনবর্ণ যদঙ্গে অধিক বর্ণের অপরাধ করিবে, তদঙ্গ ছেদন বিধি (১৯—৫অঃ বিষ্ণু), হীনবর্ণ উৎকৃষ্টসহ একাসনে অবস্থান করিলে তাহার কটিদেশ কৃতাঙ্ক করিয়া বিবাসন বিধি (২১—৫ বিষ্ণু)। দ্বিজাতির শূদ্র-শবানুগমনে ত্রি-অঘমর্ষণ, নদীস্নান ও অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী বিধি; ৬২—২২ বিষ্ণু। চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছ সম্ভাষণে আচমনে শুদ্ধি; ৭৫—২২অঃ বিষ্ণু। শূদ্রা স্ত্রী সহ দ্বিজাতির ধর্ম্মাচরণ নিষেধ; ৪—২৬ অঃ বিষ্ণু।

শূদ্রা ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে নয়, রাগান্ধের রতি ভার্য্যায় ব্যবহৃত হয়; ৫—২৬ অঃ বিষ্ণু। হীনাস্ত্রী-পরিণয়ে কুল শূদ্রতায় পরিণত হয়; ৬—২৬ অঃ বিষ্ণু। শূদ্রা ভার্য্যায় দৈব পিতৃ ও অতিথি তুষ্ট নয় এবং পরিণেতা নারকী হয়; ৭—২৬ অঃ বিষ্ণু। শূদ্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার নামের নিমিত্ত নিন্দিত পদপ্রয়োগ বিধি; ৯—২৭ অঃ বিষ্ণু। শূদ্রপতিতাদি-সমীপে বেদ-অধ্যয়ন নিষেধ; ১৪—৩০ অঃ বিষ্ণু। উপরে শূদ্রদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা কথিত হইল, তবে তাহার সহিত উল্লেখ প্রয়োজন যে,—গাভী বসিলে তাহার সহিত উপবেশন বিধি ও গাভী দণ্ডায়মানে তদনুরূপ গোব্রতে আচরণ বিধি; ৫০ অঃ বিষ্ণু। অস্থিমান্ সহস্র প্রাণী ও অনস্থি শকটপ্রমাণ প্রাণিবধে, শূদ্রহত্যায় যে ব্রত বিহিত আছে তাহাই বিধি; ৫০ অঃ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণদের ভিতর অনেক দোষ লক্ষিত হইত, যাহারা এই সকল দোষে লিপ্ত হইত তাহাদের হইতে পৃথক্ থাকিতে সুব্রাহ্মণেরা আহারসম্বন্ধে ও তাহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতে নিয়ম করিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে অযথা-কৃষিকারী, বিড়ালব্রতী, বৃথাচিহ্নধারী, গ্রহাচার্য্য, দেবল, চিকিৎসক, বহুযাজী, গ্রামযাজক, শূদ্রযাজক, অযাজ্যযাজী, ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী, পর্ব্বকারক, সূচক, গ্রহ-অধ্যাপক, বৃত্তিদানে অধ্যেতা, শূদ্রান্নপুষ্ট ব্রাহ্মণ, পতিতসংসর্গী ব্রাহ্মণ, অনধীত ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা-উপাসনাত্যাগী ব্রাহ্মণ, রাজসেবক, পিতৃদ্বেষী, পিতৃ-মাতৃ-গুরু-অগ্নি-অধ্যয়নত্যাগী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ নিষেধ; ৮২ অঃ বিষ্ণুসংহিতা। তপঃপরায়ণ, সত্যপরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, গায়ত্রী-জপপর, ব্রহ্মবিবাহ-উৎপন্ন বিশুদ্ধ সন্তান, ত্রিসুপর্ণ-অধ্যায়ী (ত্রিসুপর্ণ ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের একাংশ), বিশুদ্ধ জামাতা, বিশুদ্ধ দৌহিত্র, ইহারা সকলেই নিমন্ত্রণযোগ্য ও পংক্তিপাবন; কিন্তু এই সকলের অপেক্ষা যোগাভ্যাসনিরত ব্রাহ্মণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ৮৩ অঃ বিষ্ণু। এই অংশ হইতে সে কালের সমাজের অবস্থাসম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখন ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, বেদের অংশ মাত্র পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইত। মহাভারতের সময় শ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদের নিম্নে গায়ত্রী মাত্র-জপকারী ব্রাহ্মণ ছিল। অসবর্ণ-বিবাহের তখনও বোধহয় অধিক প্রচলন ছিল; সেই কারণে ব্রহ্মবিবাহ-উৎপন্ন বিশুদ্ধ সন্তান, বিশুদ্ধ জামাতা, বিশুদ্ধ দৌহিত্রের এইপ্রকার বিশেষ সম্মান। সকলের অপেক্ষা বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী যে যোগপন্থাবলম্বীরা এখন সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। যে সকল যোগাভ্যাসনিরত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, তাহারা সকলেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। শিব-উপাসকদিগের মধ্যে যোগপন্থা গাঢ়ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, এ সকল ব্রাহ্মণেরা গৃহী যোগী ছিলেন, তাহাদের অনুরূপ আমরা পরে গৃহী বৈষ্ণব দেখিতে পাই।

নূতন ব্রাহ্মণসমাজ যাহা গঠিত হইবার চেষ্টা হইতেছিল, তাহার বিধিনিয়ম দেখিলে সেই সমাজ-গঠনকালে বিশেষ উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক ধর্ম্মে পরহিতকর কর্ম্ম মনুষ্যের কর্ত্তব্যের সঙ্গে পরিগণিত হইত; স্মৃতিধর্ম্মে পরহিতকর কর্ম্ম করিতে লোভপ্রদর্শন করিতে হইল। কূপখনন-কর্ত্তার অর্দ্ধপাপ নাশ হয়, তড়াগকর্ত্তার বরুণলোক লাভ হয়, জলদানে সদা তৃপ্ত হয়। বৃক্ষরোপণকর্ত্তার পরলোকে বৃক্ষসকল পুত্ররূপে প্রকাশ পায়। বৃক্ষদানে, বৃক্ষপ্রসূনে দেবতা তুষ্ট হয়; বর্ষণকালে বৃক্ষজলে পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। সেতুনির্ম্মাতা স্বর্গভাক্ হয়; দেবায়তনকর্ত্তা তল্লোকভাক্ হয়। দেবায়তন-মার্জ্জনে গন্ধর্ব্বলোক লাভ হয়। দেবতাকে পুষ্পপ্রদানে শ্রীমান্ হয়; দেবায়তনে অনুলেপন দানে কীর্ত্তি হয়, দীপপ্রদানে চক্ষু উত্তম ও উজ্জ্বল হয়, অন্নপ্রদানে বলবান্ হয়, ধূপপ্রদানে উর্দ্ধগামী হয়। দেবনির্ম্মাল্য পুষ্পচয়নে গোদান-ফললাভ হয়। দেবালয়মার্জ্জন, অনুলেপন, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন পদপ্রক্ষালন ও অসুস্থসেবায় গোদান-ফললাভ হয়; ৯১ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

ব্রাহ্মণের প্রধান উপজীবিকা হইল ভিক্ষা, দানের নিমিত্ত দাতৃগণকে লোভপ্রদর্শন প্রয়োজন হইল। তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতার শুভফল হয়; ভিন্ন ভিন্ন দানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শুভ ফলের তালিকা প্রস্তুত হইল। ভূমিদানে ঈপ্সিত লোক প্রাপ্ত হয়, গোচর্ম্মপ্রমাণ ভূমি-দানে সর্ব্বপাপমুক্তি হয়, গোপ্রদানে স্বর্গলোক লাভ হয়। দশটি গাভী দানে গোলোক প্রাপ্তি হয়, শতধেনু-দানে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, দান্ত বলশালী বৃষভ-

দান দশধেনু তুল্য। অশ্বদাতার সূর্য্যলোক লাভ হয়, বস্ত্রপ্রদানে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়, সুবর্ণপ্রদানে অগ্নিসালোক্য লাভ হয়, রৌপ্য-দানে কান্তিলাভ হয়, তৈজসপাত্র-প্রদানে সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ হয়। ঘৃত মধু তৈল-প্রদানে আরোগ্যলাভ হয়, ঔষধপ্রদানে ব্যাধিশূন্য হয়, ধান্যপ্রদানে তৃপ্তিলাভ হয় ও লবণপ্রদাতার লাবণ্য হয়; ৯২ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

রাজার নিধিলাভে অর্দ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, অর্দ্ধ কোষে রক্ষা বিধি। আমরা সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান, ব্রাহ্মণের অধ্যয়নপ্রণালী, ব্রাহ্মণের উপজীবিকা দেখিলাম, ব্রাহ্মণ নিজের ও পরের জন্য নৈত্যিক ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাও কতক কতক দেখিলাম; এখন নূতন সমাজ গঠন করিতে তাঁহারা কিরূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার কিছু উদাহরণ দেখিব। দেশের শাসনকর্ত্তা অন্ততঃ নামে শাসনকর্ত্তা ক্ষত্রিয় ছিলেন। অপরাধের জন্য দেশের রাজাকর্ত্তৃক দণ্ডবিধান চিরদিনই রাজকার্য্য বলিয়া পরিগণিত, তখনও তাহাই হইত; ব্রাহ্মণ বিচারকার্য্যে সাহায্য করিতেন, কোথাও বা নিজেরাই বিচার করিতেন। দণ্ড নানাবিধ ছিল, বধ-বন্ধন পর্য্যন্ত, কারাগার, অঙ্গচ্ছেদন, বিবাসন, বিরূপকরণ, কায়িক দণ্ড, অর্থদণ্ড এ সকলই প্রচলিত ছিল। দেশে চিরদিনই অপরাধ আছে, ও তাহার সহিত দণ্ড আছে, কিন্তু আমরা স্মৃতিতে আর একপ্রকার দণ্ড দেখিতে পাই। অপরাধ ও দণ্ডের স্থলে পাতক ও প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দেখিতে পাই, পাতক আর অপরাধ মধ্যে যে প্রভেদ আছে সে সম্বন্ধে এস্থলে বিস্তারিত বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণেরা অপরাধকে

পাতক নাম দিলেন তাহা সংক্ষেপে এই--লোকে পাতক করে কেন? সে সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে, কাম ক্রোধ লোভাখ্য পুরুষের রিপু আছে, এই রিপুত্রয়-সাহায্যে লোকে পাতকাদিতে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল অপরাধের নাম হইল পাতক, এই পাতকগুলি ৮ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর পাতক, সঙ্করীকরণ পাতক, মলিনীকরণ পাতক, এবং প্রকীর্ণ পাতক। উপরোক্ত রিপুত্রয়-সাহায্যে মহাপাতক অতিপাতক এবং অনুপাতকাদিতে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় এবং জাতিভ্রংশ, সঙ্করীকরণ ও অপাত্রীকরণ পাতকে তাহাদের বুদ্ধি হয়, রিপু সাহায্যেই পুরুষ মলাবহ ও প্রকীর্ণপাতকী হয়। এই রিপুত্রয় আত্মার নরকদ্বার, অতএব ত্যাগবিধি; ৩৩ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

এখন যেসকল পাতক কথিত হইল, তাহাদের উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। মাতৃ, দুহিতৃ, বধূ গমন অতিপাতক। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ, গুরুদারগমন ইহারা মহাপাতক। ইহাদের সংসর্গীও মহাপাতকী, সংবৎসর এইসকল পতিতদিগের আলাপে পতিত হয়; ইহাদের সহিত এক যান শয়ন ভোজনাদিতে পতিত হয়; ইহাদের সহিত যোনি ও যজ্ঞসম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। যজ্ঞনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের হত্যা, রজস্বলা কিংবা গর্ভবতী, অত্রিগোত্রোদ্ভবা স্ত্রী-বধ, অবিজ্ঞাতগর্ভ ও শরণাগত-বিনাশ ব্রহ্মহত্যাতুল্য, ইহাদের নাম অনুপাতক। কূটসাক্ষী ও সুহৃদ্‌ঘাতন সুরাপানতুল্য। পিতৃব্য, মাতুল, মাতামহ, শ্বশুর ও নৃপপত্নী-গমন গুরুদারগমন তুল্য, ইহারা অনুপাতক। এইরূপ অনুপাতকের আরও উল্লেখ ছ। উৎকর্ষহেতু মিথ্যাপ্রয়োগ উপপাতক, গুরুর পরিবাদ

উপপাতক, বেদবিষয়ে নিন্দা উপপাতক ; অধ্যয়নবিস্মৃতি উপপাতক, অগ্নি, মাতৃ, পিতৃ, পুত্রদারা অযথাত্যাগ উপপাতক ; অভোজ্যান্ন-ভক্ষণ ও অভক্ষ্যগ্রহণ উপপাতক ; পরধন-অপহরণ, পরদারে আসক্তি, অযাজ্যপাতকী-যাজন, অবিক্রেয়দ্রব্যাদি-বিক্রয়, অবিবাহিতজ্যেষ্ঠ-সত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ, বেতনগ্রহণে অধ্যাপনা, বেতনদানে বেদাদি-অধ্যয়ন, এসকল উপপাতক। দ্রুম, গুল্ম, বল্মী, লতা, ঔষধাদি-হিংসায় উপপাতক হয়, অসৎ শাস্ত্রাদি-অধ্যয়ন ও নাস্তিকতায় উপপাতক হয়।

প্রহারাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে ক্লেশপ্রদান জাতিভ্রংশ পাতক। অঘ্রেয় দ্রব্য ও মদ্য আঘ্রাণ (সেবন) জাতিভ্রংশ পাতক, ব্রাহ্মণাদির প্রতি কৌটিল্য আচরণ জাতিভ্রংশ পাতক। গ্রাম্য ও আরণ্য পশু-হিংসায় সঙ্করীকরণ পাতকী হয়। নিন্দিতকে ধনদান, বাণিজ্য কুসীদ অসত্য ব্যবহার ও শূদ্রসেবা এই সকলকে অপাত্রীকরণ পাতক বলে। জলচর ও স্থলচর পক্ষী বিনাশ ইহাকে মলিনীকরণ পাতক বলে। কৃমিকীটাদি-ঘাতন ও মদ্যানুগত ভোজন মলিনী-করণ পাতক। যে সকল পাতক উক্ত হইল না, তাহাদিগকে প্রকীর্ণ পাতক বলে। অপরাধকে পাতক নাম দিয়া এই উপায়ে সমাজ-শাসনের ক্ষমতা ব্রাহ্মণের হস্তে আসিল। দণ্ড কি ভাবে ক্ষত্রিয়ের হাত হইতে ব্রাহ্মণের হাতে গিয়াছিল এবং কিভাবে দেশ, সমাজ ও গৃহ ব্রাহ্মণের শাসনাধীন হইয়াছিল, উপরের উদাহরণ হইতে তাহা কিয়দংশে বুঝা যায়। নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, কূটসাক্ষী, বাণিজ্য, কুসীদগ্রহণ, ব্যভিচার, পিতামাতাপত্নীত্যাগ, বেদনিন্দন, অর্থদানে অধ্যয়ন, অথবা অর্থগ্রহণে অধ্যাপন, পশুপক্ষিহত্যা, এ সকলই

হইল ব্রাহ্মণের বিচারাধীন। এই সকল অপরাধের নাম হইল পাতক; কারণ, ইহারা পূর্ব্বকথিত মনুষ্য-রিপু হইতে জন্মে, এবং পাতকের প্রতিবিধানকর্ত্তা হইলেন ব্রাহ্মণ। এ সব স্থলে রাজাজ্ঞার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে রাজাজ্ঞায় মাণ্ডব্য মুনিকে শূলে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। বিনানুমতিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বৃক্ষ হইতে কুল খাওয়া অপরাধে রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণ লিখিতের এক হস্ত ছেদন হইয়াছিল, এখন ব্রাহ্মণ এপ্রকার অপরাধের নাম দিলেন পাতক এবং ব্রাহ্মণ নিজে হইলেন তাহার বিচারকর্ত্তা।

অপরাধ করিলে ব্রাহ্মণ যে দণ্ড নিরূপিত করিয়াছিলেন, সে দণ্ডের নাম হইল প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পরলোকে নরকাদি-দণ্ডভয়, তাহার পর জন্মান্তরে দণ্ডভয়। পূর্ব্বে অপরাধ করিলেই রাজ দ্বারে দণ্ড ভোগ করিতে হইত; এ স্থলে অপরাধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি হইল; সে প্রায়শ্চিত্তের বিধানকর্ত্তা হইলেন ব্রাহ্মণ। এই প্রায়শ্চিত্তের গুটিকতক উদাহরণ দিতেছি। "কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত বিধি"—তিন দিন উপবাস থাকিবে, ইহার পরে অনুবৃত্তি থাকিবে; প্রত্যহ ত্রিষবণ স্নান বিধি, প্রতি স্নানে বারত্রয় মজ্জন বিধি, প্রতিবারে ত্রি অঘমর্ষণ জপ করিবে, দণ্ডায়মানে দিবা-অতিক্রম বিধি, উপবেশনে নিশা-অতিক্রম করিবে, কর্ম্মান্তে দুগ্ধবতী গাভীদান বিধি, ইহার নাম কৃচ্ছ্র-অঘমর্ষণ প্রায়শ্চিত্ত। ত্র্যহ সায়ং, ত্র্যহ প্রাতঃ, ত্র্যহ অযাচিত অন্নভোজন ও ত্র্যহ উপবাসে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হয়। ত্র্যহ উষ্ণোদক, ত্র্যহ উষ্ণঘৃত, ত্র্যহ উষ্ণ দুগ্ধ ও ত্র্যহ উপবাস, ইহা হইল তপ্তকৃচ্ছ্র; এই সকল শীতলগ্রহণে শীতকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত হয়। একবিংশতি অহ দুগ্ধমাত্র পানে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত

হয়। মাসাবধি শক্তুমিশ্রিত উদক-আহারে উদককৃচ্ছ্র সাধ্য হয়। মাসান্ত মৃণালভোজনে মূলকৃচ্ছ্র সাধ্য হয়। এইরূপ বিল্বভোজনে শ্রীফলকৃচ্ছ্র হয়। মাসাবধি পদ্মবীজভোজনেও শ্রীফলকৃচ্ছ্র সাধ্য হয়। নিরাহারে দ্বাদশাহক্ষপণে পরাক্ সাধ্য হয়। সকুশোদক পঞ্চগব্য-ভোজনে একাহ এবং দ্বিতীয় দিন উপবাসে সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত সাধ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগব্যে ষষ্ঠ দিন ক্ষেপণ এবং একাহ উপবাস এই সপ্তদিন সাধ্য মহাসান্তপান। একটিতে তিনদিন ক্ষেপণ এবং ত্র্যহ উপবাস এই একবিংশতি দিন সাধ্য অতিকৃচ্ছ্র সান্তপন। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, উদক, শক্তু, উপবাসপূর্ব্বক ক্রমানুরূপ অভ্যবহারে তুলাপুরুষ প্রায়শ্চিত্ত। কুশ, পলাশ, উড়ুম্বর, পদ্ম, শঙ্খপুষ্পী, বট, ব্রাহ্মী, একটি ক্রমে ইহাদের ক্বাথপানে সপ্তাহ সাধ্য পর্ণকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত। সকল কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তসাধনে মুণ্ডন, নিত্য ত্রিষবণস্নান, অধঃশয্যা ও জিতেন্দ্রিয়তা বিধি। এই কালে স্ত্রী, শূদ্র, পতিত-সম্ভাষণত্যাগ, পবিত্র প্রণব জপ এবং যথাশক্তি হোম বিধি।

চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের নাম সুপরিচিত, তাহার বিধি এইরূপ। ইহা গ্রাস ভোজন বিধি, চন্দ্রের কলার বৃদ্ধি ও হ্রাস-অনুরূপ গ্রাসের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি বিধি এবং অমাবস্থায় উপবাস বিধি। এই চান্দ্রায়ণ দ্বিবিধ; যবমধ্য ও পিপীলিকামধ্য। চান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্তসময় যদি অমাবস্থার মধ্যে পড়ে, সেই চান্দ্রায়ণের নাম পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ। আর যদি পৌর্ণমাস মধ্যে পড়ে, সেই হইল যবমধ্য চান্দ্রায়ণ। এক মাস প্রতিদিবস অষ্টগ্রাস ভোজনে জ্যোতি চান্দ্রায়ণ সাধ্য হয়। সায়ং প্রাতঃ চতুর্গ্রাসক্রমে শিশু-চান্দ্রায়ণ সাধ্য হয়। মাসমধ্যে যে কোন রূপে দুই শত চল্লিশ গ্রাস ভোজনে সামান্য চান্দ্রায়ণ সাধ্য হয়। আর

এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তের নাম যাবকান্নভোজন। আত্মকৃত পাতক গুরু বোধ করিয়া তৎক্ষয়ার্থে প্রস্থতিপ্রমাণ যবচূর্ণ পাক করিবে। প্রায়শ্চিত্তকালে হোম বা বলি নাই, ষট্‌রাত্রে পাপকৃৎ শুদ্ধ হয়। সপ্তরাত্র যাবকান্নপানে মহাপাতকীর অন্যতম শুদ্ধি হয়। দ্বাদশরাত্রে পূর্ব্বপুরুষকৃত-পাতক ক্ষয় হয়, একমাস যাবকান্ন-পানে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। গোময়সংসৃষ্ট যাবকান্নে একবিংশতি রাত্রি-ক্ষেপণে সর্ব্বপাপমুক্তি হয়। যাবকান্নপানে সর্ব্ববিধ উচ্ছিষ্ট পাতক, মাতাপিতা অশুশ্রূষা-করণ পাতক, গণান্ন পাতক, গণিকান্ন, শূদ্রান্ন ও শ্রাদ্ধান্ন পাতক নাশ হয়। বালকের প্রতি ধূর্ত্ততা, রাজদ্বার পাতক, স্বর্ণস্তেয়, ব্রত-অপালন, অযাজ্যযাজন, ব্রাহ্মণ-পরিবাদ এই সকল পাতক হইতে মুক্তি হয়। পাতকনাশের আরও উপায় ছিল। সম্বৎসর প্রতিমাসে একাদশীতে উপবাস ও দ্বাদশীতে বাসুদেব-পূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। জীবনাবধি আচরণ করিলে বিষ্ণুক্ষেত্র শ্বেতদ্বীপ লাভ হয়। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে এই ব্রত আচরণ করিলে স্বর্গলোকলাভ, বিষ্ণুলোকলাভ প্রভৃতি হয়।

এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত, তিনটি বিষয় লইয়া কল্পিত হইয়াছিল, উপবাস, লঘু আহার ও নিয়মিত আহার। এরূপ হইবার কারণ স্পষ্টই দেখা যায়। অপরাধ হইল পাপ, লোকে ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় পাপ করে, মাংসশোণিতের প্রাবল্যে ইন্দ্রিয়ের শক্তিবৃদ্ধি হয়, সেই মাংসশোণিতকে ক্ষীণবল করিতে উপবাস, অল্পাহার বিশেষ উপযোগী। ভোজ্যের মধ্যে অন্ন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ওষধিমধ্যে যব শ্রেষ্ঠ। বৈদ্যক-শাস্ত্রমতে যব সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ আহার, প্রায়শ্চিত্তে সেই কারণে যব-আহার নির্দ্দিষ্ট হইল।

পাতকক্ষয়ের নিমিত্ত আর এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে; তাহার নাম মহাব্রত। বনে পর্ণকুটীরে বাস করিবে, ত্রিষবণস্নায়ী হইবে, স্বপাপ আখ্যান করিয়া গ্রামে ভিক্ষাচরণ বিধি। তৃণশয্যায় শয়ন করিবে; ব্রাহ্মণহত্যায় দ্বাদশ বৎসর এই মহাব্রত অনুষ্ঠেয়, নৃপতিবধে দ্বিগুণ মহাব্রত বিধি, ক্ষত্রিয়বধে নয় বৎসর, বৈশ্যবধে ছয় বৎসর, এবং শূদ্রবধে তিন বৎসর মহাব্রতপালন বিধি। গো-বধে গোব্রত-আচরণ বিধি, তাহাতে গোমূত্রে স্নান ও ব্রতকালে দুগ্ধ আহার অনুষ্ঠেয়। ব্রাহ্মণকে দান পাপের (অপরাধের) প্রায়শ্চিত্তের অর্থাৎ দণ্ডের অঙ্গ হইল। ভিন্ন ভিন্ন পশুবধে বিবিধ প্রকার দান বিধি; যেমন অশ্ববধে বাসদান, উষ্ট্রবধে স্বর্ণকুণ্ডল-দান, কুকুরহত্যায় ত্রিরাত্র উপবাস বিধি। মূষিক, মার্জ্জার, নকুল, মণ্ডূক, অজগরাদি বিনাশে কৃশরান্ন, ব্রাহ্মণভোজন এবং দক্ষিণায় লৌহদণ্ড-দান বিধি, হংস বক-প্রভৃতিবধে ব্রাহ্মণকে গাভীদান বিধি। সর্পহত্যায় লৌহ খনিত্র দান বিধি। পক্ষিবধে রাত্রিকালে ভোজন বিধি, অথবা রৌপ্য মাষা দান করিবে। ফলযুক্ত বৃক্ষলতা-বল্লী-গুল্ম-ছেদনে শত গায়ত্রী জপ বিধি। অন্নজ ও রসজ সত্ত্বনাশে ঘৃতপ্রাশনে শুচি, স্বয়ংজাত ওষধি বৃথাচ্ছেদনে একদিন দুগ্ধ আহার ও গবানুগমন অনুষ্ঠেয়।

অভোজ্যভোজনের নিমিত্ত নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ছিল, সুরা-পায়ী সর্ব্বকর্ম্ম বর্জ্জন করিবে ও এক বর্ষ তণ্ডুলের কণা ভোজন করিবে। লশুন, পলাণ্ডু, গ্রীঞ্জন, ইহাদের গন্ধযুক্ত দ্রব্য, বরাহ, গ্রাম্য কুক্কুট, বানর ও গোমাংস-ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ বিধি। এই সকল পাতকে দ্বিজাতির পুনঃ সংস্কার অনুষ্ঠেয়। শশক, সজারু, গোসাপ, কূর্ম্ম, ইহাদের ভোজন নিন্দনীয় নহে। গণ, গণিকা, তস্কর, গায়ক,

তক্ষক ও চর্ম্মকার-অন্ন ভোজন করিলে সপ্ত রাত্র দুগ্ধাহার বিধি। বার্দ্ধুষিক, কদর্য্য দীক্ষিত, অভিশপ্ত, ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে সাতদিন দুগ্ধপান বিধি। দাম্ভিক, চিকিৎসক, লুব্ধ, ক্রূর, উগ্র ও উচ্ছিষ্টভোজীর অন্নভোজনে সপ্তরাত্র দুগ্ধ-আহার বিধি। অবীরা স্ত্রী, স্বর্ণকার, ও পতিতান্নে সপ্তাহ দুগ্ধপান বিধি। শৈলুষ (নট) (নর্ত্তক), তন্তুবায়, কৃতঘ্ন ও রজকান্নভোজনে সপ্তরাত্র পয়ঃপান বিধি। কর্ম্মকার, নিষাদ, রঙ্গাবতার, বেণ্ ও শস্ত্রজীবীর অন্নভোজনে ঐ নিয়ম। শ্বজীবী, শৌণ্ডিক, তৈলিক, চেল, নির্ণেজকান্ন-ভোজনে, বেশ্যান্ন-ভোজনে, পক্ষী-অবলীঢ় ও গবাঘ্রাত অন্নাদিভোজনে সপ্তরাত্র দুগ্ধপান বিধি। পাঠীন, রোহিত প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার মৎস্য ভিন্ন অন্য মৎস্যভোজনে এবং সর্ব্ব প্রকার জলজ মাংসভক্ষণে ত্রিরাত্র উপবাস বিধি। তিত্তিরি, কপিঞ্জল, লাব, বক, বর্ত্তিকা, ময়ূর ভিন্ন পক্ষিমাংসে অহোরাত্র উপবাস বিধি। বৈশ্যের শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্য-পান বিধি। চাণ্ডালের আমান্ন ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস বিধি ও সিদ্ধান্নভোজনে পরাক্-প্রায়শ্চিত্ত বিধি। যজ্ঞার্থে পশু সৃষ্ট হইয়াছে, যজ্ঞে পশুঘাতন দূষণীয় নহে। বৃথা পশুঘাতনে পশুরোমসংখ্যায় উভয় লোকে পাতকী হয়। যজ্ঞহেতু পশুপক্ষী বৃক্ষ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। বেদজ্ঞের যজ্ঞার্থপশুহিংসায় উভয়ের উত্তম গতি লাভ হয়, বেদবিহিত হিংসা অহিংসা, কারণ বেদ ধর্ম্মপ্রকাশক। মাংসত্যাগই বিধি। মাংস উৎপত্তি ও জীব-ক্লেশদর্শনে মাংসে বিরত হইবে। অনুমন্তা, বিশসিতা, নিহন্তা, ক্রয়-বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা, উপহর্ত্তা ও খাদক ইহারা সকলেই ঘাতক। পিতৃ ও দেবার্চ্চনা ভিন্ন পরমাংস দ্বারা স্বমাংস বৃদ্ধি করিলে ঘোর পাতকী হয়।

অমাংসভোজী ও অশ্বমেধযজ্ঞকারী ইহারা তুল্য পুণ্যবান্। মাংস-পরিত্যাগ মুনিবৃত্তি অপেক্ষাও প্রশস্ত। গো, অজা, মহিষ ভিন্ন অন্য-ক্ষীর-ভোজনে উপবাস বিধি, অমেধ্য ভুক্ত গাভীদুগ্ধ-ব্যবহারে, ও দধিহীন শক্তুভোজনে উপবাস বিধি, শূদ্র-উচ্ছিষ্টে ব্রাহ্মণের সপ্তরাত্রি উপবাস ও পঞ্চগব্যপান বিধি। বৈশ্য-উচ্ছিষ্টে পঞ্চরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্যপান; রাজন্য-উচ্ছিষ্ট-ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্যপান এবং ব্রাহ্মণ-উচ্ছিষ্ট-ভোজনে একাহ উপবাস ও পঞ্চ-গব্যপান বিধি। এই হইল অভক্ষ্যভক্ষণের নিমিত্ত বিধি।

সুবর্ণস্তেয়কৃৎ নিজদোষ উল্লেখ করিয়া নৃপতিকে মুষল প্রদান করিবে, বধ বা তদিতরে শুদ্ধি। এই হইল এক প্রকার বিধি, অথবা তাহার মহাব্রত বিধি, স্বপাপ-আখ্যান, গ্রামে ভিক্ষা করিবে, পাতকী তৃণশায়ী হইবে। নিক্ষেপ (গচ্ছিত দ্রব্য)-অপহরণেও এই দণ্ড। ধনধান্য-অপহরণে সম্বৎসর কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত, জল, ঘৃত, দুগ্ধ-ভোজন বিধি। মনুষ্য-স্ত্রী-কূপ-ক্ষেত্র-বাপী-অপহরণে চান্দ্রায়ণ বিধি। অল্পসার দ্রব্য-অপহরণে সান্তপন বিধি। ভক্ষ্য, ভোজন, পানীয়, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূলাদি অপহরণে পঞ্চগব্যে শুদ্ধি। তৃণ, কাষ্ঠ, দ্রুম, শুষ্ক অন্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম, আমিষাদি অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, অয়ঃ; কাংস্যাদি অপহরণে দ্বাদশাহ কণাশন বিধি (কণা তণ্ডুলাদির ক্ষুদ্র অংশ)। কার্পাস, কীটজ, ঊর্ণাদি অপহরণে দুগ্ধপান বিধি। পক্ষী, গন্ধ, ওষধি, রজ্জু, বৈদাল অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাসবিধি। হৃতদ্রব্য উপায়ে ধনীকে প্রত্যর্পণ ও পাপক্ষয়ার্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধি। নিরঙ্কুশ পুরুষ যে যে দ্রব্য হরণ করিবে যে কোন

জন্মে দ্রব্যের অভাব থাকিবে প্রাণিহিংসা ও ধনহিংসায় মহাদুঃখ লাভ হয়; কিন্তু ধনহিংসা প্রাণিহিংসা হইতেও দুঃখজনক। পাপাত্মার পাপিসংসর্গে তৎপ্রায়শ্চিত্ত বিধি। যে সকল অপরাধ বা পাপকর্ম্ম কথিত হইল, তদ্ভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট অগণিত দোষ আছে; কোথাও বা এগুলি স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে যেমন শবদূষিত কূপজল-পান, কিংবা কুক্কুর শৃগাল-দষ্ট সামগ্রী-ভোজন, কোথাও বা গুরুর পরিবাদ বা তিরস্কার, কোথাও বা নাস্তিক বৃত্তি, কোথাও বা কূট ব্যবহারী, কোথাও বা প্রাণী, ভূমি, ধর্ম্ম এবং সোম-বিক্রয়ী, কোথাও বা তিল, তৈল, চর্ম্ম প্রভৃতি বিক্রয়ী ইহাদের সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, এবং দ্বিজ হইলে পুনরায় উপনয়ন বিধি নির্দ্দিষ্ট হইত। খরোষ্ট্রে গমন করিলে, অসৎ হইতে দানগ্রহণে, অযাজ্যকে যাজন অথবা সংকার করিলে প্রায়শ্চিত্ত বিধি। বিকর্ম্মস্থ, ব্রাহ্মণ্য হইতে পতিত হইলে এবং বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম ও স্নাতক ব্রতত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত বিধি। ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড উদ্যত করিলে অথবা ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অথবা তাহার শোণিত নির্গত হইলে বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অকৃতপ্রায়শ্চিত্তের সঙ্গ এবং কৃতপ্রায়শ্চিত্তের নিন্দা নিষিদ্ধ। বালঘ্ন, কৃতঘ্ন, শরণাগতহন্তা ও স্ত্রীঘাতী প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হইলেও ত্যাজ্য। অশীতিবর্ষবৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও রোগীর অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে আর এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, যাহাদের নাম রহস্য প্রায়শ্চিত্ত। রহস্য প্রায়শ্চিত্তের অর্থ বুঝা কঠিন; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান প্রভৃতির দোষের উল্লেখ আছে। প্রাণায়াম জপ হইল এ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষত্ব। অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, সর্ব্বপাপনাশী। প্রাণসংযমে সপ্রণব গায়ত্রী তিন বার পাঠে

প্রাণায়াম উক্ত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আর এই জপযজ্ঞ বিধিযজ্ঞের দশগুণ অধিক ফলপ্রদ। ব্রাহ্মণের জপেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়।

ব্রহ্মহত্যা ও অশ্বমেধ শব্দ হইতে অবৈদিকদিগের ইঙ্গিত আসে। ব্রহ্মহত্যা এক অর্থে ব্রাহ্মণপীড়ন অথবা বেদের প্রতি অত্যাচার; অশ্বমেধ শব্দ হইতেও অনুরূপ ইঙ্গিত আসে। অবৈদিকদিগের বিনাশ অথবা দমন অশ্বমেধ শব্দ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রায়শ্চিত্তের নাম রহস্য প্রায়শ্চিত্ত, ও গায়ত্রী জপ হইল ইহার প্রধান অঙ্গ।

পাপ বা অপরাধের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি নির্দ্ধারিত হইল। পাপহেতু যাহারা পতিত তাহাদিগকে ব্রাত্য বা পতিত বলিত, দূষণাদি আচরণে পতিতকে ত্যাগ বিধি। মাতৃ-পিতৃক্রমে পুরুষত্রয় অশুদ্ধকে ত্যাগ বিধি, এই সকলের সহিত ভোজন ও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। অসৎ-প্রতিগ্রহাদিতে ব্রহ্মতেজ ক্ষয় হয়, তবে কাষ্ঠ, মূল, উদক, ফল, আমিষ, মধু, শয্যা, আসন, গৃহ, পুষ্প, দধি, শাকাদি প্রদত্তে নিষেধ নাই। গুরু এবং ভৃত্যাদির জন্য সর্ব্বত্র ভিক্ষাবিধি, কিন্তু স্বয়ং তৃপ্ত হইবে না। পিতামাতাপালনের নিমিত্ত বৃত্তিগ্রহণ বিধি।

স্মৃতি। (৩)

এতক্ষণ অপরাধ বা পাপের প্রায়শ্চিত্তের (অর্থাৎ দণ্ডের) কথা হইল, প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি হয়, কিন্তু পাপ করিয়া বিধি অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মৃত্যুর পর দণ্ড ভোগ করিতে হয়। বিষ্ণু-সংহিতাতে বাইশ প্রকার নরকের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে, কতক-গুলির উদাহরণ দিতেছি। তামিস্র নরক, এস্থানে কুকুর কর্ত্তৃক

পাতকী ভুক্ত হয় ; রৌরব নরক, এইস্থান রুরু ক্রব্যাদি পূর্ণ ; কাল-সূত্র নরক, ভীষণ সর্পগণ বাস করে ; মহানরক ভীষণদন্ত বৃশ্চিকেরা থাকে ; সঞ্জীবন নরক, এই স্থানে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। অধোচি, এস্থানে পাতকী দূর হইতে প্রক্ষিপ্ত হয়। সম্প্রতাপন, এস্থান অগ্নিময় কণ্টকাচিত ; সংঘাতক, এস্থানে পাতকী ক্রকচ (করাতে)-ছিন্ন হয় ; কাকোল, এস্থানে প্রাণী তৃষ্ণাপীড়িত হয় ; কণ্ডুল, এস্থানে প্রাণী ক্ষুধার্ত্ত হয় ; কুট্টাল, ভীষণ ব্যাঘ্র পূর্ণ ; পুতিমৃত্তিকা, ভীষণ পূয-গন্ধা ; দীপনদী, এস্থানে নদীজল অগ্নিতুল্য ; লৌহচারক, এস্থানে অসৃক্ পূয নদীব্যাপ্ত।

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত অতিপাতকী, এই সকল নরকে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থান করে ; মহাপাতকী ও অনুপাতকী মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত বাস করে, উপপাতকী পর্য্যায়ক্রমে চতুর্যুগ বাস করে ; সঙ্করীকরণ পাতকী, জাতিভ্রংশকর, অপাত্রীকরণ, মলিনীকরণ পাতকী ইহারা সকলে সহস্র বৎসর এই সকল নরক ভোগ করে, এবং প্রকীর্ণ পাতকী বহুবর্ষ নারকী হয়। পাতকী প্রাণত্যাগের পরে যাম্যপন্থায় নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে ; ইহারা যাতনাপ্রদ ঘোর যমকিঙ্কর-কর্ত্তৃক আকর্ষণে নীত হয়। পূর্ব্বোক্ত নরকসকল শ্বা, শৃগাল, মাংসাশী কাক, কঙ্ক, বক, সর্প ও বৃশ্চিক ব্যাপ্ত ; পাতকী অগ্নিদগ্ধ, কণ্টকবিদ্ধ, ক্রকচপাটিত ও তৃষ্ণাপীড়িত হয় ; তাহারা ক্ষুধার্ত্ত-ব্যাঘ্র-ভীত ও পূয-শোণিতগন্ধে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হয়। ইহারা পরান্ন-পানলিপ্সায় যমকিঙ্কর ও বকাদির দ্বারা তাড়িত হয়। ইহারা তপ্ত তৈল, মুষল ও লৌহ দ্বারা স্থানে স্থানে যাতনা পায়। পাতকী কোন স্থানে বান্ত, পূয, শোণিত, বিষ্ঠা ও পুতি মাংস ভোজন করে।

কোন স্থানে তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকার এবং কৃমি ও বৃশ্চিকাদি ঘোর যাতনা দেয়। কোন স্থানে ঘোর শীত ভোগ করে, অপবিত্র বিষ্ঠাদি ভোজন করে, এবং কোন স্থানে তাহারা পরস্পর ভক্ষণে নিরত হয়; কোন স্থানে ভূতের উৎপীড়ন এবং কোন স্থানে লম্বমান অবস্থায় শরবিদ্ধ হয়। কণ্ঠে-দত্তপাদ, ভুজঙ্গবেষ্টিত, যন্ত্রপিষ্ট এবং জানু দ্বারা আকৃষ্ট হয়। পৃষ্ঠ, শির, গ্রীবা ভগ্ন, শুচিকণ্ঠ পাতকী, কূটগৃহ-তুল্য যাতনাক্ষম শরীরে কষ্ট ভোগ করে।

পাতকী পাপের নিমিত্ত বিহিত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এই সকল নরক ভোগ করিয়াও নিষ্কৃতি পায় না। মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল প্রায়শ্চিত্ত (অর্থাৎ দণ্ড) স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যাতনা অবসানে সে তির্য্যক্ যোনিতে পুনঃ বহুবিধ দুঃখ পায়। অতি-পাতকীর স্থাবর যোনি লাভ হয়; মহাপাতকী কৃমিযোনি, অনু-পাতকী পক্ষিযোনি, উপপাতকী জলজযোনি, জাতিভ্রংশকর পাতকী জলচরযোনি, সঙ্করীকরণ-পাতকী মৃগযোনি, অপাত্রীকরণ পাতকী, পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। মলিনীকরণ পাতকী মনুষ্যমধ্যে নীচযোনি প্রাপ্ত হয়। প্রকীর্ণ পাতকী নানাবিধ হিংস্র যোনি লাভ করে; এই হইল বিবিধ শ্রেণীর পাতকের সাধারণ দণ্ড।

প্রায়শ্চিত্ত না করিলে বিশেষ বিশেষ পাতকের বিবিধ প্রকার দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। অভোজ্যান্নভোজনে কৃমিযোনিগত হয়, চৌর্য্যে শ্যেন পক্ষী হয়, উত্তম-পন্থাপহারীর সর্পযোনি লাভ হয়। ধান্যহরণে মূষিকযোনি প্রাপ্ত হয়, কাংস্য অপহরণে হংসযোনিগত হয়, জলাপহরণে জলজ পক্ষী হয়, মধুহরণে মধুমক্ষিকা হয়, দুগ্ধহরণে কাকযোনি লাভ হয়। বসা-অপহরণে কুক্কুরযোনি, ঘৃতহরণে নকুলযোনি, মাংসহরণে

গৃধ্রযোনি, তৈলহরণে আরশলাযোনি, লবণহরণে বীচীবাক্ পক্ষী-যোনি, দধিহরণে বলাকাযোনি, কৌষেয়হরণে তিত্তিরযোনি, ক্ষৌমহরণে দৰ্দ্দুরযোনি প্রাপ্তি হয়। কার্পাসতন্তুহরণে ক্রৌঞ্চ, গাভী-হরণে গোধা, উত্তমগন্ধহরণে ছুছুন্দর, পত্রশাকহরণে ময়ূর, কৃতান্ন-হরণে সজারু, আমান্নহরণে শল্যক, অগ্নিহরণে বক, গৃহদ্রব্য-হরণে গৃহকারি-কীটযোনিগত হয়। রক্তবাস-হরণে চকোর পক্ষী, হস্তি-হরণে কূর্ম্ম, অশ্বহরণে ব্যাঘ্র, ফলহরণে মর্কট, স্ত্রীহরণে ঋক্ষ, যানহরণে উষ্ট্র, পশুহরণে ছাগযোনি প্রাপ্তি হয়। স্ত্রীগণ এইরূপে দূষিতা হইলে এই সকল জন্তুর ভার্য্যারূপে কল্পিত হয়।

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত মনুষ্যের এস্থানেও দণ্ড শেষ হইল না। নরক-ভোগ ও তির্য্যক্ জন্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া যখন পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মিবে, তখন পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে সে নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিবে। অতিপাতকী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়, ব্রহ্মঘ্ন যক্ষ্মারোগী হয়, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত, স্বর্ণহারী কুনখী, বিমাতৃগামী চর্ম্মরোগাক্রান্ত হয়। পিশুনের নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সূচক দুর্গন্ধবক্ত্র হয়, এবং ধান্য-চোর হীনাঙ্গ হয়। ধান্যে অন্য বস্তু মিশ্রণে পাতকী অধিকাঙ্গ হয়। অন্নাপহারী অজীর্ণ রোগে ভোগে; বাক্-অপহারী মূক হয়। বস্ত্র-অপহারী শ্বিত্ররোগী হয়। অশ্বাপহারী পঙ্গু, দেব-ব্রাহ্মণ-আক্রোশ-কারী মূক, বিষপ্রদ লোলজিহ্ব এবং অগ্নিদ উন্মত্ত হয়। গুরুর অপ্রিয়-কারীর অপস্মার হয়; গো-হত্যাকারী এবং দীপ-অপহারী অন্ধ হয়। আস্যে দীপ নির্ব্বাপক একনেত্রহীন হয়। ত্রপু, চামর, সীসক-বিক্রয়ী রজক হয়। অশ্বাদি একশফ পশু-বিক্রয়ে মৃগব্যাধ হয়। তস্কর ঘণ্টাবাদক হয়; বৃদ্ধিজীবী ভ্রামররোগাক্রান্ত হয়; একাকী মিষ্ট-

ভক্ষকের বাতগুল্ম হয়। সময়ভেদক খল্লাট হয়; অবকীর্ণ পাতকীর শ্লীপদ রোগ হয়; পরের জীবিকা-উচ্ছেদী দরিদ্র হয়। পরপীড়ায়, দীর্ঘরোগী হয়; পাপকর্ম্মবিশেষে এইরূপ লক্ষণ রোগী, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, নেত্রহীনাদি অনুমানে জ্ঞাত হইবে। আরও, বামন-বধির-মূক-দুর্ব্বলাদি পাতকী আছে, অতএব বিশেষভাবে প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণের জীবিকার তিনটি উপায় ছিল। অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ। এখন নিয়ম হইল বেতন লইয়া অধ্যাপন, ও বেতনদানে অধ্যয়ন এই উভয় কর্ম্ম করিলে শিক্ষা-দাতা ও বিদ্যার্থী পতিত হয়। সুতরাং অধ্যাপনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইল। শূদ্রবহুল দেশে যাজন ক্রিয়ার বাহুল্য সম্ভব নহে, ব্রাহ্মণের পক্ষে সে পথও বন্ধ হইল, বাকি রহিল প্রতিগ্রহ। আমরা মহাভারতের সময় হইতেই দেখিতে পাই, ভিক্ষা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণকে বৃত্তি প্রদান বোধ হয় কোন সময়েই এক কালে স্থগিত হয় নাই; তবে দেশে বিপ্লবহেতু বৃত্তিদাতৃগণের সংখ্যা অধিক হইত অথবা তাঁহারা নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করিতে পারিতেন তাহা বোধ হয় না। ব্রাহ্মণকে দান দিবার ব্যবস্থা নিতান্ত সংকীর্ণ ভাবে কল্পিত হয় নাই, শ্রাদ্ধে, পর্ব্ব দিনে, গ্রহণকালে, এমন কি প্রতি তিথিতে দানের ফলে যে যে বিশেষ পুণ্য হয় তাহা বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন দ্রব্য দান করিলে কি ফল হয় তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্রাদ্ধ ক্রিয়া গৃহস্থের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিত। পর্ব্ব শ্রাদ্ধ, অষ্টকা শ্রাদ্ধ, পিত্রাদি-জীবিতে শ্রাদ্ধ, কাম্য শ্রাদ্ধ, বার ও নক্ষত্র শ্রাদ্ধ, তিথি শ্রাদ্ধ, ইহা ব্যতীত আদ্য ও সাংবৎসরিক

শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ত্তব্য ছিল। পরে শ্রাদ্ধের কালাকাল রহিল না, উত্তম ব্রাহ্মণ পাইলেই শ্রাদ্ধের উপযুক্ত সময় ইহাই নিয়ম হইল। তিল, ব্রীহি, যব, গোধূম, ফল মূল প্রভৃতি দানে পিতৃলোক একমাস তৃপ্ত থাকেন। মৎস্য মাংস দানে দুই মাস, হরিণমাংসে তিন মাস, মেষ-মাংসে চারি মাস, পক্ষিমাংসে পঞ্চমাস, ছাগমাংসে ছয় মাস, রুরু-মাংসে সপ্ত মাস, পৃষৎ-মাংসে অষ্ট মাস, গবয়মাংসে নব মাস, মহিষ-মাংসে দশ মাস, কুর্ম্মমাংসে একাদশ মাস, পিতৃলোক তৃপ্ত থাকেন; শ্রাদ্ধে দুগ্ধ বা ক্ষীরপ্রদানে সংবৎসর তাঁহারা তৃপ্ত থাকেন। প্রথমে নিয়ম ছিল ম্লেচ্ছদেশে (চতুর্ব্বর্ণহীন অর্থাৎ যে দেশে কেবল দুই বর্ণ আছে যেমন বাঙ্গালা দেশ) শ্রাদ্ধ নিষেধ; এ নিয়ম শীঘ্রই উঠিয়া যায়। শ্রাদ্ধে বৃষদান চিরদিনই প্রসিদ্ধ, শ্রাদ্ধভিন্ন কালেও বৃষোৎ-সর্গের প্রথা ছিল; কার্ত্তিক বা আশ্বিন পূর্ণিমায় বৃষোৎসর্গ বিধি। এইস্থানে বলা উচিত যে, বৃষোৎসর্গে একটি রহস্য আছে, বৃষ অর্থে ধর্ম্ম; বৃষ-উৎসর্গে একটি মন্ত্র "চতুষ্পাদ বৃষ ভগবান্ ধর্ম্ম, তাঁহাকে আমি বরণ করি, তিনি আমায় রক্ষা করুন।" এই মন্ত্র বৃষের দক্ষিণ কর্ণে পাঠ করিবার বিধি। যেমন বৃষদানে পুণ্য হয়, সেইরূপ গাভী-দান পুণ্যজনক। প্রসূত অবস্থায় গাভী হইল পৃথিবী, এরূপ গাভী অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে পৃথ্বীদান সিদ্ধ হয়। গো শব্দে গাভীও বুঝায় ও পৃথিবী এবং বেদ বুঝায়।

ব্রাহ্মণকে ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী প্রদান করিলে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হয়। গোচর্ম্ম-প্রমাণ ভূমিদান করিলে প্রদাতা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। গো-প্রদানে স্বর্গলোক লাভ হয়, দশটি গাভীদানে গোলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্রাহ্মণকে শত ধেনু দান করে সে ব্রহ্মলোকগামী হয়।

স্বর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যখুরা, মুক্তালাঙ্গুলা, কাংস্যোপদোহা, বস্ত্র-উত্তরীয়া ধেনু-প্রদানে গাভীর লোমতুল্য বর্ষ স্বর্গভাক্ হয়। দান্ত বলশালী বৃষভ দান দশধেনুদান-তুল্য। অশ্বপ্রদাতার সূর্য্যসালোক্য লাভ হয়। বস্ত্রপ্রদানে চন্দ্রলোক, সুবর্ণপ্রদানে অগ্নিসালোক্য লাভ হয়। রৌপ্য-প্রদাতার কান্তিলাভ হয়, তৈজসপত্রপ্রদানে সর্ব্ব-অভিলাষপূর্ণতা লাভ হয়। ঘৃত, মধু, তৈল-প্রদানে আরোগ্য লাভ হয়, ঔষধপ্রদানে ব্যাধিশূন্য হয়, লবণ প্রদানে লাবণ্য লাভ হয়, ধান্যপ্রদানে তৃপ্তিলাভ হয়, অন্নদানে সর্ব্ব-অভীষ্ট লাভ হয়, ধান্যপ্রদানে পুনরায় লিখিত আছে সৌভাগ্য লাভ হয়; তিলদানে অভীষ্ট প্রজা লাভ হয়, ইন্ধনপ্রদানে দীপ্তাগ্নি লাভ হয়, মতান্তরে ইন্ধনপ্রদানে সংগ্রামজয়ী হয়, আসন-প্রদানে স্থানলাভ হয়, শয্যাপ্রদানে উত্তম ভার্য্যা প্রাপ্তি হয়, পাদুকা-প্রদানে অশ্বতরীযুক্ত রথপ্রাপ্তি হয়, ছত্রপ্রদানে স্বর্গ লাভ হয়, যে তালবৃন্ত ও চামর প্রদান করে সে পন্থাগমনে সুখী হয়, বাস্তুপ্রদানে নগরাধিপত্য-লাভ হয়। লোকে প্রিয়বস্তু ও গৃহপ্রিয় দ্রব্য অক্ষয় কল্পনায় গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই সকল হইল ব্রাহ্মণকে দানের বিধি ও ফল। সাধারণের হিতকর কার্য্য করিলে তাহা দ্বারাও অনেক সুফল লাভ হয় তাহারও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। কূপ খনন করিলে জল উঠিলে পর অর্দ্ধ পাপ নাশ হয়, তড়াগকর্ত্তার বরুণ-লোক লাভ হয়, যে জল দান করে সে সদা তৃপ্ত হয়, বৃক্ষ রোপণ-কর্ত্তার বৃক্ষসকল পুত্ররূপে প্রকাশ পায়, বৃক্ষের পুষ্পের দ্বারা দেবতারা তুষ্ট হয়, বৃক্ষের ফলে অতিথি তুষ্ট হয়, বৃক্ষের ছায়ায় অভ্যাগত সুখী হয়, বর্ষণকালে বৃক্ষজলে পিতৃলোক তৃপ্ত হয়, সেতু-নির্ম্মাতা স্বর্গভাক্ হয়, দেব-আয়তনকর্ত্তার তল্লোকপ্রাপ্তি হয়, দেবালয়

প্রদাতা যশস্বী হয়, দেবালয়মার্জ্জনে গন্ধর্ব্বলোক লাভ হয়, দেবতায় পুষ্পপ্রদানে শ্রীমান্ হয়, অনুলেপনদানে কীর্ত্তিমান্ হয়। দীপপ্রদানে উত্তমচক্ষু ও উজ্জ্বলবর্ণ হয়। দেবতায় অন্নপ্রদানে বলবান্ হয়, ধূপ-প্রদানে ও দেবনির্ম্মাল্য-পুষ্পাপনয়নে গোদানফল লাভ হয়, দেবালয়-মার্জ্জনে ও উপলেপনে, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টমার্জ্জনে, পদপ্রক্ষালনে, ও অসুস্থসেবায় গোদানের ফল লাভ হয়, কূপ-আরাম-তড়াগ-দেবালয় পুনঃসংস্কার করিলে সংস্কারকর্ত্তার নবপ্রতিষ্ঠাতুল্য ফললাভ হয়।

উপরে যে সকল দণ্ড প্রদানের কথা হইল তাহা রাজদণ্ড নহে; সে দণ্ড স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মণগণ নির্দ্ধারিত করিতেন। তদ্ভিন্ন রাজদণ্ডও ছিল, বিষ্ণুসংহিতায় একশত ছিয়াত্তর প্রকার অপরাধের উল্লেখ আছে; অপরাধের দণ্ড রাজা অথবা শাসনকর্ত্তৃগণ প্রদান করিতেন। তালিকাটি বোধ হয় একজনের লেখা নহে, একই অপরাধে ভিন্নস্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড লিখিত আছে। দণ্ড নানা-প্রকারে দেওয়া হইত। বধ, শারীরিক দণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ, শরীরের অংশচ্ছেদ, বিরূপকরণ, কারাবাস, নির্ব্বাসন ও অর্থদণ্ড, এই সকলই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন অপরাধেও বধ দণ্ড বা শারীরিক দণ্ড নাই, মহাপাতকী ব্রাহ্মণ কৃতচিহ্নে নির্ব্বাসিত হইবে। ব্রহ্মহত্যা করিলে শিরশূন্য পুরুষ ললাটাঙ্কিত হইবে; সুরাপানে ললাটে সুরাধ্বজ প্রতিষ্ঠা বিধি, তস্করতায় শ্বা-পদচিহ্ন বিধি। অন্য হত্যাকার্য্যে সধন নির্ব্বাসিত হইবে।

অনেক অপরাধের জন্য হত্যা দণ্ড বিধান ছিল। কপট শাসন-কর্ত্তা, কূটলেখক, বিষাগ্নিপ্রদাতা, বলপূর্ব্বক তস্করতাকারী, এবং স্ত্রী-বালক-পুরুষ-ঘাতীর বিনাশ বিধি। অপর অপরাধেও অপরাধীর হত্যা

বিধি ছিল, দশ কুম্ভাদি ধান্যহরণে, শত পলাদি সুবর্ণহরণে হত্যা-বিধি। রাজবংশীয় ভিন্ন রাজ্যকামনায় বধ দণ্ড। সেতুভেদকের পক্ষেও এই নিয়ম। প্রবল তস্করের অন্নাদিদাতা বধ্য। স্বামীর অবশীভূতা ব্যভিচারিণী-স্ত্রীর হত্যা বিধি। ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন বিশেষ নিয়ম ছিল, শূদ্রদিগের জন্যও বিশেষ নিয়ম হইয়াছিল। হীনবর্ণ যদঙ্গে অধিকবর্ণের অপরাধ করিবে তদঙ্গছেদন বিধি, হীনবর্ণ ও উৎকৃষ্ট সহ একাসনে অবস্থানে কটি কৃতাঙ্ক করিয়া তাহার বিবাসন বিধি। হীনের অধিক বর্ণের উৎকৃষ্ট অঙ্গে নিষ্ঠীবনত্যাগে তাহার ওষ্ঠদ্বয় ছেদন বিধি। এইরূপে উৎকৃষ্ট বর্ণের আক্রোশে জিহ্বাছেদন বিধি, অহঙ্কারে ধর্ম্মঘোষণায় আস্যে তপ্ততৈলসেচন বিধি, শ্রুত, দেশ, জাতি কর্ম্মের অন্যথাবাদীকে দ্বিশত কার্ষাপণ (কাহন কড়ি) দণ্ড বিধি (বর্ত্তমান হিসাবে দুই শত টাকা)। গজ অশ্ব ও গোঘাতকের এককর-পদচ্ছেদন বিধি। গর্হিতমাংস-বিক্রয়েও এই নিয়ম, পক্ষিমৎস্যঘাতনে দশ কার্ষাপণ দণ্ড। কীটাদিঘাতনে কার্ষাপণদণ্ড। বল্লী-লতা-গুল্ম-ছেদনে শত কার্ষাপণ দণ্ড। উভয়নেত্রভেদীর জীবনাবধি কারাগার বিধি, অথবা ঐ পুরুষ নেত্রদ্বয়হীন হইবে। প্রহারজনিত পীড়ার ব্যয়ভার প্রহারক প্রদান করিবে। গো-অশ্ব-উষ্ট্র-গজ-অপহরণে এক-পদ ও একহস্ত-হীন হইবে। ধান্যাদিহরণে একাদশ গুণ প্রদান বিধি। স্বর্ণ, রজত পঞ্চাশৎ পল বা পঞ্চাশৎপল-মূল্য বস্ত্রহরণে হস্তচ্ছেদ বিধি। মৎস্য, মাংস, ঘৃত, তৈল ইত্যাদি অপহরণে মূল্যের ত্রিগুণ দণ্ড বিধি। আসনার্হকে আসন-অপ্রদানে এবং পূজার্হে অসম্মানে পঞ্চবিংশতিপণ (একটাকা নয় আনা) দণ্ড বিধি। ব্রাহ্মণকে অভক্ষ্য ভোজন দানে ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ড বিধি। অস্পৃশ্যজাতির স্বেচ্ছায়

ব্রাহ্মণাদি-স্পর্শে যথার্হ দণ্ডবিধি। অপতিত পিতা, পুত্র, আচার্য্য, ঋত্বিক্, ইহাদের ত্যাগে শত পণ (সওয়া ছয় টাকা) দণ্ড বিধি। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু, গর্ভবতী স্ত্রী, এবং তীর্থানুসারী শুল্ক গ্রহণে দশপণে দণ্ডনীয়, এবং ঐ শুল্ক প্রত্যর্পণ বিধি। দূত, কুটাক্ষ-ব্যবহারকারীর ও গ্রন্থিচ্ছেদকের করচ্ছেদ বিধি। নির্দ্দোষা পত্নী-ত্যাগে চৌরদণ্ড বিধি। জাতিভ্রংশকর অভক্ষ্যের ভক্ষয়িতা বিনাশনীয় এবং অভক্ষ্য ও অবিক্রেয়বিক্রয়ীর ঐ দণ্ড। কূটসাক্ষী এবং উৎকোচ-উপজীবীর সর্ব্বস্ব-অপহরণ বিধি।

উপরে যে সকল নিয়ম, বিধি, দণ্ড, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। সে বিচার করিবার এস্থান নয়; শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক আমরা নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করিব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন এ সকল বিষয় লইয়া বিস্তৃত আলোচনা হইবে তাহা নিশ্চয়। এস্থলে কেবল সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে, না বলিলে বোধহয় আমাদের আলোচনার বিষয় অসম্পূর্ণ হইবে।

যে দেশে ধর্ম্ম আছে, বা ছিল, সেই দেশেই ধর্ম্মযাজক আছে বা ছিল, ধর্ম্ম থাকিলেই ধর্ম্মযাজক থাকে। পুরাতন জগতে ইজিপ্ট্, গ্রীস্, রোম প্রভৃতি সকল দেশে ধর্ম্মযাজক ছিল। আধুনিক জগতে খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই ধর্ম্মযাজক আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মযাজকেরা দেশে কি প্রকার স্থান অধিকার করিত তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে অপর দেশের ধর্ম্মযাজকগণ স্বীয় স্বীয় দেশে কি প্রকার স্থান অধিকার করিত তাহা জানা আবশ্যক, না জানিলে এ প্রশ্নটির আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে না।

ইজিপ্ট্, গ্রীস্, রোম, ইহারা হইল প্রাচীন দেশ, ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। খৃষ্টানজগতের ধর্ম্মযাজকদিগের ইতিহাস আমাদের নিকট অধিকতর পরিচিত। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, অর্থাৎ পঞ্চম হইতে নবম বা দশম শতাব্দী, সে সময়ে ইজিপ্ট্, গ্রীস বা রোম হইতে তাহাদের পুরাতন ধর্ম্ম ও পুরাতন ধর্ম্মযাজকগণ লোপ পাইয়াছিল; সে সময়ে ইউরোপের অধিকাংশেই খৃষ্টান্ ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। বিপ্লব ও স্মৃতিযুগে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত সমসাময়িক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের অবস্থা তুলনা করিলে আমাদিগের আলোচ্য বিষয় বুঝিতে সুবিধা হইবে, কিন্তু এ তুলনা করা অতিশয় কঠিন। তুলনা সম্ভব কিনা, তাহারও নিশ্চয় নাই। দুইটি বিষয় পাশাপাশি করিয়া রাখিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝিতে সুবিধা হইবে।

অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে সমগ্র খৃষ্টান জগতে একজন শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন, তাঁহাকে পোপ অর্থাৎ পিতা বলিত। পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ নিম্ন অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মচারী থাকিত। পোপের নীচেই কার্ডিনেলদিগের স্থান ছিল, তাহাদের নিম্নে বিশপ্, তাহাদের নিম্নে প্রীষ্ট্ অথবা পুরোহিতরা থাকিতেন। প্রতি দেশের প্রতি পল্লীতে একটি গীর্জ্জা অথবা ধর্ম্মমন্দির থাকিত। প্রতি পল্লীর নিবাসীদিগের ধর্ম্মশিক্ষা, যাজনক্রিয়া প্রভৃতি যাহা কিছু ঐহিক বা পারলৌকিক মঙ্গল-কারক সে সকলই সেই পল্লীর ধর্ম্মযাজকের কর্ত্তব্যের মধ্যে নির্দ্ধারিত ছিল। এইরূপে কতকগুলি পল্লী ও পল্লীস্থিত ধর্ম্মযাজক একজন বিশপের অধীনে থাকিত, কার্ডিনেলগণ বিশাল খৃষ্টান ধর্ম্মজগৎ পরিচালনা করিতে পোপের সহায়তা

করিতেন। একজন পোপের মৃত্যুর পর কার্ডিনেলগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে নির্ব্বাচন করিয়া পোপ অভিষিক্ত করিতেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইউরোপের অনেকাংশে লোকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, অনেক দেশেই অর্দ্ধেকের অধিক ভাগ বন ছিল। পল্লী বা গ্রামের সংখ্যা দেশমধ্যে অধিক ছিল না; তথাপি অষ্টম শতাব্দীতে ইংলণ্ড দেশে পল্লীবিভাগ ও তাহার সহিত পল্লী-ধর্ম্ম-মন্দিরনির্ম্মাণ ও পুরোহিত বা ধর্ম্মযাজক-স্থাপন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পল্লী থাকিলেই সেই পল্লীর একজন ধর্ম্মযাজক ও তাহার সংশ্লিষ্ট একটি মন্দির থাকিত। খৃষ্টান ধর্ম্মজগতে নানাপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্মচারী পূর্ব্বেও থাকিত ও এখনও আছে। প্রাইমেট্, আর্চ্ বিশপ, বিশপ্, ডিন্, কেনন্, রেক্টার, ডিকান্, আর্চ্ ডিকান্ এবং সুপিরেয়র, মঙ্ক প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম-কর্ম্মচারীদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিত। ইহাদের কথা বিস্তারিত ভাবে বলিতে এখানে স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই।

খৃষ্টান্ ধর্ম্মজগতের প্রধান কর্ম্মচারী পোপ রোমনগরে বাস করিতেন, তিনি কার্ডিনেলগণের সাহায্যে সমগ্র খৃষ্টান জগৎ শাসন ও পরিচালন করিতেন। ইউরোপের যে কোন দেশে স্থিত পাদ্রীগণ হউন না কেন, তাঁহারা সকলই পোপের আদেশ-অনুক্রমে নিজ নিজ কর্ম্ম করিতেন; তাঁহাদের আচরণ, কর্ম্মপদ্ধতি, ধর্ম্মপ্রচার, যাজনপদ্ধতি উপজীবিকা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, উপরিস্থিত বিশপ্ কার্ডিনেল ও পোপের সহিত সম্বন্ধ এ সকলেই রোমস্থিত পোপ্ নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত করিতেন। এই অগণিত ও নানাদেশীয় পাদরীগণ কি খাইবে, কি পরিবে, কিরূপ গৃহে বাস করিবে, কিভাবে দিনরাত্রি

যাপন করিবে, কিভাবে পল্লীবাসিগণের সহিত আচরণ করিবে, কি ভাবে তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, কিভাবে তাহারা তাহাদের উপরিস্থিত বিশপ্, কার্ডিনেল্ এবং পোপের সহিত আচরণ করিবে, এ সকলের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে রোম হইতে উপদেশ ও আজ্ঞা আসিত। কোনরূপ বিচার না করিয়া পাদরীদিগকে সেই সকল আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইত। প্রত্যেক ধর্ম্মযাজক, পাদরীই হউন, বিশপ হউন, কার্ডিনেল হউন তাঁহার নিয়োগ স্থান, উন্নতি, দণ্ড, পুরস্কার, পোপ বিধান করিতেন। এই প্রকারে খৃষ্টান ধর্ম্মজগৎ নবম ও দশম শতাব্দীতে গঠিত ছিল। এখনও রোমান কাথলিক-দিগের মধ্যে সেই ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

পোপ হইলেন খৃষ্টান ধর্ম্মজগতের একমাত্র সর্ব্বসম্মত রাজা ও রোম হইল সেই ধর্ম্মজগতের রাজধানী। সে সময়ে এই প্রকার ইউ-রোপের কেহ একচ্ছত্র রাজা বা সম্রাট্ ছিলেন না, প্রত্যেক দেশেই নিজ নিজ রাজা বা সম্রাট্ থাকিত, এই রাজগণের সহিত পোপের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বুঝা প্রয়োজন। পোপের সম্মতি ভিন্ন কোন দেশের রাজার অভিষেক সম্ভব হইত না। সকল দেশেরই রাজা বা সম্রাট্‌কে পোপের নিকটে অবনতমস্তকে থাকিতে হইত, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কোন রাজারই সাহস হইত না। ইউরোপীয় রাজগণ পোপের আদেশ পালন করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি ভয় করিতেন না এমন রাজা বা সম্রাট্ সে সময়ে ইউরোপে ছিল না। কোন রাজার প্রতি পোপ ক্রুদ্ধ হইলে তিনি যে দণ্ড বিধান করিতেন রাজাকে সেই দণ্ড নীরবে ভোগ করিতে হইত। অষ্টম শতাব্দীতে হিল্‌ডিব্রাণ্ড (পরে পোপ) গ্রেগরী

সপ্তম) যখন পোপ ছিলেন তখন তৃতীয় হেনেরী জার্ম্মানসম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার তুল্যপরাক্রম সম্রাট্ ইউরোপে তখন কেহ ছিলেন না। সেই সম্রাট্ হেনেরিকে হিল্‌ডিব্রান্‌ডের ঘোড়ার রেকাব ধরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তাঁহার ক্রোধে পতিত হইয়া সম্রাট্‌কে অনাবৃতমস্তকে রাত্রিকালে বরফের উপর দাঁড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্ম বা ধর্ম্মযাজক-সম্বন্ধে কোন দেশের রাজার কোন প্রকার অধিকার ছিল না, প্রত্যেক দেশেই পোপের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিত, তাহাদের পরামর্শ বা আদেশ রাজগণকে প্রতিপালন করিতে হইত। অনেক সময়ে দেশের রাজা ও রোমের পোপ, ইহাদের মধ্যে মতভেদ হইত, কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটিলে পোপেরই জয় হইত। তোমাকে ধর্ম্ম-জগৎ হইতে দূর করিয়া দিব, রাজগণের পক্ষে ইহাই ছিল সর্ব্বকঠোর দণ্ড। এই দণ্ডের ভয়ে সকল সম্রাট্ বা রাজা কম্পিত হইতেন।

এই বিশাল ধর্ম্মরাজ্য পরিচালনা করিতে পোপদিগের অর্থের অভাব হইত না ; করস্বরূপ সকল দেশ হইতে অর্থ আসিয়া রোমের কোষাগার পরিপুষ্ট করিত। যখন খৃষ্টান্‌দিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইল, তখন এই সকল সম্প্রদায় যে যে দেশে বাস করিতেন তাঁহারা সেই দেশের প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতেন। তাঁহাদের মঠ বা আশ্রমে শত শত ধর্ম্মযাজকগণ বাস করিত। প্রায় সকল স্থানেই এই সকল আশ্রম-সংলগ্ন বিস্তৃত জমিদারী থাকিত। অর্থের অভাব ইহাদের কখন ভোগ করিতে হইত না। ইংলণ্ডে এক সময়ে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সে দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকল, ইংলণ্ডের অর্দ্ধেকের উপর ভূসম্পত্তির অধিকারী

ছিলেন ; অনেক সময় দেশের অধিপতিকে রাজ্যের ব্যয়ভার সঙ্কুলান করিতে ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট অর্থের নিমিত্ত শরণাগত হইতে হইত। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই পোপের বিনানুমতিতে গঠিত হইতে পারিত না, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকগণ পোপের আজ্ঞাধীন ছিল, ও তাঁহারই আজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য করিত।

খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজকগণ কি করিত বলা হইয়াছে। তাহারা আর একটি কার্য্য নিজেদের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত করিত। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা তাহাদের একটি প্রধান কার্য্য ছিল ; ভিন্ন দেশে গিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদিগকে বৌদ্ধ করা বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণ যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের চেষ্টা যেরূপ সফল হইয়াছিল সেইরূপ কোন দেশে কোন সময়ে হয় নাই। পৃথিবীর এমন কোন দেশ ছিল না যে স্থানে বৌদ্ধেরা নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে যায় নাই। বাধা, বিঘ্ন, ভয়, শারীরিক ক্লেশ, জীবনের আশঙ্কা এসকল তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কখন গণনা করেন নাই এবং তাঁহারা যেমন সফলতা লাভ করিয়াছিলেন এরূপ আর কোন ধর্ম্মপ্রচারকগণ কখন করে নাই। হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের অনুকরণে বৌদ্ধ বা ভিক্ষুগণ গঠিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের অনুকরণে খৃষ্টান সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠিত হয়। বৌদ্ধদিগের অনুকরণে তাহারাও নানা দেশ পরিভ্রমণ করিত ও সেই সেই দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিত এবং যাহাতে দেশের লোকেরা খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিত। সে সব দেশেও গিয়া বিদ্যালয় খুলিত, জীবিকা-উপার্জ্জনের নিমিত্ত কাজ শিখাইত, ধর্ম্ম উপদেশ দিত,

রোগীর শুশ্রূষা করিত ও সকলকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আপনার মত ভাবিত। খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের তুল্য না হইলেও এ সম্বন্ধে তাহাদের পরেই স্থান অধিকার করে।

উপরের কথাগুলি একত্রিত করিলে গুটিকতক বিষয় বুঝা যায়; খৃষ্টাব্দের প্রায় আরম্ভ হইতে শত শত বৎসর খৃষ্টান ধর্ম্মজগতে একজন করিয়া প্রভু থাকিতেন, সমগ্র ইউরোপ মহাপ্রদেশ লইয়া তাঁহার বিশাল ধর্ম্মরাজ্য ছিল; তাঁহার অধীনে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মযাজক থাকিত এবং প্রত্যেক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকই পোপের আজ্ঞানুসারে নিজ নিজ কার্য্য করিত।

উপরে বলিয়াছি ইউরোপে যে যে দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই সেই দেশের প্রতি পল্লীতে এক এক জন করিয়া ধর্ম্ম-যাজক থাকিতেন। এই সকল ধর্ম্মযাজকগণ শিক্ষা ও চরিত্র-গুণে নিযুক্ত হইতেন। ইঁহাদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, যাজকতা কর্ম্ম, গুণসাপেক্ষ ছিল, বংশগত নহে। পল্লীস্থিত স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা, শিশু-বৃদ্ধ, বংশ-অবস্থা, জন্ম অভেদে সকলকে এবং প্রত্যেককে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান ও তাহাদের ধর্ম্মচর্য্যায় সহায়তা দান ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম বাইবেল, ইহা সে সময়ে লাটিন ভাষায় লিখিত ছিল, দেশের জনসাধারণ সে ভাষা বুঝিত না। বাইবেল-লিখিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও উপদেশ তাঁহারা দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। সকলকে নীতি-সম্বন্ধে ও ধর্ম্মাচরণ-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন ও যাহাতে তাহারা সৎপথে থাকে ও ধর্ম্মাচরণ করে সে সম্বন্ধে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহাদের যাতায়াত

ছিল, সকলে তাঁহাদিগকে সম্মান করিত ও তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিত।

ধর্ম্মাচরণসম্বন্ধে শিক্ষা ও সাহায্য প্রদান ব্যতীত খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজকগণের আর এক প্রকার কার্য্য ছিল, তাহার নাম পরহিতকর কর্ম্ম। নিরন্নকে অন্নদান, রোগের চিকিৎসা, রোগীর শুশ্রূষা, আর্ত্তকে সান্ত্বনা, নিপীড়িতকে সাহায্য, অত্যাচারীর হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা, এই সকল কর্ম্ম তাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষার সমান অথবা তদপেক্ষা পবিত্র মনে করিতেন ও তদনুরূপ আচরণ করিতেন।

তাঁহারা আরও এক প্রকার কর্ম্ম নিজেদের কর্ত্তব্য বলিয়া পরি-গণিত করিতেন। বালকবালিকাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখাই-তেন, তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে সকল প্রকার শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। যেমন তাঁহারা কোন ব্যক্তিকেই জন্মের নিমিত্ত উচ্চ নীচ মনে করিতেন না, সেইরূপ তাঁহারা কোন কর্ম্মকেই নীচ অথবা হেয় জ্ঞান করিতেন না। যাহাকে আমরা শিল্পকার্য্য বলি, জুতা-সেলাই হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কর্ম্মই তাঁহারা নিজে শিখিতেন ও অপরকে শিক্ষা দিতেন। যাহাতে প্রত্যেকে কোন না কোন প্রকার কাজ শিখিয়া নিজের জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। খৃষ্টানেরা বলিতেন সমস্ত খৃষ্টান জগৎ একটি বিশাল পরিবার, এই পরিবারের শীর্ষস্থান যিনি অধিকার করিতেন তাঁহার নাম পোপ অথবা পিতা। তিনি ধর্ম্মযাজকগণের সাহায্যে এ বিশাল পরিবার পরিচালিত করিতেন, তিনি সকলেরই পিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং এই বিশাল পরিবারের প্রত্যেক নরনারীর ধর্ম্মসম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতাভগ্নীর সম্বন্ধ ছিল।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

স্মৃতি। (৪)

নবম শতাব্দীর খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণের সহিত সেই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, উভয়ের তুলনা করিতে গিয়া কেহ কেহ দুঃখ করেন, কেহ কেহ বা ক্রোধ প্রকাশ করেন, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য না দেখিয়া সকলেই নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেন। অনেকে ব্রাহ্মণদিগকে গালি দেন, তাঁহাদিগকে স্বার্থপর, নিষ্কর্ম্মা, পরপিণ্ডোপজীবী, প্রবঞ্চক প্রভৃতি নানা কথা বলেন। যদি ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মযাজক বলা যায়. তাহা হইলে খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকগণের সহিত তাঁহাদিগকে তুলনা করিলে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ যে নিতান্ত গৌরবের স্থান অধিকার করেন তাহা বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টানেরা সকলকে আপনার বলিয়া মনে করিতেন ও এক করিবার চেষ্টা করিতেন, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলকে ইতর অর্থাৎ পৃথক্ জ্ঞান করিতেন ও নিজদিগকে তাহাদের হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ সকলকেই উপযাচক হইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন দেশবিদেশে গমন করিতেন, যাহাতে অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদের ধর্ম্ম (খৃষ্টান ধর্ম্ম) গ্রহণ করে তাহার চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহারা পরহিতকর কর্ম্ম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সকল ধর্ম্মযাজকই একজনের আজ্ঞাধীন থাকিয়া তাঁহারই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইহার অনুরূপ কিছুই ছিল না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান ছিলেন, সকলেরই চেষ্টা, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে, তাহাদের হইতে দূরে অবস্থান করা, এবং স্বদলের মধ্যেও নানাকারণে ভেদ ও পার্থক্য সৃজন করা তাঁহাদের বিশেষ

চেষ্টা ও আগ্রহের সামগ্রী ছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকেরা বিদেশে যাইতেন, ব্রাহ্মণেরা সমুদ্রযাত্রাকে পাপ বলিতেন, খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজকেরা বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, স্বধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা করিতেন ও তাহাদিগকে আপন ভাবিতেন, ব্রাহ্মণেরা এরূপ লোকদিগকে ম্লেচ্ছ, যবন, চৌর, দস্যু, অন্ত্যজ, শূদ্র প্রভৃতি অগণিত নাম দিতেন, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বোধ করিতেন, দেখিলে দূর দূর করিতেন, তাহাদের সহিত কথা কহিলে আচমন করিতেন এবং প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

একটু চিন্তা করিলেই প্রভেদের কারণ বুঝা যায়। শত শত বৎসর লইয়া, বোধ হয় সহস্র সহস্র বৎসর লইয়া ব্রাহ্মণ কেবল ছয়টি মাত্র কার্য্য নিজেদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ছিল ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের সংখ্যা। যুদ্ধ, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, এই সকল করিলে ব্রাহ্মণ নিন্দনীয় হইতেন ও অনেক সময়ে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইত। ব্রাহ্মণের অধ্যয়নের বেদ ও বেদাঙ্গ একমাত্র সামগ্রী ছিল; পুরাণ ও স্মৃতিপাঠের প্রথা পরে হয়। লোকযাত্রানির্ব্বাহক-শাস্ত্রপাঠে কোন ফল নাই, অন্য শাস্ত্র-অধ্যয়নে সবংশে শূদ্রতাপ্রাপ্তি হয়, ইহাই স্মৃতির বিধান। এক সময়ে ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা করিতেন এবং উহা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ছিল, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে অধ্যাপনার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যজন-ক্রিয়া ব্রাহ্মণের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। যখন যজ্ঞের প্রচলন ছিল, তখন ব্রাহ্মণ নিজের যজ্ঞ নিজে করিতেন, কিন্তু অষ্টম ও নবম

শতাব্দীতে কাহাকে যজ্ঞ বলিত তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমরা পুরাতন কালের যজ্ঞের বর্ণনায় দেখিতে পাই ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি ষোলজন যজ্ঞের কর্ম্মচারী থাকিত, এই হইল এক প্রকার যজ্ঞ। আমরা পরে অগণিত যজ্ঞের নাম দেখিতে পাই, এই সকল যজ্ঞ অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল কিনা এবং থাকিলেও তাহাতে ব্রাহ্মণের কি স্থান ছিল তাহা বলা যায় না। তবে আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, যে, তখনই যজ্ঞ শব্দের অসংখ্য অর্থ হইয়াছে। বৈদিক যুগে যজ্ঞ কাহাকে বলিত, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যজ্ঞ শব্দের নানাপ্রকার অর্থ দেখিয়া মনে হয় যে, বৈদিক যজ্ঞ ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর যজ্ঞ—এই উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়াছিল। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেরা কাহাকে যজনক্রিয়া বলিত তাহা বলা যায় না; তবে এ কথা স্থির, এই যজনক্রিয়া ব্যক্তিগত ছিল। ইহার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা, যে যজ্ঞ করিত তাহারই মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। এক ব্যক্তির যজ্ঞের সহিত অপর কোন ব্যক্তির সম্পর্ক থাকিত না, এ সম্বন্ধে যাজনক্রিয়া স্বতন্ত্র, ব্রাহ্মণ পরের জন্য যাজকতা করিতেন, যজমানের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার যাজকতা করিতেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে যজমান নির্ব্বাচন করিতে বিশেষ নিয়ম প্রয়োজন হইয়াছিল, এমন কি, যাহার সহিত যৌন সম্বন্ধ নাই তাহার যাজকতা করিবে না ইহাই বিধি হইয়াছিল। যজনক্রিয়া হইল ব্যক্তিগত এবং যজমানের মঙ্গল হইল যাজনক্রিয়ার উদ্দেশ্য। যজন ও যাজনের সহিত আর কাহারও কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মযাজক বলা যাইতে পারে। এই কারণে খৃষ্টান

ধর্ম্মযাজকের সহিত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মযাজকের সাদৃশ্য অতি সামান্য, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেইজন্য খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক বলিলে যাহা বুঝায় ব্রাহ্মণ ধর্ম্মযাজক বলিলে তাহা বুঝায় না।

সময়ে বৈদিক যজন ও যাজনের স্থলে দেবপূজা প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মণেরা দেবপূজক হইতেন; কিন্তু পরের নিমিত্ত দেবপূজা নিন্দিত কর্ম্ম ছিল। গ্রামযাজক ব্রাহ্মণ, পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত। সময়ে ব্রাহ্মণ অধ্যাপন ও যাজন ভিন্ন অপর কার্য্য করিতেছেন দেখা যায়; তিনি রাজার সভায় সভ্য হইয়া রাজকার্য্য করিতেন; অপরাধীদিগের বিচার করিতেন; লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিতেন। এই সকল কার্য্য কেবল ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এ সকল ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম নয়। ব্রাহ্মণ এস্থলে অপর কর্ম্ম স্বায়ত্ত করিলেন।

ব্রাহ্মণ, বেদ ও ব্রহ্মা এই তিনই এক কথা, এবং এক অপরের প্রতিবাক্য। ব্রাহ্মণ বেদ ধারণ করেন, বেদ অধ্যাপন করেন, ধর্ম্ম উপদেশ দেন, এই কারণেই ব্রাহ্মণ ও বেদ শব্দ উভয়ই এক অর্থবাচক। বেদ বহন করা ব্রাহ্মণের একমাত্র কর্ম্ম, বেদ হইতে ব্রাহ্মণ অভিন্ন, যজন যাজন পরের কথা। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণও তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সমভাবে ধারণ করিত। জনসাধারণের পক্ষে খৃষ্টান্‌দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ ছিল, এইস্থানে খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা অদ্বিজ অর্থাৎ শূদ্রদিগকে বেদপাঠ করিতে দিতেন না, তাহার এক প্রধান কারণ ছিল। বেদ উচ্চারণ করা অতিশয় কঠিন, শুদ্ধভাবে বেদ

উচ্চারণ না করিলে বেদের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হয় না। দেশের লোক সংস্কৃত শব্দ শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিত না। ঐ শত্রুরা আসিতেছে ইহার সংস্কৃত হইল "অরয়ঃ—অরয়ঃ" তাহার স্থলে তাহারা বলিত "হেলয়ঃ-হেলয়ঃ"; এরূপ অবস্থাতে জনসাধারণকে বেদ পড়াইলে তাহারা কোনমতে বেদের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরবর্ণ, নানাপ্রকার ব্যঞ্জনবর্ণ, মাত্রা ও ছন্দ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিত না, এবং বেদ শুদ্ধরূপে উচ্চারিত না হইলে সময়ে বেদের গুরুত্ব এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবার আশঙ্কা ছিল। বেদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বেদলেখন নিষিদ্ধ ছিল, কেবল গুরুমুখে বেদশিক্ষা করিবে, ইহাই ছিল বেদপাঠের নিয়ম। আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, বৌদ্ধ শাসনকালে লিখিত বেদরক্ষা আশঙ্কার কারণ ছিল, বেদের শাখাবিভাগ—ও কণ্ঠস্থ করা প্রথা পরে যে প্রচলিত হইল তাহা বোধহয় বৌদ্ধভীতির অন্যতম ফল।

বেদশিক্ষা, বেদরক্ষা, বেদদান, এই সকল ছিল ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের ইহাই হইল মুখ্য উদ্দেশ্য, যজন, যাজন, সভার সদস্য হওয়া, বিচারকার্য্য করা, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন, ব্যবস্থা প্রদান, সমাজশাসন, এ সকল হইল গৌণ কর্ম্ম। শেষোক্ত কর্ম্মগুলি পূর্ব্বে ছিল না, পরে ব্রাহ্মণেরা এই সকল কার্য্য অধিকার করিলেন। যাহাতে বেদের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, যাহাতে ইহা অপাত্রে পতিত না হয়, এই কারণে বর্ণবিভাগের উৎপত্তি হয়। মহাভারতে ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদ হইতে এই কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। নিজদিগকে স্বতন্ত্র রাখিতে, নিজেদের মধ্যে সংবিভাগ করিতে, এমন এক শ্রেণী প্রস্তুত করিতে যাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার দোষ বা ত্রুটি না থাকে, ব্রাহ্মণ-

গণ চিরকাল সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন, সে ভাব এখনও যায় নাই। বেদরক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র কর্ম্ম, ইহাই তাঁহারা ভাবিতেন। এইরূপ ভাবিবার বিশেষ কারণ ছিল, "বেদানাম্ উপনিষৎ সত্যম্" বেদ সকলের রহস্য সত্য, এই মহাসত্য রক্ষা করা হইল ব্রাহ্মণদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই কারণেই তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ হইল।

বৈদিক যুগে বর্ণভেদ ছিল না, সকলের বেদে অধিকার ছিল, ইহা নিশ্চয়। কোন্ সময়ে এবং কি কারণে বর্ণবিভাগ হইল ও প্রতিবর্ণের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইল তাহা আমরা নিশ্চিত জানি না, জানিবার উপায়ও নাই। যতদূর পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি, ব্রাহ্মণ্য যুগে চতুর্ব্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম গঠিত হইয়াছিল, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের যুগকে ব্রাহ্মণ্য যুগ বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধদিগের সহিত সংঘর্ষ ও বিবাদ-ফলে ভারতবর্ষের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার চিত্র আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। সে সময়ের অবস্থার সহিত হিন্দুদিগের পূর্ব্বের অবস্থার কতদূর সাদৃশ্য ছিল, তাহা বলা যায় না। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পুরাতন ধ্বংসের অবস্থা হইতে নূতন সমাজের পুনর্গঠনের চেষ্টা হইতেছে তাহা বুঝা যায়।

ধ্বংসের অবস্থা হইতে পুনর্গঠনের চিত্র আমরা ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর দেশেও দেখিতে পাই। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমের পতন হয়, প্রায় সহস্রবৎসরব্যাপী রোমান সাম্রাজ্য বর্ব্বরদিগের হস্তে ধ্বংস হয়। রোমের নাম ছিল পৃথিবীশ্বরী, ইউরোপীয়গণ যাহাকে সভ্য-জগৎ বলে রোমানগণ সেই সভ্য জগতের অধিকারী ছিল এবং রোম নগরী হইতেই ইউরোপের সকল দেশে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। পতনের পর রোম বর্ব্বরদিগের অধীনে আসিল এবং তাহার সহিত

রোমান্‌দিগের যাহা কিছু পূর্ব্বের গৌরবের সামগ্রী ছিল তাহার লোপ হইল। রোমপতনের পর ইউরোপে তামস যুগ প্রবর্ত্তিত হয়।

পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত ইউরোপে তামসযুগের স্থিতি ছিল। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তিন শত বৎসরকে ইউরোপের মধ্যযুগ বলে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে, সাত শত বর্ষ-ব্যাপী তামস যুগে ধ্বংস-প্রাপ্ত অবস্থা হইতে ইউরোপে ধীরে ধীরে পুনরায় সভ্যতার বিস্তার হয় ও নূতন সভ্য ইউরোপ গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকগণ রোমের পতনের পর নূতন সভ্যতার গঠনকর্ত্তা, প্রধানতঃ ইঁহাদেরই চেষ্টার ফলে ইউরোপীয় জাতিগণ বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার পথে প্রবেশ করে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দু ভারতবর্ষের যে অবস্থা ছিল তাহা ধ্বংসের চিত্র, সে সময়ের দেশকে একটি ধরাশায়ী মহানগরীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রোমের অবস্থাও সে সময়ে প্রায় তদনুরূপ ছিল। ধীরে ধীরে ইউরোপ পুনর্গঠিত হইল, আর হিন্দুরা চির-দাসত্বে প্রবেশ করিল এবং হিন্দুজাতি লোপ পাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে কেন এ প্রকার পৃথক্ ফল হইল তাহা বিচার করিতে হইলে একটি অদ্ভুত কারণ আবিষ্কৃত হয়, সত্য অথবা বেদ রক্ষা করিতে গিয়া আমাদিগের এই অবস্থা ঘটিল। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা এই কথা বলিবেন। একথা বলিলে অনেকে প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে কথাটি যে একান্ত অশ্রদ্ধেয় তাহা মনে হইবে না, ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদরক্ষাই হইল সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র কর্ত্তব্য, এই

কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের তুলনায় অন্য কোন কর্ম্মই ব্রাহ্মণ তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত করিতেন না। দেশরক্ষা অথবা জাতিরক্ষা ইহার সহিত অপর কোন কর্ম্ম তাঁহার চক্ষে গণনার মধ্যে আসে না।

পরহিতকর কর্ম্ম, আর্থিক উন্নতি, শিল্পকলা, এমন কি দেশের লোকের অস্তিত্ব বা লোপ, তাহাদের জীবন অথবা মরণ, তাহাদের সুখ বা দুঃখ, উন্নতি বা ধ্বংস, দেশের স্বাধীনতা বা পরাধীনতা, এসকল বিষয় বেদরক্ষার সহিত তুলনার সামগ্রী বলিয়া ব্রাহ্মণ কখনও মনে করেন নাই। তবে আক্ষেপের বিষয় এবং হিন্দুদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয় বেদরক্ষা হইল না, হিন্দুজাতি ধ্বংস হইল।

দেশের হিতকর অথবা সমাজের হিতকর কর্ম্মের জন্য দেশের যে কোনপ্রকার আয়োজন ছিল না তাহা বলা যায় না। যখন দ্রুপদের নিকট যুধিষ্ঠির প্রস্তাব করেন যে, দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ ভ্রাতার বিবাহ হইবে, তখন দ্রুপদ বলিলেন—

অধর্ম্মোঽয়ং মম মতো বিরুদ্ধো লোকবেদয়োঃ।
ন হ্যেকা বিদ্যতে পত্নী বহূনাং দ্বিজসত্তম ॥

৭—১৯৬ অঃ আদি।

কুত্রাপি বহুব্যক্তির এক পত্নী নাই, সুতরাং এই কর্ম্ম লোকাচার ও বেদ-বিরুদ্ধ প্রযুক্ত অধর্ম্ম বোধ হইতেছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারাও কখন এ ধর্ম্ম আচরণ করেন নাই।

ন চাপ্যাচরিতঃ পূর্ব্বৈরয়ং ধর্ম্মো মহাত্মভিঃ।

এস্থলে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে; প্রথম, বৈদিকধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম, এই দুইটি পৃথক্ ছিল। দ্বিতীয়, দ্রুপদ লৌকিক ধর্ম্মের কথা বলিলেন, কিন্তু স্মৃতির উল্লেখ করিলেন না; খুব সম্ভব সে

সময়ে স্মৃতি লিখিত হয় নাই। যদি লোকধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে এ লোকধর্ম্ম কাহারা প্রণয়ন করিয়াছিল এবং কাহারই বা আদেশে ইহা প্রতিপালিত হইত, সে লোক কাহারা ছিল, আর কোথায় বা গেল ? আমরা মহাভারতে নানা-প্রকার শাস্ত্রের উল্লেখ দেখি। আমরা দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম শব্দ দেখিতে পাই, কিন্তু ইহারা বোধ হয়, পারত্রিক বিষয়-সম্বন্ধে ধর্ম্ম ; আমরা গান্ধর্ব্ব বিদ্যা, লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক শাস্ত্র শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই, সময়ে ব্রাহ্মণের চক্ষে এসকল শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল, রহিল কেবল দেশাচার, সেই দেশাচাররক্ষাই ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম্ম হইল, তাহাদের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মণ কখন মনে আনিতে পারেন নাই, সে শক্তি সে সময়ে ব্রাহ্মণের ছিল না ও পরেও হয় নাই।

কথাটি প্রথমে যত সহজ বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। হিন্দুদিগের জাতীয় ইতিহাসে ইহার তুল্য গুরুতর প্রশ্ন আর নাই। যখন সকলের বেদে অধিকার ছিল ও বর্ণভেদ ছিল না, তখন সকলে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিতে পারিত একথা স্থির। যখন বর্ণবিভাগ হইল তখন প্রতিবর্ণের কর্ম্মেরও বিভাগ হইল। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদরক্ষা একমাত্র না হইলেও প্রধান কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, একথা বোধ হয় স্বীকার করা যাইতে পারে। সমাজ রক্ষা ও প্রতিপালনের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম আবশ্যক তাহা ব্রাহ্মণব্যতীত অপর তিন বর্ণ করিত, ইহা হইল ব্রাহ্মণ্যযুগের কথা। তাহার পর বৌদ্ধযুগ আসিল, বেদরক্ষার ভার তখনও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রধান দেশে শাসনকার্য্য এবং জীবিকানির্ব্বাহ-উপযোগী যেসকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয়, সেসকল কর্ম্ম বৌদ্ধদিগেরই হস্তে গিয়াছিল, ইহাও

বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্যযুগে দেশের সকল কার্য্য হইতে ব্রাহ্মণ নির্লিপ্ত থাকিতেন, এ যুগে ষট্‌কর্ম্ম ছিল তাঁহার কর্ম্মের সীমা।

পুরাতন রোমে ভেষ্টাল্ ভারজিন্ বলিয়া একদল স্ত্রীলোক থাকিত, পবিত্র অগ্নি রক্ষা করাই ছিল তাহাদের একমাত্র কর্ম্ম, দেশের কোনপ্রকার কর্ম্মের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণদিগের ইহার অনুরূপ অবস্থা ছিল কিনা তাহা স্পষ্ট বলা কঠিন। তবে তাঁহারা সেই যুগে ছয়টিমাত্র কর্ম্ম নিজেদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই ছয়টি কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহারা অপর কোন কর্ম্ম তাঁহাদের অধিকারভুক্ত অথবা দেশের অপর কোন কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাদের যে দায়িত্ব ছিল, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তবে দেখিতে পাই, ঋত্বিক্, পুরোহিত, উপাধ্যায়, আচার্য্য, গুরু প্রভৃতি শব্দ কখন এক অর্থে কখন বা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত, ব্রাহ্মণেরা কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে গমন করিতেছেন, তবে এই সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট ছয়টি কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

দেশের লোকের ঐহিক শুভাশুভ তাহাদের শাসন ও পালন, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বলিয়া কখন পরিগণিত হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণ কোন্ সময়ে এবং কি অবস্থায় সমাজের শাসনকর্ত্তা হইলেন ?

বৌদ্ধবিপ্লবের পর, যখন পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থাপিত হইতেছিল, তখন দেশে বৌদ্ধদিগকে ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ এই দুইটি শ্রেণীর লোক ছিল। ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণদিগকে ইতর অথবা পৃথক্ বলিলেন। নূতন গঠিত ব্রাহ্মণ্যসমাজে ব্রাহ্মণগণ

এই ইতর অর্থাৎ পৃথক্কৃতদিগকে শূদ্র, অন্ত্যজ, চণ্ডাল প্রভৃতি নানাপ্রকার হীনতাব্যঞ্জক নাম দিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য সমাজে নিম্নতম স্থান কল্পিত করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অব্রাহ্মণগণ, সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে কোনপ্রকার চেষ্টা করে নাই। তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, ব্রাহ্মণকে দেবতা জ্ঞান করিতে, ব্রাহ্মণ্যসমাজে হেয় ও ঘৃণিত ভাবে বাস করিতে সম্মত হইল। কেন এরূপ হইল সেকথা পরে দেখিব। স্থূলকথা তাহারা এখন ব্রাহ্মণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া বাস করিতে লাগিল, কিন্তু ইহাদের প্রতি তাঁহাদের যে কোন প্রকার কর্ত্তব্য আছে সে কথা ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিলেন না।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যাহারা দেশমধ্যে ছিল প্রায় সকলই ব্রাহ্মণের সৃষ্ট, পূর্ব্বের ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা, যদি কেহ অবশিষ্ট ছিল, অতি সামান্যই ছিল; বৈশ্যেরা প্রায় লোপ পাইয়াছিল, এই উভয় বর্ণই এখন ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবাহী হইল। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন দিনও ক্ষত্রিয়ের অথবা বৈশ্যের স্বতন্ত্র মত ছিল না, বৌদ্ধবিপ্লবের পর সমাজসম্বন্ধে তাঁহাদের যে কোনপ্রকার স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহাও বোধ হয় না। মহাভারতে, দেশে নরপতিকর্ত্তৃক চতুর্ব্বর্ণ-স্থাপনের কথা আছে, স্মৃতিতেও ধর্ম্মস্থাপনের কথা আছে, কিন্তু এই সমাজ ও ধর্ম্মস্থাপন ব্রাহ্মণদিগের অভিমত অনুসারে রাজগণ চেষ্টা করিতেন তাহা বোধ হয় নিশ্চয়। শূদ্রেরা সমাজের বাহিরে থাকিত; যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের পক্ষে পালন অপেক্ষা শাসনের অধিক বিধি গঠিত হইল।

এখন ব্রাহ্মণের কর্ম্মক্ষেত্রের আয়তন কিছু বুঝা যায়, ভারতবর্ষে

পনর আনা ভাগে শূদ্রেরা বাস করিত। এই পনর আনা ভাগের স্বদেশীয় লোকদের সহিত ব্রাহ্মণেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিলেন না। ইহাদের রাজা বা শাসনকর্ত্তা যদি ক্ষত্রিয় হইত, তাহা হইলে সেই রাজা ব্রাহ্মণের আদেশমত কর্ম্ম করিতেন ও শূদ্র প্রজাদিগের সহিত ব্রাহ্মণ যেরূপ আদেশ করিতেন দেশের রাজা সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি অর্থাৎ অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে শূদ্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা অথবা কোনরূপ জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে ব্রাহ্মণেরা অসম্মত ছিলেন। ধর্ম্ম-আলোচনায় কোনপ্রকার সহায়তা প্রদান করিতেও তাঁহারা সম্মত ছিলেন না, এমন কি যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে দেবপূজায় বা অপর কোন ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট কর্ম্মে সাহায্য দান করিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ব্রাহ্মণকে অতি কঠোর দণ্ড প্রদান করিতেন। এরূপ শূদ্রের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য বা তদপেক্ষা অধম হইত।

এখন বুঝা যাইবে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের তুলনা হইতে পারে না। সহস্র বৎসর লইয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অব্রাহ্মণদের হস্তে নির্য্যাতিত হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য সমাজ ধ্বংস পাইয়াছিল, সেই অব্রাহ্মণদিগের—যাহাদের নাম শূদ্র হইল, হস্ত হইতে বেদ, ধর্ম্ম ও নিজদিগকে রক্ষা করা ব্রাহ্মণদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সেই কারণে তাহারা সকল বিষয়ে শূদ্রদিগকে পৃথক্ রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন। পাছে অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কোন ক্ষতি করে, পাছে তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কোনরূপ অপকার হয়, এ ভয়ও

যথেষ্ট ছিল। প্রতিহিংসার ভাবেরও অভাব ছিল না। বৌদ্ধদিগের সহিত বিরোধফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সমাজের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বিপ্লবের পরে শক্তির অভাবে তাহাই রক্ষা করা হইল ব্রাহ্মণদিগের প্রথম ও একমাত্র চেষ্টা। খৃষ্টান ধর্ম্ম, যাহারা খৃষ্টান নয়, তাহাদিগকে প্রদান করিতে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের প্রধান ও একমাত্র কর্ম্ম হইয়াছিল। তাহার কারণ খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের প্রবৃত্তি ও শক্তি ছিল, ব্রাহ্মণদের উভয়ের মধ্যে কোনটাই ছিল না।

এই-সকল কথা বুঝিলে স্মৃতি-রচনার প্রকৃত রহস্য আমরা বুঝিতে পারিব। মহাভারতের সময়ে দেশের শূদ্রদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহার সহিত স্মৃতিযুগের শূদ্রদিগের অবস্থা অনেক পরিমাণে হীন হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের সময়ে যাহাদিগকে প্রকৃতিপুঞ্জ বা প্রকৃতিবর্গ বলিত তাহারা দেশমধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিত। তাহাদের কথা বা মতের যথেষ্ট গৌরব এবং মূল্য ছিল, তাহাদের সম্মতিতে রাজার অভিষেক হইত, অসম্মতি হইলে রাজাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে হইত। তাহাদের অসম্মতি বা অসন্তোষ উপেক্ষা করিলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে, জ্ঞানসম্বন্ধে, রাজ্য-পরিচালনা-সম্বন্ধে, শূদ্রদিগের যেরূপ অধিকার ছিল তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি; কিন্তু অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে এসকলের আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে দেশের লোকের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি মৃতকল্প, তথাপি জীবিত জাতির চিত্র। ইহা হইল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইল একটি মৃত জাতির চিত্র। মহাভারতের সময়ে আমরা স্বাভাবিক

শিশু, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, স্ত্রী, পুরুষ দেখিতে পাই। স্মৃতিতে যাহাদিগকে দেখি তাহাদের মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। মহাভারতে নগরবর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে, একটী জীবন্ত জাতি তথায় বাস করিত। নগরটি প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত থাকিত, প্রধান তোরণ ও অপরাপর তোরণ দ্বারা প্রবেশ করিতে হইত। নগর-মধ্যে রাজপথ, শকটপথ, প্রশস্ত পথ, পয়ঃপ্রণালী থাকিত। পথগুলি নিয়মিতরূপে পরিষ্কৃত ও যন্ত্রদ্বারা জলসিক্ত হইত। চতুষ্পথে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বলিত; পথপার্শ্বে বহুতল উচ্চ অট্টালিকা থাকিত। নগরের মধ্যে চত্বর, উদ্যান, সেনাবাস, পানাগার, স্নানাগার প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্থান থাকিত। উৎসবের সময় নগর সজ্জিত হইত, স্ত্রী-পুরুষ উৎসবে যোগ দিত; আনন্দ ও উপভোগের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই দেখিতে পাওয়া যাইত। পুরুষেরা "সদ্বংশজাত ঘোটকের" উপর চড়িত, স্ত্রীলোকেরা ক্রীড়ারথে বেড়াইত, শিবিকায় চড়িত; নট, নর্ত্তক, গায়ক, বাদক, মল্ল, আরালিক, "যাহারা পশু-গণের সহিত যুদ্ধ করে", ব্যায়ামজীবী, বন্দী, বৈতালিক, ইহারা সকলে নগরবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিত। নৃত্যগীত শিক্ষার সামগ্রী ছিল, রাজা এবং ধনীদিগের গৃহে নাট্যশালা থাকিত। কন্যাদিগের নৃত্যগীত শিখাইতে শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন; মাগধীরা রমণীদিগের প্রসাধন কার্য্য করিত; উদ্যানে, চত্বরে ও "সভাতে" সাধারণলোক সমবেত হইত; "রঙ্গে" অভিনয় দর্শন করিতে যাইত। নগরমধ্যে দেশ-বিদেশের বণিক্ আসিয়া সকল সামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করিত। রেশম, তূলা, পশুলোম নির্ম্মিত বস্ত্র সাধারণে ব্যবহার করিত। সোনা, রূপা, মুক্তা, হীরক, বোধ হয় প্রচুর ছিল; লোকে আসনে, পর্য্যঙ্কের

(সোফা) উপর বসিত ; রাজগৃহে পর্য্যঙ্কের সুবর্ণনির্ম্মিত পাদপীঠ থাকিত, গৃহস্থের গৃহে স্নানাগার রাখিবার প্রথা ছিল, স্নানের সময় শতপাক তৈল ব্যবহার করিত, কেহবা ফুলেল তেল মাখিত, যোদ্ধ-গণের খড়্গের মুষ্টি কখন বা হস্তিদন্তের হইত, কখন বা মণিখচিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত হইত। স্ত্রীলোকেরা হার, বলয়, অঙ্গুরী, কেয়ূর, নূপুর, কাঞ্চি, মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কার পরিত। সচরাচর স্ত্রীলোকের দুইখানি বস্ত্র পরা নিয়ম ছিল, পুরুষেরা মস্তকে উষ্ণীষ, কিরীট, শিরস্ত্রাণ পরিত ; দেখিতে পাওয়া যায়, বালকেরা দল বাঁধিয়া নদীতীরে অথবা দূরস্থানে চড়ুইভাতি করিতে যাইতেছে ; বালকেরা অস্ত্রশিক্ষা করি-তেছে, তাহাদের অস্ত্রপরীক্ষা হইতেছে ; রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষার দিন নগরে মহোৎসব হইত ; ব্রাহ্ম মহোৎসব, পাশুপত উৎসব, গিরি-উৎসব প্রভৃতি উৎসবের শেষ ছিল না। লোকে স্বদেশে ও বিদেশে ব্যবসা করিত, সমুদ্রযাত্রা করিত, বিদেশযাত্রী বণিক্‌দিগের সুবিধার নিমিত্ত সমুদ্রপথ নির্ম্মিত হইত। তখন স্ত্রীলোকে পথে বেড়াইত, স্ত্রী-পুরুষের যৌবনকালে বিবাহ হইত, গান্ধর্ব্ব বিবাহ তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারতে স্ত্রীলোকের চিত্র অনেক স্থানে অঙ্কিত আছে। প্রক্ষিপ্ত অনুশাসন পর্ব্ব বাদ দিলে মহাভারতে স্ত্রীলোকের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত মনুস্মৃতিতে যে প্রকার স্ত্রীচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তুলনা করিলে মনে হয় স্বর্গ হইতে নরকে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহাকে মনুস্মৃতি বলে তাহা বোধ হয় সঙ্কলন মাত্র —হিন্দুদিগের মানসিক ও নৈতিক পতনের শেষ অবস্থায় সঙ্কলিত। স্মৃতিগুলি পড়িলে এ সকলের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না, উপরন্তু মনে হয় যে, এমন দেশে আসিয়াছি যে দেশে হাসি নাই,

কৌতুক নাই, ক্রীড়া নাই, আনন্দ নাই, উৎসব নাই, যে দেশে জীবিত মনুষ্য ও মৃত মনুষ্যে প্রভেদ নাই, যে দেশে মনের স্বাধীনতা অর্থাৎ মনের বিকাশের নাম পাপ, যে দেশে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নাই, যে দেশে প্রতিবাদ নাই, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই, অত্যাচারের প্রতিকার নাই, বিনাবাক্যে সজীব কাষ্ঠপুতুলের তুল্য আজ্ঞাপ্রতিপালন যে স্থানে একমাত্র ধর্ম্মের লক্ষণ, যেস্থানে নীরব দাসত্ব একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য। স্মৃতিগুলি পড়িলে আরও একটি কথা মনে হয়, যাহারা বেদ ও বেদাঙ্গ লিখিয়াছিল, সে জাতি কোথায় গেল ? যাহারা সাঙ্খ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন প্রণয়ন করিয়াছিল, যাহারা ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ রচনা করিয়াছিল, সে জাতি কবে অদৃশ্য হইল ? মহাভারতের সময়েও ব্রাহ্মণেরা বলিতেন "চতুর্ব্বর্ণকে বেদ শুনাইবে", এখন হইল "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ"। তখন শূদ্র বেদান্ত পড়িত, নিজে শিখিয়া অপরকে শিখাইত, এখন বেদবাক্য উচ্চারণ করিলে শূদ্রের কণ্ঠে তপ্ত তৈল প্রদানের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বে পতিতের সহিত একত্রে যান, আসন ও ভোজন নিষিদ্ধ ছিল না, এখন সম্ভাষণে আচমনের বিধি হইল এবং নিয়ম হইল, হীনবর্ণ উৎকৃষ্টসহ একাসনে অবস্থানে কটিকৃতাঙ্ক বিবাসনবিধি। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে শূদ্রের অধিকতর অধঃপতন হইয়াছিল, না ব্রাহ্মণের অধিকতর অধঃপতন হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। যে ব্রাহ্মণেরা একসময়ে দর্শনপ্রণেতা ছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণ বিধি করিলেন যে, লবণ দান করিলে লাবণ্য হয়, আর ধান্যহরণে মূষিকযোনি লাভ হয় এবং মধুহরণে মধুমক্ষিকা হয় ; যখন হিন্দুসমাজ ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল, তখন সাধারণের বিচারকার্য্যে এই নিয়ম ছিল যে, 'সামান্যার্থে ব্যবহারে প্রবৃত্তে প্রিয়াপ্রিয়ে বর্জ্জয়ন্নেব'

যত্বাৎ'—৬-৬৫ অঃ শান্তি। ধর্ম্মকাম ক্ষত্রিয় সাধারণের বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কাহাকে প্রিয় অথবা কাহাকে অপ্রিয় জ্ঞান করিবে না। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণপ্রধান হইবার পর বিচারগৃহে শূদ্রদিগের পক্ষে অর্থাৎ দেশের পনরআনা ভাগ লোকের পক্ষে বিচারকার্য্যে কিরূপ বিধান হইল তাহা আমরা সকলে জানি। স্মৃতিযুগে সকল বিষয়ে দেশের লোকের অবনতি হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এই অবনতি সম্পূর্ণভাবে ও পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছিল।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা দেশান্তরে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করিলে তাঁহাদের নিন্দা হইত, স্মৃতিযুগে সে ভাব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

যেষাং বলকৃতা বৃত্তিস্তেষামন্যা ন রোচতে।
তেজসাভিপ্রবর্ত্তন্তে বলবন্তো যুধিষ্ঠির॥

৭—১৩২ অঃ শান্তি।

যাঁহারা বলপূর্ব্বক বৃত্তি উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অন্যবিধ উপার্জ্জনে রুচি হয় না; বলবন্ত ব্যক্তিগণ নিজতেজ-প্রভাবে জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। তখন বলিত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বলিত—

কর্ম্মণা যেন কেনৈব মৃদুনা দারুণেন চ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ॥

৭২—১৪০ অঃ আদি।

যখন আপনি হীনাবস্থায় পতিত হইবে, তখন মৃদু বা দারুণ যে কোন কর্ম্মদ্বারা হউক আপনাকে উদ্ধার করিবে; পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন ধর্ম্মাচরণ করিবে। তখন, স্বদেশ কাহাকে বলে—এ

প্রশ্নের উত্তর দিত,—যত্র হি উপজীবিকা ; যেস্থানে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় আছে তাহারই নাম স্বদেশ। মহাভারতের সময় হিন্দুরা বলিত —নাস্তি প্রাণসমং দানং। আর স্মৃতিতে নিয়ম হইল একাকী পথ-গমন দোষাবহ, রাত্রিতে পথগমন ভয়জনক।

কোন জাতির মানসিক ও নৈতিক অবনতির এরূপ ভয়ঙ্কর উদা-হরণ জগতে আর কোথাও নাই, আর আমাদের মত ভয়ঙ্কর প্রায়-শ্চিত্ত জগতে কোন জাতিকে কখন করিতে হয় নাই। কেবল মানসিক অথবা নৈতিক অবনতি বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হইবে না, মনুষ্যত্ব ও নীতি এই উভয়ের জ্ঞান দেশ হইতে লোপ হইয়াছিল, অন্যায় ও দুর্নীতি দেশের নীতি ও ধর্ম্ম হইল।

পূর্ব্বে কতকগুলি জীবিকানির্ব্বাহক শাস্ত্র ছিল, লোকে সকল বিষয় নিয়মিতরূপে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিত। যে কোন বিষয়েরই শিক্ষা হউক না কেন শিক্ষকের স্থান অতি উচ্চ ছিল, যে কুস্তি শিখাইত তাহাকেও ঋষি বলিত, সে শাস্ত্রকে মল্লশাস্ত্র বলিত, এখন ব্রাহ্মণ নিয়ম করিলেন "জীবিকাশাস্ত্রপাঠে কোন ফল নাই" এই প্রকার নিয়মের ফলে সকল প্রকার জীবিকানির্ব্বাহক শাস্ত্র, কৃষি, শিল্প কর্ম্ম, বাণিজ্য নীচ, অস্পৃশ্য, ইতর, অশিক্ষিত শূদ্রদিগের মধ্যে আবদ্ধ রহিল। বণিক্, চণ্ডাল (তাহার সহিত রাজকর্ম্মচারী কায়স্থও এক বেষ্টনীর মধ্যে পড়িল), আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী বৈদ্য, শূদ্র-দিগের মধ্যে পরিগণিত হইল, গন্ধর্ব্ববেদ-অনুশীলনকারীরা সমাজের নিম্নতম স্থানে শূদ্রদিগের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এখন স্মৃতিসম্বন্ধে কথাগুলি একত্র করা প্রয়োজন, স্মৃতিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং হিন্দুসমাজে স্মৃতিগুলির স্থান বুঝিতে না

পারিলে হিন্দুসমাজের ইতিহাস অথবা হিন্দুজাতির ইতিহাস বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা ; এসম্বন্ধে চিন্তা করিবার সামগ্রী বোধহয় এইগুলি—

গৃহযুদ্ধ—এক সহস্র বৎসরের অধিক বৈদিক অবৈদিকদিগের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে, প্রথমে বোধহয় বৌদ্ধদিগের সহিত আরম্ভ হয়, পরে বৈদিক-বৌদ্ধসংঘর্ষফলে যে অগণিত বিকৃত ও সঙ্কর সম্প্রদায় জন্মিয়াছিল—সকলের সহিত বৈদিকদিগের বিরোধ হয়, সে বিরোধ আজিও শেষ হয় নাই ; বোধ হয় সপ্তম, অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভুত্ব পুনঃ স্থাপিত হয়।

গৃহযুদ্ধের ফল—প্রথম, ধর্ম্মসম্বন্ধে। দেশে সমগ্র বেদ ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যাইত ; সন্ন্যাসী (অবৈদিক) দিগের সহিত সংঘর্ষের ফলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের লোপ, কর্ম্মত্যাগ ও নিবৃত্তিধর্ম্মের প্রবলতা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের লক্ষণ হইল, শঙ্করাচার্য্য এই নিবৃত্তি-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্যোগী। যজ্ঞের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত প্রতিমা ও প্রতিমা গড়িয়া দেবপূজা প্রবর্ত্তিত হইল, উপকথার ছলে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পুরাণ লিখিত হইল।

দ্বিতীয়, আশ্রম। ব্রাহ্মণ্যযুগে প্রবর্ত্তিতও প্রচলিত চতুরাশ্রম ধ্বংস হইল, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসগ্রহণ কেবল ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল, এখন সকল বর্ণ সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী হইল। আশ্রম লঙ্ঘন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন ব্রাহ্মণ্যযুগে নিষিদ্ধ ছিল, এখন উহা অবারিত হইল, শঙ্করাচার্য্য ইহার উদাহরণ।

তৃতীয়, বর্ণ। বৌদ্ধবিপ্লবের পূর্ব্বে দেশে যে চতুর্ব্বর্ণ ছিল তাহা এক প্রকার বিনষ্ট হইল।

(ক) ব্রাহ্মণ। অতি অল্প ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ্যযুগের ব্রাহ্মণের সদৃশ

রহিল। প্রায় সকলে ষট্‌কর্ম্মত্যাগী হইল, ভিক্ষা প্রধান ও একমাত্র বৃত্তি হইল, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাণী বিবাহ প্রচলিত হইল, অতি সহজে অন্য বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ্যলাভ হইবার সুবিধা হইল; ব্রাহ্মণের গৃহে শূদ্রাণী পাচিকা হইল, ব্রাহ্মণ তিন পুরুষ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেও পুনঃ গ্রহণের অনুমতি পাইল।

(খ) ক্ষত্রিয়। পুরাতন অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যযুগে যে ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিল তাহা রহিল কিনা সন্দেহ। যদি কোথাও দেখা যাইত অতি অল্প সংখ্যায় রহিল, ক্ষত্রিয় ও অবৈদিক প্রায় এক শব্দ হইল, চতুর্ব্বর্ণ হইতে নূতন ক্ষত্রিয় বর্ণ গঠিত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয়-সদৃশ রাজপুত্র বলিয়া এক নূতন শ্রেণী হইল।

(গ) বৈশ্যদিগের অবস্থা অতিশয় হীন হইল, শূদ্র হইতে বৈশ্য প্রায় অভিন্ন হইল।

(ঘ) শূদ্র একটি সাধারণ শব্দ, বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যাহারা বহির্ভূত (মুষ্টিমেয় নব সৃষ্ট ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য বাদ দিলে), তাহাদের সকলের সাধারণ নাম শূদ্র হইল, ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং বৃত্তি-ভেদে তাহারা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইল, পরে এই সকল বিভাগের নাম হইল 'জাতি'।

গৃহযুদ্ধের ফল। এই দীর্ঘকালব্যাপী-যুদ্ধের ফল হইল পুরাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও সমাজের ধ্বংস এবং অবৈদিকগণের সহিত সন্ধি ও সংমিশ্রণ। গীতা এই সন্ধির চেষ্টা, এবং শঙ্করাচার্য্য, সংমিশ্রণের উদাহরণ। মহাভারতের সময় অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম দেশমধ্যে প্রবল হইয়াছে তাহা বোধ হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ

শতাব্দীতে কেবলমাত্র 'মধ্যদেশে', বর্ত্তমান প্রয়াগ হইতে গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থানে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, ধীরে ধীরে উত্তর-ভারতবর্ষে প্রসারিত হইল। স্মৃতিযুগে অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পূর্ব্বদেশ, পঞ্চনদ, দক্ষিণ-ভারতবর্ষ শূদ্রদেশ না হইলেও শূদ্রপ্রধান ও ম্লেচ্ছদেশ ছিল। অগণিত পরস্পরবিরোধী সঙ্কর ও অবৈদিক সম্প্রদায়ে এই শূদ্রেরা বিভক্ত ছিল। বহু শতাব্দীব্যাপী অবিরাম গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় হইল, কিন্তু তাহার সহিত শ্রান্তি, অবসাদ এবং অবনতিরও যথেষ্ট লক্ষণ দেখা দিল। মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অধঃপতন হইলেও তাহাদের মধ্যে উচ্চ আদর্শ দেখা যাইত, ও জীবনীশক্তি যে এককালে লোপ পায় নাই তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে হইল পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা, অষ্টম নবম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণদিগের অধঃপতন বোধ হয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, স্মৃতি-গুলি সেই অধঃপতনের সময়ে লিখিত ও তাহার পরিণাম। শিশুবুদ্ধি, মানসিক ও নৈতিক অবনতি, তাহার সহিত অবৈদিকদিগের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসা স্মৃতিগুলির প্রধান লক্ষণ হইল; পূর্ব্বে দেশ ক্ষত্রিয় দ্বারা রক্ষিত, পালিত ও শাসিত হইত, এখন হইতে দেশ ব্রাহ্মণদ্বারা শাসিত হইল; সমাজে অপরাধের নাম হইল পাপ, দণ্ড হইল প্রায়শ্চিত্ত। বিচারকর্ত্তা ও ব্যবস্থাপক এ উভয়েরই স্থান ব্রাহ্মণেরা অধিকার করিলেন। মহাভারতে লিখিত বিচারপদ্ধতির সহিত স্মৃতিলিখিত বিচারের প্রণালী পড়িলে ব্রাহ্মণদিগের মানসিক ও নৈতিক অধঃপতনের মাত্রা বুঝা যায়। কিন্তু মহাভারতের সময়ে স্ত্রীলোকদিগের বর্ণনা, সে সময়ে তাহাদের সমাজে স্থান, তাহাদের আচরণ এ সকলের সহিত মনুস্মৃতিতে লিখিত স্ত্রীচরিত্র, স্ত্রীলোকের

প্রতি ব্যবহার তুলনা করিলে আর তিন শত বৎসরে হিন্দুদিগের কি অধঃপতন হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ হয়।

দেশে তখন পনর আনা অথবা তাহার অধিক লোক শূদ্র অর্থাৎ অবৈদিক, তাহাদের অবস্থা আরও বিস্ময়কর হইল। এমন কুকথা নাই যে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগের প্রতি ব্যবহার না করিয়াছিলেন, এমন কুব্যবহার নাই যে তাহাদের জন্য ব্যবস্থা না করিয়াছিলেন, তথাপি সেই শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের অনুকম্পার নিমিত্ত লালায়িত হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর যাইতে হয় না; বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধ হয়, উভয় দলের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষে বৌদ্ধদিগের পরাজয় হয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম যে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পায় তাহা যুদ্ধের ফলে নয়, আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতাফলে বৌদ্ধধর্ম্ম নষ্ট হয়। শেষ অবস্থায় বিকৃত বৌদ্ধদিগের দুর্নীতি ও দুরাচারের সীমা রহিল না, কোন গৃহ বা সমাজ সেরূপ শিক্ষা বা আচার দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না, অপরপক্ষে ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা ও চরিত্র সম্বন্ধে চিরদিনই উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন। বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, উপনিষৎ, পুরাণ এ সমস্ত প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পাঠ্য বলিয়া চিরদিনই প্রসিদ্ধ। তান্ত্রিক অথবা অপর বিকৃত বৌদ্ধসম্প্রদায়দিগের বীভৎসতা কখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। বাধ্য হইয়া শূদ্র (অবৈদিক) দিগকে পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের শরণ লইতে হইল। অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন না। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ", এ মহাবাক্য ব্রাহ্মণ চিরদিনই সযতনে রক্ষা করিয়াছেন, এমন কি নিকটে আসিতে পর্য্যন্ত অনুমতি দেন নাই; ব্রাহ্মণের আদেশে অধিকাংশ অবৈদিক হইল অস্পৃশ্য।

অনেক পরে ও অনেক সাধ্যসাধনার ফলে পৌরাণিক উপকথা শূদ্রদিগের ধর্ম্ম বলিয়া স্থির হইল, শূদ্রদিগের প্রতি অনুগ্রহের এই চরম সীমা।

ব্রাহ্মণের কি দুর্গতি হইয়াছিল, তাহাদের নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন কতদূর গভীর হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা নিজেরাই ব্যক্ত করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণো নাম ভগবান্" ব্রাহ্মণ হইলেন স্বয়ং ভগবান্, "ভগবান্ গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও নমস্কার করেন", "ব্রাহ্মণের পদাঘাত-চিহ্ন স্বয়ং ভগবান্ নিজবক্ষে ধারণ করেন", "ব্রাহ্মণ শত পাপ করিলেও সতত পূজ্য", তাঁহারা নিজে এই কথা বলিতেন। পশুদিগের মধ্যে যদি দম্ভ বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে এরূপ কথা বলিতে পশুরাও লজ্জাবোধ করিত। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আছে; শূদ্রেরা একথা স্বীকার করিল, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে দেশের লোকের এইরূপ মানসিক অবস্থা ছিল, দশম শতাব্দীতে মুসলমানেরা এদেশ আক্রমণ করিল।

যে অনুপাতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হইবার ফলে ধ্বংস হয় সেই অনুপাতে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তারিত হয়। শত শত বৎসরব্যাপী বৌদ্ধ প্রভুত্ব ও সংঘর্ষফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সমাজ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বিধ্বস্ত-ধর্ম্ম ও সমাজ পুনঃ-সংস্থাপনের ও পুনর্গঠনের জন্য প্রথমে চেষ্টা করিয়াছিলেন! বেদপাঠ ও বেদপ্রচলন, এবং চতুর্ব্বর্ণগঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, উভয় চেষ্টাই বিফল হয়। কিছুদিন বেদের শাখা অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল, পরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ হইল ব্রাহ্মণের বেদের সহিত সম্পর্কের সীমা। চতুর্ব্বর্ণ আর গঠিত হইল না; পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণ্যসমাজ আর স্থাপিত

হইল না, মুষ্টিমেয়মাত্র ব্রাহ্মণ, শূদ্রবহুল ও শূদ্রবেষ্টিত দেশে বাস করিতে লাগিল। তখনও শূদ্র হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল, পুর্ব্ব ব্যবহার নিমিত্ত দ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাব পুর্ণমাত্রায় ছিল; ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের হইতে পৃথক্ রহিলেন। যাহারা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইল, অথবা যাহাদের প্রতি তাঁহারা বলপ্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাহাদের জন্য কঠোর নিয়ম ব্যবস্থা করিলেন; নিজেদের রক্ষা ও নিজেদের প্রভুত্বরক্ষা হইল একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহার নাম হইল ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের মুখে এক কথা চিরদিনই আছে—তিনি ধর্ম্মরক্ষা করেন। প্রকাশ করিলেন, যে তাঁহারা ভগবান্, সুতরাং তাঁহাদের আজ্ঞাপালন ভগবানের আজ্ঞাপালন, সে স্থলে বিচার নাই, ব্রাহ্মণের আজ্ঞাপালন হইল দেশের লোকের পক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহাদের আজ্ঞালঙ্ঘন ভগবানের বিপক্ষে দ্রোহাচরণ। ব্রাহ্মণ নিয়ম করিলেন জীবিকা-শাস্ত্রপাঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষ্ফল। সেই কারণে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, এ সমস্ত শূদ্রের হাতে পড়িল। অশিক্ষিত ও ঘৃণিত শূদ্রের সম্পর্কে আসিয়া সমস্ত জীবিকানির্ব্বাহ-উপযোগী চেষ্টা ঘৃণিত হইল।

তখন দেশের শূদ্রসংখ্যা বোধ হয় লোকসংখ্যা-অনুপাতে শতকরা ৯৫ জনের অধিক ছিল। তাহাদের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, এ সকলের সহিত ব্রাহ্মণের কোন সম্বন্ধ রহিল না; কারণ তাহারা হইল ইতর অর্থাৎ পৃথক্ ও ঘৃণার পাত্র। ধর্ম্মের সংস্কার অথবা সমাজের পুনর্গঠন করিবার ব্রাহ্মণের শক্তি হইল না, কোনপ্রকার পুনর্গঠনের নিমিত্ত শক্তির প্রয়োজন, ব্রাহ্মণের সে শক্তি ছিল না। সুতরাং সে অবস্থার রক্ষাই হইল একমাত্র গতি, সেই কারণে প্রচলিত দেশাচার-রক্ষা হইল ব্রাহ্মণের একমাত্র অনুশাসন। আচাররক্ষা, ব্রাহ্মণ প্রধান

ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা করিলেন। গতপ্রাণ নির্জ্জীব ব্রাহ্মণের গত্যন্তর ছিল না।

স্মৃতিযুগ-আরম্ভে দেশ ব্রাহ্মণশাসনাধীন হইল—ক্ষত্রিয় নামমাত্র রাজা রহিল। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুদেশ, হিন্দুজাতি বলিয়া কোন সামগ্রী রহিল না। দেশের পনর আনা ভাগ লোক হইল শূদ্র অর্থাৎ অহিন্দু, তাহারা ইতর অর্থাৎ পৃথক্, গণনার বহির্ভূত। এক আনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইল দেশের লোক। বৌদ্ধ ও অবৈদিকদিগের সহিত বিবাদের ফলে ব্রাহ্মণের এক কর্ম্মমাত্র রহিল তর্ক ও বিচার। ভাস্কর আচার্য্য ও তাঁহার মত দু-চারিজন পণ্ডিত ভিন্ন সকল পণ্ডিতের একমাত্র কর্ম্ম হইল মতখণ্ডন ও মতস্থাপন। এ ভাব আজও সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালাদেশে আছে। যাহা কিছু আচরণীয় ধর্ম্ম রহিল তাহা নিবৃত্তিমূলক। শূদ্রেরা অর্থাৎ দেশের পনর আনা লোকদিগকে শিক্ষা দিবার কেহ রহিল না। বিকৃত বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ তাহাদের একমাত্র শিক্ষাদাতা হইল।

যাহাকে অন্য দেশে জাতীয়তা, দেশপ্রেম, স্বধর্ম্ম-অনুরাগ বলে সে জ্ঞান অবধি লুপ্ত হইল। দেশের মঙ্গলের জন্য পরস্পরের সহিত সহানুভূতি, সহকারিতা, সাহায্য পাপ বলিয়া পরিগণিত হইল, দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল দেব ও দাস, এই দাসদিগকে শিক্ষাপ্রদানের নাম হইল পাপ। তাহারা যে শিক্ষা পাইত তাহা হইল নিবৃত্তিমূলক; বৈরাগ্যভাবে জর্জ্জরিত জাতির মনে বিপ্লব বা প্রতিকারের চেষ্টা, এমন কি চিন্তা পর্য্যন্ত উদয় হওয়া সম্ভব নয়।—চিরদাসত্ব যে এরূপ হতভাগ্য জাতির ভাগ্যলিপি হইবে তাহা বিধাতার অনুশাসন।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

বাঙ্গালা দেশ।

এখন আমরা বাঙ্গালাদেশে যাইব, হিন্দুদিগের সামাজিক ইতিহাস বুঝিতে হইলে, বাঙ্গালাদেশ হইতে যেরূপ শিক্ষা পাওয়া যায়, সেরূপ শিক্ষা ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশ হইতে পাওয়া যায় না। একটা প্রবাদ আছে যে, বাঙ্গালাদেশ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ, কথাটি কিন্তু সত্য নয়। যখন যুধিষ্ঠির তিন ভ্রাতার সহিত তীর্থদর্শনে নির্গত হন, তখন তিনি বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়া "পঞ্চশত নদী [ডেল্টা] মধ্যে অবগাহন করিয়াছিলেন"। পুলস্ত্য ভীষ্মকে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থের কথা বলিতেছেন; ৪—৮৫ অঃ বন।

অর্জ্জুন বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছিলেন—

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানিচিৎ।
জগাম তানি সর্ব্বাণি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥

৯—২১৫ অঃ আদি।

অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে যে সকল তীর্থ ও পবিত্র স্থান আছে, অর্জ্জুন তৎসমুদায় স্থানে গমনপূর্ব্বক যথাবিধানে দর্শন করিয়া, সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন।

তথাপি বাঙ্গালীদের অবৈদিকতাসম্বন্ধে যে নিন্দা আছে, তাহা একান্ত অমূলক নহে। মহাভারতে বাঙ্গালাদেশের নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে তাহা দিতেছি; ইহার সদৃশ উপাখ্যান অপরাপর পুরাণেও আছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বর্ণনার কিছু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

অঙ্গিরা ঋষির তিন পুত্র ছিল, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত ও উতথ্য। উতথ্যের পত্নীর নাম মমতা ; মমতার গর্ভে যখন ভ্রূণ ছিল, তখন বৃহস্পতি মমতার সহিত উপগত হইবার চেষ্টা করেন। গর্ভস্থ ভ্রূণ বাধা দেওয়াতে বৃহস্পতি তাহাকে অভিশাপ দেন যে, তুমি দীর্ঘতমা অর্থাৎ চিরান্ধ হইবে, সেই শাপের ফলে শিশুটি অন্ধ হইয়া জন্মিল। গর্ভস্থিতি অবস্থাতেই তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছিলেন। যথা-সময়ে তিনি প্রদ্বেষী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করেন, এবং তাহার গর্ভে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে। দীর্ঘতমা অন্ধতাহেতু, জীবিকা-উপার্জ্জনে অশক্ত ছিলেন, এই কারণে গৃহে প্রায় অশান্তি হইত। একদিন স্বামী স্ত্রীর বচসা-উপলক্ষে দীর্ঘতমা তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "আমাকে ক্ষত্রিয়কুলে লইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি ধনবতী হইতে পারিবে।" প্রদ্বেষী নিজ পুত্রগণকে বলিলেন—"তোমাদের পিতাকে বন্ধন করিয়া উড়ুপে নিক্ষিপ্ত করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দাও" ; পুত্রেরা তাহাই করিল। বলি নামে একরাজা নিজ মহিষীর সহিত গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দীর্ঘতমার ভেলা ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন এবং নিজগৃহে লইয়া গেলেন। বলিরাজা অপুত্র ছিলেন, একদিন তিনি দীর্ঘতমাকে বলিলেন "আপনি আমার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে আমার পুত্র উৎপাদন করুন।" দীর্ঘতমা স্বীকৃত হইলেও, সুদেষ্ণা স্বয়ং না গিয়া নিজ শূদ্রা দাসীকে দীর্ঘতমার নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ দাসীর গর্ভে দীর্ঘ-তমার ঔরসে কাক্ষীবান্-আদি একাদশ পুত্র জন্মে। বলিরাজা, পরে এসকল ঘটনা জানিতে পারিয়া সুদেষ্ণাকে পুনরায় দীর্ঘতমার নিকট প্রেরণ করেন ; এবং তাঁহার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ,

কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। যাহার ক্ষেত্র তাহার পুত্র, এই বিধি-অনুসারে পুত্রগুলি বলিরাজার হইল। "অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গ দেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্র দেশ, ও সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ হইল।" ইহাই হইল অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি দেশের নামের উৎপত্তির কারণ।

এই উপাখ্যানটি প্রায় সকল পৌরাণিক উপাখ্যানের ন্যায় একটি রূপক, সে সময়ে দেশের লোকের রুচি-অনুসারে রূপকটি ঐ প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। সকল রূপকের ন্যায় ইহার দুই প্রকার অর্থ আছে, বাহিরের অর্থ একটি গল্প যাহা উপরে লিখিত হইল, কিন্তু এই গল্পের আকারে একটি ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে। একটু চিন্তা করিলে সেই তথ্যটি বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। উতথ্য ও বৃহস্পতি হইলেন অঙ্গিরার পুত্র, অঙ্গিরাসম্বন্ধে উক্ত আছে যে তিনি অঙ্গার, অগ্নি নন্; অগ্নি ও বেদ একই অর্থবাচক। তাহা হইলে অঙ্গিরা হইলেন বেদসদৃশ মত, কিন্তু অবিকল বেদমত নয়। তাঁহার নামের নির্ব্বচনেও সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অ অর্থে পাপ, গিরঃ অর্থে বাক্য বা মত; পাপ হইতে যিনি ত্রাণ করেন তাহার নাম অত্রি; তাহা হইলে অঙ্গিরা নামের সহিত পাপের অর্থাৎ অজ্ঞানতার মিশ্রণ আছে। অঙ্গিরার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উতথ্য উ বিতর্কে, তথ্য শব্দের অর্থ সত্য। যাঁহার সত্যসম্বন্ধে সন্দেহ আছে তিনি উতথ্য। আমরা বৃহস্পতিকে তিনরূপে দেখিতে পাই; প্রথম দেবগুরু বৃহস্পতি, দেবগুরু বলিলে সম্পূর্ণ বৈদিকভাব আসে, কারণ দেবতারা হইলেন বেদের উপাসনার সামগ্রী। ঐ দেবগুরু বৃহস্পতি যোগবলে দৈত্যগুরু শুক্র হইয়াছিলেন। দৈত্য ও অসুর

আমরা জানি অবৈদিকদিগের নামান্তর। তাহা হইলে বৃহস্পতি নামে বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই ভাবই আসে। আবার, নাস্তিক লোকায়ত-মতপ্রণেতার নাম বৃহস্পতি। যেমন অঙ্গিরানামে জ্ঞান অজ্ঞান অর্থাৎ বৈদিক ও অবৈদিক এই উভয়ের মিশ্রিত ভাব আসে, সেইরূপ উতথ্য ও বৃহস্পতি এ উভয় নামে মিশ্রিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উতথ্যের স্ত্রীর নাম মমতা। ম অর্থে মৃত্যু, মৃত্যু অর্থাৎ অজ্ঞানতা। তাহা হইলে উতথ্য অর্থাৎ যাহার সত্য-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাহার স্ত্রী হইল অজ্ঞানতা। এই উভয়ের সন্তান হইল দীর্ঘতমা, অর্থাৎ জ্ঞানান্ধ। দীর্ঘতমার আর এক পরিচয় আছে, মহাভারতের স্থানান্তরে দীর্ঘতমার নাম দেওয়া হইয়াছে গৌতম। গৌতম হইল বুদ্ধদেবের নামান্তর, এবং তাহার মাতার নাম ছিল মায়া, দীর্ঘতমার মাতার নাম মমতা। এস্থলে দীর্ঘতমার জ্ঞান-অন্ধতার সম্বন্ধে স্পষ্টই ইঙ্গিত পাইলাম। গৌতম নামের সম্পর্কে দীর্ঘতমার বৌদ্ধ ভাব প্রকাশ পাইল; অথচ তিনি বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী ছিলেন। অঙ্গিরা প্রভৃতি নামে যেমন মিশ্রিত ভাব আছে, সেইরূপ দীর্ঘতমা নামেও জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈদিক, বৌদ্ধ একত্রে এই দুই মত দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারত একজনের লেখা নয়, তাহার প্রমাণ এই দীর্ঘতমা-উপাখ্যানেই আছে। একস্থানে লিখিত আছে দীর্ঘতমার নাম গৌতম, অপর স্থলে আছে, দীর্ঘতমার পুত্রের নাম গৌতম। আমাদের যাহা বুঝিবার প্রয়োজন এই অনৈক্যহেতু তাহার কোন ক্ষতি হয় না। মিশ্রিত ভাব, অঙ্গিরার বংশে সকলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য্য,

দ্রোণাচার্য্যের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা, ইহাদের সকলের মধ্যেই অবৈদিক ও বৈদিক এই উভয়েরই মিশ্রিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, একথা স্থানান্তরে বিচার করিয়াছি।

স্বীয় পত্নী প্রদ্বেষীর সহিত, কলহকালে অন্ধ দীর্ঘতমা বলিয়াছিলেন আমাকে "ক্ষত্রিয়কুলে লইয়া যাও তাহা হইলে তুমি ধনবতী হইতে পারিবে।" এই কথাগুলির যে একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুল, বংশ প্রভৃতি শব্দ, সন্তান শব্দের সদৃশ। তনু বিস্তারে, যাহা দ্বারা (মত) বিস্তার হয়; ভিন্ন ভিন্ন মতকে স্ত্রী পুরুষের আকার দিয়া তাহাদের পুত্র কন্যা কল্পনা করিয়া ঐ মতের বিচার, ইহাই হইল পুরাণের বংশানুকীর্ত্তন, এবিষয় স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুল অর্থে যদি ক্ষত্রিয় মত হয়, তাহা হইলে কোনপ্রকার অবৈদিক মত অথবা বৌদ্ধ মত বুঝায়। ক্ষত্রিয় অর্থে অবৈদিক ইহা আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থানে দেখিয়াছি, 'তুমি ধনবতী হইবে' এস্থানে ধনশব্দের অর্থে টাকাকড়ি কিংবা ধর্ম্মরূপ ধন তাহা স্পষ্ট বলা যায় না। বলিরাজার মহিষীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি পাঁচটি পুত্র জন্মে, কিন্তু ইহারা হইল বলিরাজার পুত্র।

এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষিজঃ।

৫৫—১০৪ অঃ আদি।

পূর্ব্বকালে এইরূপে মহর্ষিজাত, বলিরাজার বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালী প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় এবং বলি রাজার বংশ। বল নামে এক দৈত্য ছিল, ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন, বল ও বলি, নদ ও নদী শব্দের ন্যায় এক কথা

হইতে পারে। দৈত্য প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি, এস্থলেও বলি শব্দের সহিত অসুর অর্থাৎ অবৈদিকভাবের ইঙ্গিত আসে। অঙ্গ প্রভৃতির নামগুলির নির্ব্বচন করিলে এই দৈত্য বা অবৈদিকভাব আরও অধিক স্ফুটতর হয়। "অং পাপং গচ্ছতি ইতি অঙ্গঃ" পাপ অর্থে অজ্ঞানতা বা অবৈদিকতা তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। বঙ্গ শব্দেরও ঐ অর্থ হইতে পারে। অনেক স্থলে শব্দের পূর্ব্বে ব বর্ণের কোন অর্থ থাকেনা, যেমন ঋষভ, বৃষভ, উভয় শব্দেরই অর্থ ষাঁড়। অংস ও বংস উভয় শব্দে স্কন্ধ বুঝায়; তাহা হইলে অঙ্গ শব্দের ন্যায় বঙ্গ শব্দে ও অবৈদিকতার ছায়া পড়ে। কলিঙ্গ শব্দের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। "কলিং পাপং গচ্ছতি ইতি কলিঙ্গঃ" কলি, পাপ, বৌদ্ধমত, অবৈদিকতা ইহাদের পরস্পর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পুণ্ড্র শব্দের অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না। তবে পুণ্ড্র নামে এক দৈত্য ছিল তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। সুহ্ম শব্দ সুন্‌ভ+অন্, এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুইজন বিখ্যাত দৈত্য ছিল; শ ও স অনেক সময় পরিবর্ত্তনীয়। যেমন বশিষ্ঠ ও বসিষ্ঠ, দাশ ও দাস। নির্ব্বচনের কথা ছাড়িয়া দিলেও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের অবৈদিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রাচ্যাঃ দাসাঃ—পূর্ব্বদেশবাসিগণ দাস অর্থাৎ অবৈদিক একথা স্পষ্ট করিয়াই লিখিত আছে।

ভীমের দিগ্বিজয়, বঙ্গরাজের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ও পতন, ইহাদের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক রহস্য আছে। রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের চারিজন ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন দিকে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, ভীমের প্রতি পূর্ব্বদেশ-বিজয়ের ভার পড়ে। ভীম ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে

বহির্গত হইয়া নানাদেশ-জয়ের পর মগধদেশে গিরিব্রজে (রাজগৃহ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে কর্ণের রাজ্য অঙ্গদেশ (বর্ত্তমান দক্ষিণ বিহার) প্রাপ্ত হইয়া কর্ণকে পরাজয় করেন। তাহার পর তিনি সন্নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী রাজগণকে পরাজয় করিলেন।

"অনন্তর তিনি মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে বাহুবীর্য্য-সহকারে মহাসমরে নিহত করিলেন", তাহার পর তিনি পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, উগ্রসেন, তাম্রলিপ্ত কর্ব্বটাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন।" মোদাগিরি হইল বর্ত্তমান মুঙ্গের (মুদ্গগিরি), পুণ্ড্রদেশের সীমা এখন নির্দ্ধারণ করা কঠিন, বর্ত্তমান মালদহ জেলার সহিত ইহার সম্বন্ধ ছিল বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ভীমের দিগ্বিজয়, বলা বাহুল্য, একটি কাল্পনিক ঘটনা, পবন দেবের পুত্র ভীমসেন বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না। এযুদ্ধ ও দিগ্বিজয় বোধ হয় বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারের একটা কাল্পনিক বিবরণ। তথাপি ভীমসেন যে পথ দিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, সেই পথ দিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি পরে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না।

বাঙ্গালাদেশ তিনদিকে দুর্ভেদ্য ছিল, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে নদী ও বিস্তৃত বন, দেশকে দুইদিকে রক্ষা করিত। পশ্চিমে একটি ধনুকাকার পর্ব্বতশ্রেণী বাঙ্গালার প্রাচীর ছিল; এই পর্ব্বতশ্রেণীটি বর্ত্তমান মুঙ্গের সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে বক্রাকারে বালেশ্বরের

নিকট পিপলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই পর্ব্বতমালার উত্তরভাগে, মুঙ্গেরের দক্ষিণে, দুইটিমাত্র পথ আছে, তাহাদের নাম পরে হয় তেড়িয়া গলি আর সাকড়ি গলি; উত্তর-পশ্চিম হইতে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে হইলে এই দুইপথ দিয়া আসিতে হয়। এই দুইটি পথের বিচিত্রতা এই যে, মুষ্টিমেয়মাত্র লোক পথের মুখে দাঁড়াইলে আক্রমণকারী সহস্র সহস্র লোককে বাধা দিতে পারে। বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবার আর একটি পথ ছিল তাহা জলপথ। গঙ্গাস্রোতের সহায়ে নৌকাযানে আক্রমণকারী বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে পারিত। উপরে যে পর্ব্বতপথের কথা হইল তাহারই অনতিদূরে গঙ্গা দক্ষিণ-বাহিনী এই পর্ব্বতপথ ও গঙ্গার বাঁক রক্ষা করিতে বাঙ্গালার রাজা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন (কর্ণেল অর্‌ম্)। গৌড় পূর্ব্বে নদীর ধারে ছিল, রোমান ইতিহাসলেখক প্লীনি গৌড়ের নাম গাঙ্গিয়া রেজিয়া দিয়াছেন, প্রবাদ আছে সাতশত খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে গৌড়নগর স্থাপিত হয়।

উপরের লিখিত বাঙ্গালার রাজা সমুদ্রসেন কে? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙ্গালার রাজা সমুদ্রসেন ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন সাত্যকির হস্তে নিহত হন। পাণ্ডবদিগের পক্ষে, অর্জ্জুনকে ছাড়িয়া দিলে, সাত্যকী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠারদিন ধরিয়া হইয়াছিল; ষোড়শ দিনের যুদ্ধে সমুদ্রসেন ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেনের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি এইরূপে বর্ণিত আছে, ভীষ্ম ও দ্রোণ, দশ ও পাঁচদিন যুদ্ধ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন, কর্ণ তখন সেনাপতি, সেদিন দ্বিরথযুদ্ধ না হইয়া সঙ্কুল যুদ্ধ হইতেছিল, অর্থাৎ বিপক্ষ সৈন্যগণ একদলের সহিত আর একদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল "প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, অঙ্গ, বঙ্গ,

কলিঙ্গ, পুণ্ড্রক, মগধ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশবাসী গজযুদ্ধ-বিশারদ উৎকৃষ্ট যোধগণ পাঞ্চাল বলের প্রতি শর তোমর নারাচ বর্ষণ করিতে লাগিল।...অনন্তর সাত্যকী খরতর নারাচ দ্বারা স্বীয় সম্মুখবর্ত্তী বঙ্গরাজের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরাতলে পতিত করিলেন। বঙ্গরাজ নিজ-শরীরে প্রহার না হয় এইরূপ কৌশলে মাতঙ্গ হইতে উৎপতিত হইবার মানসে শরীর অবনত করিতেছেন এমন সময় সাত্যকী নারাচ দ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলে বঙ্গরাজ তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন।" ১২।১৩—২২ অঃ কর্ণ। শেষদিনে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে সমুদ্রসেনের পুত্র চন্দ্রসেন নিহত হন। ৫২—১২ অঃ শল্য।

বলা বাহুল্য বৃত্তান্তটি একটি রূপক। পাণ্ডবপক্ষ হইল শ্রীকৃষ্ণ-সহায়, শ্রীকৃষ্ণ বেদ, যজ্ঞ, গো, ব্রাহ্মণ-রক্ষার্থে অবতীর্ণ হন। তাহা হইলে পাণ্ডবপক্ষ হইল বৈদিক পক্ষ, আর তাহাদের বিপরীত পক্ষ হইল অবৈদিক পক্ষ, সমুদ্রসেন অবৈদিক পক্ষে ছিলেন। নাম দেখিয়া প্রথমে মনে হয়, জলবহুল বঙ্গদেশের রাজা বলিয়া তাঁহার নাম সমুদ্রসেন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালার রাজা সমুদ্রসেন "সমুদ্রদেশাধিপতি" চিত্রসেনকে সপুত্র পরাজয় করেন। সমুদ্র হইতে সমুদ্রসেন নাম হইয়াছে, সমুদ্র হইল অসুরালয়, তাহা হইলে সমুদ্রসেনের উপর অসুর অথবা অবৈদিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সাত্যকীর হস্তে নিহত হন, সাত্যকী হইলেন সাত্বতবংশীয়, সত্যের সহিত সাত্বত শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে "বেদানাম্ উপনিষৎ সত্যম্", সাত্যকীর বিশেষণ সত্যবিক্রম ; তিনি কৃষ্ণের সমবংশীয় ছিলেন। সত্য অথবা বেদের হস্তে অসুরালয়জ্ঞাপক সমুদ্রসেনের পতন হইল। সমুদ্রসেন সকল

পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের ন্যায় মতঙ্গের উপর আরূঢ় ছিলেন। মতঙ্গের এক অর্থ হস্তী, অপর পক্ষে মতঙ্গ চণ্ডালকে আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, সেই অবৈদিকতা হইল বঙ্গদেশীয় সমুদ্রসেনের বাহন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বর্ত্তমান আসাম) দেশাধিপতি ভগদত্তেরও মাতঙ্গ বাহন ছিল; তিনি "ম্লেচ্ছদেশাধিপতি" ছিলেন।

এতক্ষণ আমরা রূপক ও আখ্যায়িকার সমুদ্রসেনকে দেখিলাম; কিন্তু এই সমুদ্রসেন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তাহা বিচার করিবার বিষয়। সমুদ্রসেনের পুত্রের নাম চন্দ্রসেন, সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন এই দুইটি নাম দেখিলে আমাদের সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম মনে হয়। সেন ও গুপ্তে কি সম্বন্ধ তাহা বলা কঠিন। আমরা গ্রীক্ ভাষায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানের নাম দেখিতে পাই; তক্ষশিলা গ্রীক্ ভাষায় হইল টাক্‌শিলা, তাম্রপর্ণি (লঙ্কা) হইল টাপ্রবনি, ওক্ষু হইল অক্‌সাস্। মহাভারতে এই নদীর নাম দুইরূপে লিখিত আছে, ওক্ষু ও অংক্ষুঃ, দুই ব্যক্তির লিখিত বলিয়া দুই আকার হইয়াছে, ক্ষ হইয়াছে একৃস্, ইউ এস্ হইয়াছে উকার। গ্রীক্ ভাষায় চন্দ্রগুপ্ত শব্দ সাণ্ড্রাকোটস্ রূপধারণ করিয়াছে। চন্দ্র হইতে সাণ্ড্র হইয়াছে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়, কোটস্ গুপ্ত শব্দের গ্রীক্ রূপ কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। উপরে তক্ষশিলা ও তাম্রপর্ণী শব্দ হইতে দেখিতে পাই, সংস্কৃত ত বর্ণ গ্রীক্ ট বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। আর ওক্ষু শব্দ হইতে দেখিয়াছি ইউ এস্ সংস্কৃত উকারের গ্রীক্‌রূপ; তাহা হইলে কোটস্ শব্দ সংস্কৃত কতু অথবা কেতু শব্দের পরিবর্ত্তিত রূপ কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। সাণ্ড্রাকোটস্ যদি চন্দ্রকেতু (কতু) হয়, তাহা হইলে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়। সেন ও কেতু

শব্দ, উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা? আমরা মহাভারতে কর্ণের পুত্রের নাম বৃষসেন দেখিতে পাই, অপর অপর গ্রন্থে (যেমন দাতাকর্ণ) আমরা কর্ণের পুত্রের নাম বৃষকেতু দেখি। যদি উভয় নাম একব্যক্তির হয় তাহা হইলে সমুদ্রসেন, সমুদ্রকেতু বা সমুদ্রগুপ্ত একই নাম বলিয়া সন্দেহ হয়।

যদি সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা পঞ্চম শতাব্দীর বাঙ্গালার ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাই। ইঁহারা উভয়েই পূর্ণ বৈদিক ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালীরা যে অনেকে অবৈদিক অথবা বৌদ্ধ ছিল তাহার অন্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। পূর্ব্বে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর পূর্ব্ব অংশকে বঙ্গ বলিত, এবং পশ্চিমভাগস্থিত দেশকে গৌড় বলিত। প্রায়ই দুই ভাগ এক রাজার অধীনে থাকিত এবং গৌড় তাহাদের রাজধানী হইত। মুসলমানদিগের সময়েও মুসলমান নবাবদিগকে বাঙ্গালী পুস্তকে গৌড়েশ্বর বলিত।

পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে ফা হিয়েন্ নামে চীনদেশীয় একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক মগধ, বঙ্গ, প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা দেশ পর্য্যটন করেন। তিনি এদেশের ধর্ম্মসম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন—তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই দেশে প্রচলিত ছিল। ইয়ংচোয়াং নামে আর একজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে ভারতবর্ষে আসেন। তিনিও সে সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে এদেশের অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে শীলাদিত্য পঞ্চগৌড়ের রাজা ছিলেন। কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়,

মিথিলা, ও উৎকল অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী এবং হিমালয়ের দক্ষিণে যে বৃহৎ ভূভাগ—যাহাকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিত, তাহা এই পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল, ইহাদের সাধারণের নাম ছিল পঞ্চগৌড়। আর এক প্রকার পঞ্চগৌড় আমরা দেখিতে পাই রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা তাহার অন্তর্গত ছিল।

এখন অনুসন্ধানফলে বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। দেখা যায় ৭৩২ খৃষ্টাব্দে একজন শৈব রাজা পৌণ্ড্র জয় করেন, এবং কান্যকুব্জের রাজা হর্ষদেব বাঙ্গালাদেশ ও আর একজন কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মা মগধ জয় করেন। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বৎসরাজ বাঙ্গালা জয় করেন। এই সকল কথা হইতে বাঙ্গালাদেশের সামাজিক ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। আমরা সকলেই জানি মুসলমানদের বিজয়ের পূর্ব্বে তিনটি বংশ মগধ ও বাঙ্গালায় রাজত্ব করে, গুপ্ত, পাল ও সেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে গুপ্তবংশের পতন হয়; গুপ্ত রাজগণ নিজেরা হিন্দু ছিলেন। তাহার পর পালবংশ রাজা হয়, ৭৮২ খৃঃ অব্দে জয়ন্ত আদিশূর বঙ্গের বৌদ্ধ রাজাকে জয় করেন। "রামপাল দেব বলিয়া একজন পাল রাজা ভীম নামে একজন কৈবর্ত্তকে জয় করিয়া নিজ পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন"। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বল্লাল সেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা; ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা হন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়ে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালা আক্রমণ করে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে বাঙ্গলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জ্ঞান হয় না। আমরা প্রায় পাঁচ ছয়

শত বৎসরের কথা দেখিতেছি ; এ দীর্ঘ সময়ে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি স্থানের কি সীমা ছিল, পরস্পরের সহিতই বা কি সম্বন্ধ ছিল, সামন্তরাজগণের আপনাদিগের মধ্যে ও দেশের রাজার সহিত কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, দেশের শাসনপ্রণালীই বা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা কোন সংবাদ পাই না। আমাদের আলোচ্য বিষয় বুঝিতে এসকল সংবাদের বিশেষ প্রয়োজনও নাই।

সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে চীন পরিব্রাজক ইয়ংচোয়াং এদেশে আসেন, আর ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে মুসলমানেরা বাঙ্গালা আক্রমণ করে ; এই ছয়শত বৎসর বাঙ্গালাদেশে যাহারা বাস করিত তাহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল ? আমরা ইংরেজি ও মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, এই দুই জাতি হিন্দুদিগকে জয় করে ; কথাটি কতদূর সত্য তাহা আলোচনার বিষয়। যখন বখ্তিয়ার খিলিজী মগধ (বিহার) ও বাঙ্গালা আক্রমণ করেন তখন মগধ ও বাঙ্গালার লোকেরা কি ধর্ম্ম অনুসরণ করিত ? প্রশ্নটি কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার সামগ্রী নয়। সকল দেশেরই সামাজিক অবস্থার সহিত সেই দেশের রাজনীতির অবস্থা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ প্রশ্ন সাত-শত বৎসর পরে আজিও সমভাবে চিন্তা করিবার সামগ্রী রহিয়াছে।

যখন ইয়ংচোয়াং (হাউয়ং সেঙ্) বাঙ্গালাদেশ পর্য্যটন করেন, তখন তিনি সেই দেশে একাদশ সহস্র পাঁচ শত বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া-ছিলেন, যে যে স্থানে তিনি গিয়াছিলেন, সকল স্থানেই হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধমঠ, উভয়ই দেখিয়াছিলেন, এই হইল সপ্তম শতাব্দীর কথা, অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুরাজা জয়ন্ত আদিশূর বাঙ্গালার বৌদ্ধ-রাজাকে জয় করেন, আদিশূর শব্দ একটি বংশগত উপাধি, ব্যক্তি

বিশেষের নাম নয়। প্রবাদ আছে, ঐ উপাধিধারী একজন আদিশূর পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় লইয়া আসেন। তাহা হইলে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। তখনও বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে বেদ ও যজ্ঞ অদৃশ্য হইয়াছিল। ঐ শতাব্দীতে (৭৩২ খৃষ্টাব্দ) একজন শৈব রাজা পৌণ্ড্রদেশ জয় করে, সে সময়কার শৈবধর্ম্ম কি পরিমাণে বৈদিকধর্ম্ম ছিল তাহা নিরূপণ করা অতি কঠিন। তথাপি আমরা স্থির করিতে পারি, যে, বাঙ্গালাদেশ অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিল, এবং সেই সময় হইতে বাঙ্গালীদের পুনরায় বৈদিকধর্ম্মের সহিত পরিচয় হয়। গুপ্তরাজগণের পরে পালেরা বাঙ্গালার রাজা হন। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যে বিশেষ বিস্তার হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপাল বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। আদিশূর ও বল্লালসেন উহাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে উভয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিল। বল্লালসেনকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিত, এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ স্থির করা কঠিন। শাস্ত্রের অনুশাসন-অনুসারে সকল বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় এ কথা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় মিশ্রিত বৈদিক। ব্রহ্মাশব্দের অর্থ বেদ ও ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দ হইতে মনে হয় যেন মিশ্রিত বৈদিকধর্ম্ম পুনরায় বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম্মে পরিণত হইতেছে।

রাজা বল্লালসেনের সময়ে বাঙ্গালাদেশে তান্ত্রিক মত (অর্থাৎ বিকৃত বৌদ্ধমত) বিশেষ প্রবল ছিল, স্বয়ং বল্লালসেন এই মতে

দীক্ষিত হন। বৈদিক ও তান্ত্রিক মত এই উভয়ের সামঞ্জস্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কেহ কেহ মনে করেন এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত করিতে উদ্‌যোগী হন। রাজা বল্লালসেনই বাঙ্গালার প্রকৃত হিন্দুসমাজসংস্কারের আদি কর্ত্তা। আদিশূর যে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন দুই শত বৎসরে তাহাদের নিষ্ঠা ও নীতির অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে যে ব্রাহ্মণ ছিল তাহাদের সহিত নবাগত ব্রাহ্মণেরা কোনরূপ সম্পর্ক রাখে নাই। এমন কি, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিল কিনা সন্দেহ। তথাপি তিন শত বৎসরের মধ্যে এই নবাগত ব্রাহ্মণ-দিগের এইরূপ অবনতি হইয়াছিল যে, রাজা বল্লালসেন তাহাদিগকে বিশুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল ব্রাহ্মণদের নিমিত্ত নিয়ম-স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না, তিনি হিন্দুদিগের কায়স্থ বিভাগেও সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে ব্রাহ্মণেরা তখন হিন্দুসমাজের শিক্ষক ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া রাজা বল্লালসেনের চেষ্টা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগেরই মধ্যে হইয়া-ছিল। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রচলিত করিয়াছিলেন সে মর্য্যাদা ব্যক্তিগত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনের সময় কৌলীন্য বংশগত হইল। বাঙ্গালাদেশের যে ভাগে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত হয় তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। রাজা বল্লালসেন প্রথমে বাঙ্গালাদেশকে রাঢ়, বাগ্‌ড়ি, বরেন্দ্র প্রভৃতি পাঁচ অংশে বিভক্ত করেন, এখনও বাঙ্গালাদেশের পূর্ব্বভাগে যেমন ময়মনসিংহ জেলাতে অনেক ব্রাহ্মণ

আছেন যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বল্লালসেন-স্থাপিত কৌলীন্যমর্য্যাদার অন্তর্গত ছিলেন না।

অষ্টম শতাব্দীর শেষে বাঙ্গালাদেশে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আসেন। দ্বাদশ শতাব্দীর আরম্ভে ঐ ব্রাহ্মণদের এরূপ অধঃপতন হয় যে তাহাদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিশুদ্ধ করিতে দেশের রাজাকে নিয়ম স্থাপন করিতে হইয়াছিল। তাহার পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত না হইতেই মুসলমানেরা গৌড় জয় করে। বল্লালসেনের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

মুসলমানদিগের আক্রমণের সময়, বাঙ্গালীদিগের কি ধর্ম্ম ছিল? মুসলমানেরা বাঙ্গালীদিগকে হিন্দু বলিত, এ হিন্দু শব্দের অর্থ কি? এসময়কার বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, কিন্তু অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের অমূল্য গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস বুঝিবার প্রধান সহায়, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনকে বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাস-লেখক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পূর্ব্বকার সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের অবস্থা বোধ হয় অতিশয় হীন হইয়াছিল।

"পাঁচ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই
এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই"

এ কথাটি কোন সময়কে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আদিশূরের আনীত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চগোত্রে বিভক্ত ছিল। ইহাই যদি পাঁচ গোত্র হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের বংশধরগণ এক সময়ে ছাপ্পান্নখানি গ্রামে বাস

করিতেন। মানভূম জেলা লইয়া এখন বাঙ্গালাদেশে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার গ্রাম আছে। যদি ধরিয়া লই, যে সময়কার কথা বলিতেছি সেই সময়ে, এখন যে স্থানে দশখানি গ্রাম আছে তখন সে স্থানে একখানি গ্রাম ছিল, তাহা হইলে সে সময় বাঙ্গালার গ্রাম-সংখ্যা বার হাজার ছিল; এই বার হাজার গ্রামের সংখ্যামধ্যে কেবল ছাপ্পান্নখানি গ্রামে ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন অর্থাৎ এমন সময় ছিল যে বাঙ্গালাদেশে দুই শত খানি গ্রামের মধ্যে একখানি মাত্র গ্রামে ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। উপরের প্রবাদটির এইরূপ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের বংশধরদিগের সংখ্যা মুসলমানদের আক্রমণসময় অতিশয় অল্প ছিল। তখন দেশের সাধারণ লোক, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই; বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্মে বিরোধ ফলে দেশমধ্যে অগণিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বিকৃত বৌদ্ধ ও বিকৃত বৈদিক ভাব লইয়া এ সকল সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে ভারতবর্ষে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহাদের মধ্যে এই দুই ভাবের মিশ্রণ আজও দেখা না যায়। আটশত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের লোক বিকৃত বৌদ্ধ ও বিকৃত বৈদিক ধর্ম্মের সংমিশ্রণে উৎপন্ন নানাপ্রকার ধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিল। আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণদের দেশে আসিবার ফলে জনসাধারণের প্রচলিত ধর্ম্মের যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা বলিয়া মনে হয় না। পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন; আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণদের বংশধরগণ দেশস্থ লোকের সংঘর্ষে আসিয়া একান্ত কলুষিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। দেশের লোকের মধ্যে অনেক দুরাচার দেখা যাইত, সেই

সকল দুরাচার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। বল্লালসেন যে নীতি অবলম্বন করিয়া কৌলীন্যপ্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই নীতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি ইহার নাম ছিল সংবিভাগ ; গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে যাহারা উপযুক্ত পাত্র তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার পদ্ধতি বোধ হয় বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সংবিভাগ-প্রথার ফলে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হয়। বল্লাল সেনও গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি গুণসম্বন্ধে সদাচারকে প্রধান স্থান প্রদান করেন।

বল্লালসেনের সময়ে বাঙ্গালাদেশে যে কি ধর্ম্ম ছিল ও কত প্রকার সম্প্রদায় ছিল, তাহা বলা অসম্ভব। সপ্তম শতাব্দীতে ইয়ংচোয়াং (হাওএন্ সেঙ্) বাঙ্গালাদেশে দেবপূজা ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ উভয় দেখিয়াছিলেন, পাঁচশত বৎসরে এই উভয় ধর্ম্মই বিকৃতভাব-প্রাপ্ত হইয়াছিল ; এই বিকৃত ভাবাপন্ন অগণিত সঙ্কর ধর্ম্ম বল্লালসেনের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল। চণ্ডী ডাকিনী দেবতা ছিল, বৌদ্ধদিগের মন্দিরের হারীতি দেবী বাঙ্গালার শীতলা ঠাকুরাণী হইলেন। ডোম পুরোহিতগণ হারীতির পূজক ছিলেন। বাঙ্গালার নাথসম্প্রদায় এক সময় প্রবল ছিল ; নাথধর্ম্মে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মের মিশ্রিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; এই সম্প্রদায়ের মীননাথ দশম শতাব্দীর লোক, গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর লোক, ইনি যোগী ছিলেন, কলিকাতার কালীঘাটের মন্দির অনেকের মতে গোরক্ষনাথকর্ত্তৃক স্থাপিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রাদির প্রচলন বহুলপরিমাণে ছিল, কোন কোন মতে, শিবঠাকুর ষোল শ গোপিনী লইয়া বিহার করিতেন। ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের

বিকৃত রূপ ; ডোম, কাপালী ও হাড়ী ইহারা ধর্ম্মপূজা করিত। ধর্ম্ম-পূজার মন্দিরে হারীতি দেবীর (শীতলা দেবীর) মূর্ত্তি থাকিত ; ইহার পূজারীগণ ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত। দশম শতাব্দীতে ধর্ম্মপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। আমরা শিবের সঙ্গে বাগ্‌দিনী রূপিণী ভগবতীকে দেখিতে পাই ; (শিবগীত)। বৌদ্ধ জাতকের বর্ণনায় দশরথের রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র ও সীতা নামে এক কন্যা ছিল ; শেষে রাম সীতাকে বিবাহ করেন। নবম শতাব্দীতে রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা বিশাল দেব তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম শুনাইয়া পুনরায় হিন্দু করেন। তখন গ্রাম্য দেবতার নাম ছিল থুয়া ভাদালী, ধাতা, কাতা ইত্যাদি। গ্রাম্য দেবতাগণ টোকা মাথায় দিয়া হাতে কাস্তে করিয়া ধান কাটিত, মনসা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ ইহারা সকলেই বৌদ্ধদিগের হইতে গৃহীত।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাৎকালিক বাঙ্গালাসাহিত্যে তাহা-দের প্রমাণ পাওয়া যায়। “বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় এদেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি দ্বারা সমাজ একান্তরূপে শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যেসকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নীতি ও ধর্ম্ম-বিধ্বংসী। এই সময়ে ভৈরবী চক্র প্রভৃতির দ্বারা পুরুষ ও রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপে স্খলিত হইয়াছিল ; অপর পক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যা-খাদ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাহারা গলিত শবের মাংস, মল মূত্রাদি পর্য্যন্ত কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ভক্ষণ করিত। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই প্রকার তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া সমাজকে

বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সর্ব্ব বিষয়েই এতদ্‌রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ব্যভিচারের সংশোধনার্থ যে সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হইল, তাহাতে আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। হিন্দুসমাজে, এখন খাদ্যাখাদ্যের যে আঁটাআঁটি ও নিত্য নৈমিত্তিক নিয়মের প্রতি যে একাগ্রনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধযুগের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিক্রিয়া। এখন আচার অনেকটা প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এক সময়ে শিথিল সমাজে শৃঙ্খলাস্থাপন জন্য আচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যা, যশ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের অগ্রে বল্লালসেন এই আচারের স্থান দিয়াছিলেন"। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

মুসলমান-আক্রমণের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দেশে কি ভাবে ছিল ও দেশমধ্যে ইহার প্রতিপত্তিই বা কতদূর ছিল, তাহা উপরে লিখিত কথাগুলি হইতে কিছু অনুমান করা যায়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে দেশের জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিতেন। দেশের লোককে ধর্ম্ম-শিক্ষা বা অপর কোনরূপ শিক্ষা প্রদান করা তাঁহারা পাপ বিবেচনা করিতেন। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ ছিলেন। বল্লালসেন নিজে বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিলেন; কিন্তু একজনের চেষ্টায় যে অব্রাহ্মণ দেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রসার হইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। নব সংস্কৃত ব্রাহ্মণগণ বোধ হয় রাজসভাতে এবং যে স্থানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ভূঞারাজা থাকিত সেই স্থানে বাস করিতেন ও তাঁহাদের প্রভাব সেই স্থানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ, বিকৃত বৌদ্ধ, বিকৃত হিন্দু, সঙ্কর, বৌদ্ধ—হিন্দুরা বাস করিত। যখন মুসলমানগণ বাঙ্গালা আক্রমণ করে তখন ব্রাহ্মণ্য-

ধর্ম্মাবলম্বী লক্ষ্মণসেন তাঁহার ব্রাহ্মণ সভাসদ্ লইয়া দেশের রাজা ছিলেন। অব্রাহ্মণ দেশের লোক এইরূপ রাজাকে যে সাহায্য করিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তখন মনে রাখিতে হইবে স্মৃতিযুগ পাঁচ-শত বৎসর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সেই যুগে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ শূদ্র-দিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের শাসন পাঁচশত বৎসর চলিয়া আসিতেছে। আমরা শূন্যপুরাণে দেখিতে পাই, যখন বাঙ্গালাদেশে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের দেবমন্দির বিনষ্ট করিতেছে, তখন বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগকে উপহাস করিতেছে। মুষ্টিমেয় মাত্র মুসলমান সেনা লইয়া বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয় অসত্য হইলেও অসম্ভব নহে। মুসল-মানেরা বাঙ্গালার হিন্দুরাজাকে পরাজয় করিয়াছিল, বাঙ্গালাদেশের লোক তখন হিন্দু ছিল না—শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের চক্ষে তাহারা এখনও হিন্দু নয়? আমরা এই কথাটি ভুলিয়া যাই। মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে এবং ইংরেজলিখিত ইতিহাসে আমরা পড়ি, যে, এই দুইজাতি হিন্দুদিগকে জয় করিয়াছে। আমরাও তাই শিখিয়াছি, এই ভুল শিক্ষার নিমিত্ত আমাদের মন মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে, সেই মোহের ফলে আমরা নিজেদের দেশের ইতিহাসসম্বন্ধে প্রকৃত হইতে অলীক বুঝিতে পারি না। আর বুঝিতে পারি না বলিয়া দেশসম্বন্ধে কি করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। এখানে আমরা অর্থে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী; শাস্ত্রব্যবসায়ী অথবা ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের মনে এই সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচ নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেতরগণ যেরূপ শূদ্র ও পৃথক্ ছিল তাহাদের চক্ষে এখনও তাহারা সেইরূপ আছে। ইহাদিগের সহিত হিন্দুনামে এক বেষ্টনী-ভুক্ত হইতে তাঁহারা কখনও সম্মত হইবেন না। তখনও তাহারা ছিল

ইতর অর্থাৎ পৃথক্, আজ সাতশত বৎসর পরেও তাহারা ইতর ও পৃথক্।

মুসলমান-অধিকার। (১)

ছয়শত বত্রিশ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরবগণ, নিকট ও দূরস্থ দেশবাসী-দিগকে জয় করিতে ও স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করে। তাহারা একে একে প্যালেস্‌টাইন্, সিরিয়া, ইজিপ্ট্, মরক্কো, সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা জয় করিয়া পশ্চিমে এট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের তটে উপস্থিত হয়। এসকল দেশ তাহারা জয় করিয়াছিল, এবং দেশবাসী-দিগকে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্পেন্‌দেশে তখন খৃষ্টান্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তুইদল খৃষ্টানের মধ্যে বিবাদ হয়, তাহাদের মধ্যে একদল অপরদলকে পরাজয় করিবার মানসে সমুদ্রপারস্থিত আরবগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। আরবেরা স্বীকৃত হইল, এবং এ অবস্থায় সর্ব্বস্থানে যাহা ঘটে তাহাই ঘটিল ; আরবগণ স্পেন্-দেশে সাহায্য করিবার সূত্রে প্রবেশ করিয়া সেই দেশ জয় করিল। তিন বৎসরমধ্যে সমস্ত স্পেন্ মুর (আরব) দিগের অধীন হইল। বিজয়ী মূরগণ পিরেনিজ্ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্সদেশে প্রবেশ করিল। তথায় পয়টিয়ার্স্ ক্ষেত্রে ফ্রান্সদেশের অধিপতি চার্লস মার্টেল তাহাদের গতিরোধ করে, মূরগণ স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই হইল পশ্চিম ও উত্তর দেশের কথা। পূর্ব্বদিকে আরবগণ ছয়শত পঁয়ত্রিশ খৃষ্টাব্দে কাজিসিয়া ক্ষেত্রে পারস্য সৈন্য পরাজয় করে, এবং তাহার পর পারস্য দেশ জয় করে। প্রবাদ আছে আরবগণ তিন দিনে পারসিকদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিল।

আরব দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইজিপ্ট্ প্রভৃতি সমস্ত উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেন্ দেশ জয় করিতে আরবদিগের পঁচাত্তর বৎসরের অধিক লাগে নাই। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবগণ আফ্-গানিস্থান্ জয় করে, এবং সেই দেশের লোকদিগকে মুসলমান করে। মুসলমানদিগের এই সকল দেশ জয় করিতে বিশেষ সময় লাগে নাই ও কষ্টও ভোগ করিতে হয় নাই। ইহা একটি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পরে দিল্লীর পতন হয় এবং মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে। সপ্তম শতাব্দী যদি স্মৃতিযুগের আরম্ভ ধরা যায়, তাহা হইলে স্মৃতিযুগ-প্রবর্ত্তনের ছয়শত বৎসর পরে হিন্দুরা মুসলমান-দিগের দাস হইল।

মুসলমানকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ-আক্রমণের এবং ভারতবর্ষ-বিজয়ের যাহা কিছু ইতিহাস আছে, তাহা মুসলমান লেখকগণকর্ত্তৃক লিখিত। সত্যসম্বন্ধে তাহাদের কিরূপ মূল্য আছে তাহা অবধারণ করা কঠিন, তবে এ কথা সত্য যে, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করে, আর হিন্দু-দিগের এ সম্বন্ধে কোন রূপ লিখিত ইতিহাস নাই। সুতরাং মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ যাহা লিখিয়াছেন তাহাই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলমান ইতিহাসলেখকদিগের ভারতজয়-সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা হইতে আমরা অবগত হই যে, সবুক্তজিন নামে একজন ঘজনি দেশের অধিপতি ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করেন। জয়পাল বলিয়া একজন ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা সেই দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্ব্বত, পূর্ব্বে লাহোর, উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে

মূলতান। এই আক্রমণের ফলে পেশোয়ার মুসলমানদিগের অধিকারে আসে। তাঁহার পুত্র মামুদ ১০০৪ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং পুনরায় জয়পালকে পরাজিত করেন। দাউদ খাঁ নামে এক ব্যক্তি মূলতানের অধিপতি ছিলেন, মামুদ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া মূলতান অধিকার করেন। লিখিত আছে যে, দাউদখাঁ মুসলমান হইলেও সম্পূর্ণ মুসলমান ছিলেন না, মামুদ তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। মামুদ পুনরায় ১০০৮ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার আক্রমণ করেন, এবারও জয়পালের পুত্র আনন্দপালকে পরাজয় করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১০১১ সালে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এবার থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া পূর্ব্ববারের ন্যায় অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত নিজ দেশে ফিরিয়া যান। ১০১৪ সালেও মামুদ্ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এবার তিনি আনন্দপালের পুত্র পৃথিরাও জয়পালকে পরাজয় করেন। ১০১৫ সালে মামুদ কাশ্মীর আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ১০১৮ সালে তিনি পুনরায় কাশ্মীর আক্রমণ করেন, সে দেশের রাজা কোরা মামুদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এবার তিনি মথুরাপর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, এবং যাইবার সময় প্রভূত অর্থ মণিমাণিক্য ও হিন্দু দাসদাসী লইয়া স্বদেশে গমন করেন। ১০২১ সালে মামুদ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তিনি পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া যমুনাতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তথায় হিন্দু রাজন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ বলেন যে, হিন্দুরা যুদ্ধ না করিয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করিল এবং মামুদও চিন্তা

করিলেন যে তিনি স্বদেশ হইতে অনেক দূরে আসিয়াছেন, এই চিন্তার ফলে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। ১০২২ সালে তিনি পুনরায় কাশ্মীর আক্রমণ করেন; এবারও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বিফল-মনোরথ হন। এই অভিযানে তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং পাঞ্জাব জয় করিয়া লাহোরে একজন প্রতিনিধি রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যান। পর বৎসর তিনি পুনরায় কালিঞ্জরের রাজা নন্দের বিপক্ষে অভিযান করেন; তথায় তিনি হিন্দুদিগের রচিত দুর্গের সম্মুখে পৌছেন। মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে হিন্দুরা তাঁহাকে অনেক অর্থ ও তিন শত হস্তী প্রদান করে, এই লইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। তাহার পর বৎসর তিনি গুজরাট্ আক্রমণ করিয়া তথায় সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন। স্বদেশে ফিরিবার সময় হিন্দুরা তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তিনি অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া ঘজ্‌নিতে ফিরিয়া যান। জাঠগণ প্রধানতঃ তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, এই নিমিত্ত পর বৎসর তিনি পুনরায় জাঠদিগকে আক্রমণ করেন। এবার তিনি অনেক লুণ্ঠিত সামগ্রী ও দাসদাসী লইয়া গিয়াছিলেন, ১০২৮ সালে মামুদের মৃত্যু হয়।

মামুদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই; তাঁহার মামুদ্ নামে আর একপুত্র ১০৩৩ সালে কাশ্মীর আক্রমণ করেন এবং সরস্বতী প্রদেশের রাজাকে পরাজয় করেন। তিনি ফিরিবার পথে নিজপুত্রকে লাহোরের অধিপতি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১০৪৩ খৃঃ দিল্লীর অধিপতি পাঞ্জাবের হিন্দু রাজগণের সহিত মিলিয়া থানেশ্বর, নগরকোট, থান্সী প্রভৃতি যে সকল স্থান মুসলমানগণ অধিকার করিয়াছিল, সে সকল স্থান হইতে মুসলমান-

দিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন। সিন্ধু নদীর পূর্ব্বে লাহোর ব্যতীত মুসলমানগণের আর কোন অধিকৃত স্থান রহিল না। ১০৭৯ সালে ঘজনির সুলতান এব্রাহীম পুনর্ব্বার ভারত-বর্ষে সসৈন্যে প্রবেশ করেন এবং অনেক লুণ্ঠিত সামগ্রী ও দাসদাসী লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১১৭৬ সালে মহম্মদ ঘোরী মুলতান আক্রমণ ও জয় করেন, তাহার পর বৎসরে তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন। তথায় রাজা ভীমদেবের হস্তে পরাজিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পেশোয়ার আক্রমণ করেন এবং কাশ্মীর জয় করেন। ঘজনিবংশীয় খসরু নামে একজন মুসলমান লাহোরের অধিপতি ছিলেন, মহম্মদ ঘোরী ১১৮০ সালে তাঁহাকে পরাজয় করেন, ১১৯১ খৃষ্টাব্দে সরস্বতীনদী-তীরে থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ এবং দিল্লী হইতে ৪০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত স্থানে হিন্দুদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর রাজা চন্দরায় কর্ত্তৃক আহত হইয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মুসলমানেরা রণে ভঙ্গ দেয়; এবং হিন্দুরা বিশক্রোশ পথ পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুধাবন করে। মহম্মদ ঘোরী পর বৎসর একটি বৃহৎ সেনা লইয়া পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; এবারও হিন্দুরা পূর্ব্ব রণস্থল সরস্বতীতীরে সমবেত হয়, উভয় সৈন্যমধ্যে সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছিল। উভয়পক্ষই সন্ধি স্থাপন করিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু রজনীযোগে মহম্মদ ঘোরী নদী পার হইয়া হিন্দু-দিগকে আক্রমণ করেন। এই অকস্মাৎ আক্রমণের নিমিত্ত হিন্দুরা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তাহারা সত্বরই দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের উপর পতিত হয়। মহম্মদ ঘোরী যেন রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছেন

এইরূপ অভিনয় করিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। হিন্দুরাও তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হয়, তাহার ফলে তাহাদের দল ভঙ্গ হয়। মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুদিগকে আক্রমণ করেন, এবং হিন্দু সৈন্য বিধ্বস্ত করেন। দিল্লীর রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন, ও আজমীঢ়ের রাজা পৃথুরায় বন্দী হন, মুসলমানেরা পরে তাঁহার প্রাণনাশ করে। মহম্মদ ঘোরী তাহার পর আজমীঢ় আক্রমণ করেন এবং বিপুল অর্থ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। যাইবার সময় তিনি তাঁহার সেনাপতি কুতবকে খোরম্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া যান। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে কুতব দিল্লী অধিকার করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার সেনাপতি বেনারসের অধিপতি রাজা জয়চাঁদকে পরাজয় করেন। পরে মহম্মদ ঘোরী কাশী জয় ও লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। এই সময়ে আজমীঢ়-অধিপতি পৃথুরায়ের হিমরাজ নামে একজন নিকটসম্পর্কীয়, পৃথুরাজ-পুত্রের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, রাজপুত্র মুসলমানের সেনাপতি কুতবের শরণাগত হন এবং তাঁহার সাহায্যে ও আশ্রয়ে পিতৃরাজ্যে পুনঃস্থাপিত হন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী স্বদেশে একজন মুসলমানকর্ত্তৃক নিহত হন। কুতবউদ্দীন এতদিন মহম্মদের অধীনে মুসলমান-অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লী-অধিকারের পর হইতেই কুতব প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

যখন মহম্মদ ঘোরী ও তাঁহার সেনাপতি কুতব এটোয়া, আলিগড়, বেনারস প্রভৃতি স্থান জয় করিতেছিলেন, তখন মহম্মদ বখ্‌তিয়াঁর খিলিজী বলিয়া ঘোরদেশ-নিবাসী মুসলমান সৈন্যমধ্যে একজন সেনানী

ছিলেন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি বিহার জয় করিতে নিযুক্ত হন। বিহারের অধিপতি বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণসেনের ন্যায়, যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করেন এবং দুইশত মুসলমান সৈন্য বিহার জয় করে। বিহারজয়ের পর মুসলমানেরা বখ্‌তিয়ার খিলিজীর অধীনে বাঙ্গালা-দেশ আক্রমণ ও জয় করে। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী সরস্বতী নদীতীরে দিল্লীর ও আজমীঢ়ের অধিপতিদিগকে পরাজয় করেন, সেই সালে কুতবউদ্দিন দিল্লী জয় করেন, ১২০৪ সালে মুসলমানেরা বাঙ্গালা আক্রমণ করে; এই বার বৎসরে উত্তর-ভারতবর্ষ মুসলমানগণের অধীন হয়। মুসলমানগণকর্ত্তৃক ভারতবর্ষজয়ের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হইল তাহা মুসলমান লেখকগণকর্ত্তৃক লিখিত, এতদূর সময়ে ইহার তথ্যাতথ্য-নিশ্চয় চেষ্টা বৃথা। কিন্তু সে সময়ে হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল, এবং এখনই বা কি পরিমাণে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা একান্ত নিষ্ফল হইবে না।

আমরা মহাভারতে গান্ধার শব্দ অনেক স্থানে দেখিতে পাই; এই গান্ধার যে বর্ত্তমান অফ্‌গানিস্থানের এক অংশ তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা গান্ধারদেশীয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই; কর্ণ গান্ধার দেশ জয় করিলেন তাহাও দেখিতে পাই, আরও দেখিতে পাই মহাদেবের একনাম গান্ধার। এই শেষোক্ত গান্ধার শব্দের গান্ধার দেশের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না; তবে ইহা সত্য যে, গান্ধার দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। ইহা নিশ্চয় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভপর্য্যন্ত বর্ত্তমান বেলুচিস্থান হিন্দু ছিল। বর্ত্তমান

কাবুলের (কপিশা) বিশ ক্রোশ পশ্চিমে বামীয়াননামক স্থানে পর্ব্বত-গাত্রে বুদ্ধদেবের এক মূর্ত্তি খোদিত আছে। বুদ্ধদেবের যতগুলি খোদিত মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে বামীয়ানস্থিত মূর্ত্তি সর্ব্ববৃহৎ। এই মূর্ত্তি নিশ্চয় বৌদ্ধযুগে খোদিত হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আফ্গানিস্থান এক সময়ে বৌদ্ধ ছিল, পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারত-বর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সেই দেশে পুনরায় অভ্যুত্থিত হয়। আরবগণ সপ্তম শতাব্দীতেই আফ্গানিস্থান্ আক্রমণ করে, কিন্তু আফ্গানেরা কবে মুসলমান হইল তাহা স্থির বলা কঠিন। আমরা উপরের দাউদ খাঁর কথা হইতে দেখিতে পাই যে তিনি মুসলমানও ছিলেন অথচ মুসলমানও ছিলেন না। ইহা একাদশ শতাব্দীর কথা।

ঘজ্নির অধিপতি মামুদ্ যে হিন্দুরাজার সহিত যুদ্ধ করেন তাঁহাকে মুসলমান ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তাঁহার উপাধি ছিল পাল; সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ পালবংশীয়েরা রাজা ছিলেন। যাঁহার সহিত ঘজ্নির সুলতান যুদ্ধ করেন, তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা বোধ হয় না, খুব সম্ভব তিনিও বৌদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার রাজত্ব বর্ত্তমান আফ্গানিস্থানের এক বৃহৎ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উপরের কথাগুলি একত্রিত করিলে মনে হয়, যে আফগানিস্থান-বাসী লোকদিগের ধর্ম্মের অবস্থা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। প্রথমে ভারতবর্ষের ন্যায় ঐদেশে একসময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার পর পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। আফগনিস্থানের পশ্চিম অংশে আরবেরা মুসলমান

ধর্ম্ম আনয়ন করে ; দশম ও একাদশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত বোধ হয় দেশে এই সকল ধর্ম্মই সংস্কৃত বা সঙ্কর-রূপে প্রচলিত ছিল। ঘজ্‌নির স্থলতান মামুদ একজন বিশিষ্ট মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ছিলেন, বোধ হয় সে সময়ের কিছু পূর্ব্বে আফ্‌গানগণ প্রকৃতরূপে মুসলমান হয়। এখনও আফ্‌গানিস্থানের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে অনেক হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল কারণে বাঙ্গালাদেশ এখন ধীরে ধীরে মুসলমান হইতেছে সেই সকল কারণে বোধ হয় আফ্‌গানিস্থান মুসলমান হইয়াছিল। মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল ও ১১৯২ সালে দিল্লীর পতন হয়। ঘজ্‌নির স্থলতান মামুদ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং যদি মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়, প্রতি বারই হিন্দুদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় করেন। কিন্তু এরূপ পরাজয়-ফলেও মুসলমানেরা ভারতবর্ষের কোন অংশই চিরস্থায়িরূপে অধিকার করিতে পারে নাই। পরন্তু ১০৪৩ সালে মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে যে সকল স্থান অধিকৃত ছিল, লাহোর ব্যতীত সকল স্থান হইতেই বিতাড়িত হয়। স্থলতান মামুদ ১০২১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সসৈন্যে শেষ অভিযান করেন। মহম্মদ ঘোরী ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বিতাড়িত হইবার পর, ১১৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসল-মানদিগের ভারতবর্ষজয়ের কথা বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। সবুক্তজিন কর্ত্তৃক প্রথম আক্রমণের তুইশত বৎসর পরে দিল্লীর সিংহাসন মুসলমানেরা অধিকার করে। এই ১০২১ হইত ১১৭৬ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ এই ১৫৫ বৎসর মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই ; করিলেও বিশেষ সফল হয় নাই,

ইহার কারণ চিন্তা করিবার বিষয়। মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের কথায় মনে হয় ঘজ্‌নির সুলতান মামুদ সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দুরাজাদিগকে পরাজয় করিতেন, দেশ লুণ্ঠন করিতেন, অপরিমিত ধন রত্ন ও অগণিত হিন্দু দাস দাসী লইয়া স্বদেশে যাইতেন। তাঁহার অভিযানের বৃত্তান্ত পড়িলে মনে হয় হিন্দুদিগকে যুদ্ধে জয় করা মুসলমানদিগের পক্ষে ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা কি কারণে এইরূপ সহজসাধ্য দিগ্‌বিজয় একশত পঞ্চান্ন বৎসরের নিমিত্ত এক-প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকগণের পক্ষে চিন্তা করিবার বিষয়। বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, এবং যদি মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, প্রতি-বারই হিন্দুদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশই নিজ অধীন করিতে পারেন নাই ; আর, একশত পঞ্চান্ন বৎসর পরেই মহম্মদ ঘোরী ও তাঁহার সেনাপতিগণ বার বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ জয় করেন এবং অধিকার করেন, কেন এরূপ হইয়াছিল সে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশের নরম্যাণ্ডি প্রদেশস্থ উইলিয়ম্ ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। সেন্‌ল্যাক্ নামক স্থানে ইংলণ্ডের নরপতি হেরল্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইংলণ্ডবাসীরা পরাজিত হয়, এই একমাত্র পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ডবাসীরা নরম্যান-দিগের অধীন হয়। তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা পুনর্লাভের জন্য আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে নাই। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজত্ব-স্থাপন করিতে প্রথমেই বা কেন এত বিলম্ব হইয়াছিল, আর শেষেই

বা কেন তাহারা এত অল্প সময়ের মধ্যে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ নিজেদের অধীনে আনিতে পারিল ?

ইহার অনুরূপ ঘটনা ভারতবর্ষে আর একবার হইয়াছিল ; ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় জেম্‌স্ ভারতবর্ষের সম্রাটের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ইংরেজরাজ সুসজ্জিত রণতরী, সৈন্য ও কামান ভারতবর্ষ-আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন। তখন বোম্বাই, মান্দ্রাজ, হুগ্‌লি, বালেশ্বর, কাশীমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদিগের ব্যবসার আড্ডা ছিল, প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলে। কিন্তু ইহার ফল ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক হয় নাই। সকল স্থানেই তাহাদের পরাজয় হয় এবং তাহারা তাহাদের অধিকৃত সকল বাণিজ্যের আড্ডা হইতে বিতাড়িত হয়। সাত বৎসর যুদ্ধের পর তাহারা ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে, এবং তাঁহার আজ্ঞায় পূর্ব্বে যে যে স্থানে বাণিজ্য করিত পুনরায় সেই সেই স্থানে আড্ডা করিতে অনুমতি পায়। ইহার সত্তর বৎসর পরে পলাসীক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে ইংরেজেরা বাঙ্গালার অধীশ্বর হয়। যখন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজা যুদ্ধঘোষণা করেন তখন আরংজেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল হইলেও মোগলদের তখনও যথেষ্ট শক্তি ছিল। সেই শক্তির ফলে ইংরেজদিগকে পরাজিত করিতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। ১৭০৭ সালে সম্রাট্ আরংজেবের মৃত্যু হয় ; তাঁহার মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ এবং বহিঃশত্রু-দিগের আক্রমণফলে মুসলমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। সেই অবস্থায় একপ্রকার যাচিত হইয়া ইংরেজগণ বাঙ্গালাদেশের রাজা হয়।

যখন ঘজ্‌নির সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেন তখনও হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্ববল একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। তাহার ফলে সুলতান মামুদ বার বার দেশ লুণ্ঠন করিলেও দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেশে বৈদিক অবৈদিকদিগের বিরোধ চলিতেছিল, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে অবৈদিকদিগের পরাজয় হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ অভ্যুত্থান হয় ও তাহার ফলে স্মৃতিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই স্মৃতিযুগের শাসনকালে হিন্দুদিগের জীবনী শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। দশম একাদশ শতাব্দীতে সেই শক্তি একেবারে লোপ পায় নাই, তবে জাতীয় শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। যখন মহম্মদ ঘোরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ব্রাহ্মণদিগের নিজেদের প্রাধান্যরক্ষা একমাত্র কার্য্য হইয়াছিল, জাতি বা ধর্ম্ম রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রায় এককালে বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই কারণে বার বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর-ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধীন হয়।

প্রায় দুইশতবর্ষব্যাপী হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধে হিন্দুদিগের পক্ষে কাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল? আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, বর্ণসঙ্কর নিবারণ করিতে চতুর্ব্বর্ণের অস্ত্রধারণ করা উচিত, আর শূদ্রও যদি ব্রাহ্মণের (বেদের) রক্ষার নিমিত্ত সমরাঙ্গনে দেহপাত করে, তাহার স্বর্গলাভ হয়। আমরা দেখিয়াছি আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল। মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধের সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা কতদূর ছিল? স্মরণ রাখিতে হইবে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগের দেশকে শবরালয়

অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ বলিত। যেস্থানে কেবল দুই বর্ণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাস তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলে; মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশ। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর পশ্চিমস্থিত দেশসকল আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগ, তাহা হইলে পাঞ্জাব সেসময়ে ম্লেচ্ছদেশ ছিল কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। আমরা এই সকল যুদ্ধে পালরাজা জাঠজাতি ও রাজপুত-দিগের নাম পাই, মুসলমান-ইতিহাসে ক্ষত্রিয়দিগের নামের উল্লেখ নাই। মহাভারতের সময়ে রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয় পৃথক্ ছিল। মুসলমান-দিগের আগমনসময়ে রাজপুত ও ক্ষত্রিয়ে কোন প্রভেদ ছিল না, কোন সময়ে রাজপুতগণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। জাঠেরা এখন ক্ষত্রিয় বা রাজপুতমধ্যে পরিগণিত হয় না এবং তখনও হইত বলিয়া মনে হয় না। পালরাজেরা যে ক্ষত্রিয় নয় তাহাও বিশ্বাস করিবার কারণ আছে; তাহা হইলে যেসকল হিন্দু-রাজগণ মুসলমানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা কোন বর্ণের অন্তর্গত ছিল তাহা এখন নিরূপণ করা কঠিন। তাহাদের অধীনে কাহারা যুদ্ধ করিত, তাহাও স্থির বলা যায় না। আমরা কাশ্মীর মণ্ডল, পঞ্চনদ, সিন্ধুদেশ, মহাভারতে এইসকল স্থানের উল্লেখ পাই। ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত নহে, এই সকল দেশ যদি ম্লেচ্ছ দেশ হয়, তাহা হইলে সেসকল দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকিবার কথা। তবে যে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা সকলে ক্ষত্রিয় ছিল না তাহা একপ্রকার নিশ্চয়। তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে যে, প্রধানতঃ শূদ্রেরাই মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। দেশের রাজা সম্ভবতঃ নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিতেন; এভাব পূর্ব্বেও আমরা মহাভারতের সময়ে দেখিতে পাই। শল্য নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, এবং

তিনি মদ্রদেশের রাজা ছিলেন। মদ্রদেশের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা অবৈদিকপ্রধান ছিল। সেইরূপ ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ম্লেচ্ছদেশাধিপতি বলিত।

আরও একটু লক্ষ্য করিবার সামগ্রী আছে, মুসলমানদিগের দিল্লী জয় করিতে অনেক বৎসর লাগে, কিন্তু দিল্লীজয়ের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব্বদেশসকল তাহাদের অধীন হয়।

কথাগুলি সব একত্রিত করিলে অনেকগুলি চিন্তা করিবার বিষয় পাওয়া যায়। প্রথম—দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী-দিগের যে বল ছিল, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সে বল আর ছিল না। দ্বিতীয়—অবৈদিকবিপ্লবের পর চতুর্ব্বর্ণ আর ভারতবর্ষে কোথাও স্থাপিত হয় নাই। এ সাধারণ নিয়মের দুই একটি প্রত্যবায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাজপুতেরা ক্ষত্রিয় নাম ও পদবী গ্রহণ করেন ; বৈশ্যেরা পূর্ব্বে শূদ্রসদৃশ হইয়াছিল ; বাঙ্গালাপ্রভৃতি অপরাপর দেশে বাণিজ্য-জীবিগণ এখনও শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। কিন্তু রাজপুতানা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের বণিক্‌গণ বৈশ্যের স্থান ও মর্য্যাদা পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কেবল রাজপুতানাবাসী রাজ-পুত ও বৈশ্যগণ নিজবলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে নিম্ন অবস্থা হইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণের স্থান পুনরায় অধিকার করিয়াছেন, ইহা কাহারও প্রদত্ত নয়। মুসলমানদের আক্রমণসময় দেশ প্রধানতঃ শূদ্র ছিল। দেশমধ্যে শূদ্রদিগের যে কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা স্মৃতিগুলি পাঠ করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। ১২০০ খৃষ্টাব্দে অন্যূন পাঁচশত বৎসর এই স্মৃতির শাসন চলিয়া আসিতেছিল, এই পাঁচশত বৎসর

স্মৃতির বিধানমতে দেশের অধিকাংশ লোকের নাম ছিল শূদ্র বা দাস। তাহারা আপনাদিগকে দাস বলিয়া জানিত, দাস বলিয়া স্বীকার করিত, আপনাদিগকে দাস বলিয়া পরিচয় দিত এবং আপনারা দাসের মত থাকিত। তাহারা অগণিত বৎসর নিজ দেশে ব্রাহ্মণদিগের দাস হইয়াছিল এখন মুসলমানদের বিজয়ের ফলে তাহারা বিদেশীয়দিগের দাস হইল; এবং যাহারা এত দিন তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাও তাহাদিগের সহিত সমভাবে দাস হইল। পশ্চিম-ভারতবর্ষ জয় করিতে মুসলমানদিগের অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু মুসলমানেরা পূর্ব্ব-ভারতবর্ষ এক প্রকার বিনা আয়াসেই জয় করে। "প্রাচ্যাঃ দাসাঃ" পূর্ব্বদেশবাসিগণ দাস, ইহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা।

যে সময়ে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময়ে সিরিয়া দেশে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মযুদ্ধ চলিতেছিল। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে তুর্কগণ সিরিয়া জয় করে, এবং জয় করিয়া সেই দেশের খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করে, জেরুজিলাম নগর সিরিয়া দেশে অবস্থিত, এবং ইহা খৃষ্টানদিগের প্রধান তীর্থস্থান। তুর্করা তীর্থযাত্রী খৃষ্টানদিগের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তুর্কগণের এইরূপ আচরণে সমস্ত ইউরোপবাসী খৃষ্টানেরা অতিশয় বিচলিত হয়। তৎকালীন বাইজেন্‌সিয়ামের সম্রাট্, পোপ সপ্তম গ্রেগরির নিকট এইরূপ উৎপাত নিবারণের জন্য আবেদন করেন। তাহার ফলে ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সদেশে সমস্ত ইউরোপবাসী খৃষ্টানদিগের প্রতিনিধি লইয়া একটি সভা আহূত হয়। তাহাতে স্থির হইল যে, সমস্ত ইউরোপীয় জাতি মিলিয়া, মুসলমানদিগের বিপক্ষে

সিরিয়া দেশে তাহাদের তীর্থস্থান জেরুজিলাম্ উদ্ধার করিতে দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ করিবে। মুসলমানেরাও কৃতসঙ্কল্প হইল যে তাহারাও খৃষ্টানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবে। খৃষ্টানেরা ইহার নাম দিল ক্রুজেড্, আর মুসলমানেরা ইহার নাম দিল জিহাদ্, উভয়েরই অর্থ ধর্ম্মযুদ্ধ। সিরিয়া দেশে এই যুদ্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত খৃষ্টান জগতের সমবেত চেষ্টা বিফল হয়। তাহারা নিজেদের তীর্থস্থান জেরুজিলাম মুসলমানদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই, জেরুজিলাম্ এখনও মুসলমানদের অধিকারে আছে। ইউরোপীয় খৃষ্টানদিগকে উত্তেজিত করিতে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিপতিদিগকে এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগ প্রদান করিতে, সৈন্যসংগ্রহ করিতে এবং বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টায় নানাদেশবাসী ইউরোপীয়গণ প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে কত লক্ষ খৃষ্টান নিহত হয়, তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। মুসলমানগণও ধর্ম্মযুদ্ধ ভাবিয়া খৃষ্টানদের বিপক্ষে একভাবে দুইশত বৎসর যুদ্ধ করে ও খৃষ্টানদিগকে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে খৃষ্টানেরা ছিল আক্রমণকারী এবং মুসলমানেরা ছিল আত্মরক্ষাকারী।

মুসলমানগণকর্ত্তৃক ভারতবর্ষজয়কে ধর্ম্মযুদ্ধ বলা যাইতে পারে কি না, সেসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। ঘজ্নির সুলতান্ মামুদকে তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া গণনা করেন। সেই কারণে আজ পর্য্যন্তও নানাদেশবাসী মুসলমানগণ ঘজ্নিতে তাঁহার সমাধি দেখিতে আসে। দেশজয় বা দেশলুণ্ঠন যে

মুসলমানদিগের উদ্দেশ্য ছিল না তাহা এককালে বলা যায় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম স্থাপন ইহাও যে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাহাও নিশ্চয়।

খৃষ্টানেরা যখন ধর্ম্মযুদ্ধ বলে, এবং মুসলমানেরা যখন ধর্ম্মযুদ্ধ বলে, এ উভয় কথাই বুঝা যায়, হিন্দুদের মুখে সে সময়ে অন্ততঃ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিলে কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতে বেদরক্ষা করিতে অথবা বর্ণসঙ্কর নিবারণ করিতে অবৈদিকদিগের সহিত চতুর্ব্বর্ণ যুদ্ধ করিত। সে সময়ে চতুর্ব্বর্ণ মিলিয়া কোথাও কোথাও অন্ততঃ ব্রাহ্ম মহোৎসবে যোগ দিত। চতুর্ব্বর্ণের প্রতিনিধি রাজসভায় বসিত, রাজার অমাত্য হইত। শূদ্র রাজমন্ত্রী হইত, সমবেত নরপতিগণের সভায় শূদ্র রাজাকে অর্ঘ দিবার প্রস্তাব হইত। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্মৃতিযুগ প্রায় পাঁচশত বৎসর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দেশে কেবল দুই শ্রেণীর লোক বাস করিত, একশ্রেণী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সমাজের অন্তর্গত, দ্বিতীয় শ্রেণী যাহাদিগকে শূদ্র বলিত তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত। তাহাদের প্রতি পাঁচশত বৎসর ধরিয়া কিরূপ ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল, তাহা বিশখানি স্মৃতিতে অতি স্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। একতাবদ্ধ মুসলমানদিগের সহিত নানা ধর্ম্মে, নানা জাতিতে বিভক্ত হিন্দুগণ (যাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই শূদ্র ছিল) যে দুইশত বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। দাসবহুল পূর্ব্বদেশে মুসলমানগণ যে বিনাযুদ্ধে দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

• হিন্দুদিগের যে জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছিল, তাহারই এক অবস্থায় মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করে। ইহার তিনশত

বৎসর পরে পুনরায় হিন্দুদিগের নবজীবনের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়, সে কথা পরে দেখিব।

মুসলমান-অধিকার। (২)

১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদের অধিকারে ছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠানেরা রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার পর বাঙ্গালাদেশ দিল্লীর মোগল সম্রাট্দিগের অধিকারে আসে। মুসলমানগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে পূর্ব্ববঙ্গ জয় করে। এখন যে বাঙ্গালাদেশে অধিক সংখ্যায় মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্ম স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণ সময়ে বাঙ্গালাদেশে জনসাধারণের কি ধর্ম্ম ছিল. তাহা বলা কঠিন। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, তাহা নিশ্চয়, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহাও নিশ্চয়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ তখনও বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত হয় নাই। দেশের জনসাধারণের সহিত এ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের পরিচয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না, ব্রাহ্মণেরাও যে দেশের লোকদিগকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, তান্ত্রিক ও অপর নানাপ্রকার ধর্ম্ম বিকৃতরূপে দেশে জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বাঙ্গালাদেশে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অপেক্ষা অধিক দিন প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধগণ বাস করিত। "অনেকগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ

হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন", এখনও সমস্ত ভারত-বর্ষের মধ্যে কেবল বাঙ্গালাদেশে এবং অল্প সংখ্যায় কাশ্মীরে বৌদ্ধ-দিগকে দেখা যায়। হিন্দু বলিলে এখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বুঝায়; হিন্দু শব্দের এই অর্থ ধরিলে মুসলমানদিগের বিজয়ের সময় ও তাহার অনেক পরেও বাঙ্গালাদেশে যে হিন্দুদিগের বাস ছিল তাহা বলা যায় না।

যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহারা সকলই বিকৃত বৌদ্ধ ও বিকৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংমিশ্রণে জন্মিয়াছিল। ধীরে ধীরে এই সকল সঙ্কর ও অসংস্কৃত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। মুসলমানদের আগমন-ফলে এই পরিবর্ত্তনের বিশেষ সাহায্য হয়। অনেক মুসলমান নবাব দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন; অনেকের হিন্দুদিগের প্রকৃত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র জানিবার আগ্রহ ছিল। তাঁহাদেরই কৌতূহল পূরণের নিমিত্ত এবং তাঁহাদেরই আনুকূল্যে ব্রাহ্মণগণ মূল সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থসকল বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করেন। এই উপায়ে মহাভারত এবং অপরাপর পুরাণসকল বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত হয় এবং বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণ প্রথমে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের পরিচয় পায়। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অনুকরণে তখন হিন্দু জমিদারগণও মূল সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে সাহায্য দান করেন। প্রধানতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থসকলের অনুবাদ হয়। বাঙ্গালীদের ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখা উচিত।

যে কারণেই হউক বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে সংস্কৃত ব্রাহ্মণ্য

অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। কত শত বৎসর ধরিয়া এই পরিবর্ত্তন চলিয়া আসিতেছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। মুসলমানদিগের আগমনের পরেও বাঙ্গালীরা কত সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল তাহা কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না। সম্প্রদায়গুলি পরস্পর বিরোধী ছিল, সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাধারণভাব কিছু থাকিলেও বিরোধের অংশ অনেকগুণে অধিক ছিল। তাহার পর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মৌলিক নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বহির্ভূত সকলকেই ইতর অর্থাৎ পৃথক্ জ্ঞান করিতেন ও তাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেন না। তাহার পর চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক ঘটনা হয়। সেই শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয়গণ আমেরিকা আবিষ্কার করে, তাহার কিছু পূর্ব্বেই ইউরোপীয়গণ উত্তম-আশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া প্রথমে সমুদ্রযোগে ভারতবর্ষে আসে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্টিন লুথর জন্মগ্রহণ করেন। পর শতাব্দীতে ইঁহারই চেষ্টায় পুরাতন খৃষ্টান্ ধর্ম্ম নূতন রূপ ধারণ করে, আর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণেরা স্মৃতিযুগে শূদ্রদিগকে যে স্থান দিয়াছিলেন, শূদ্রেরা সেই স্থান চিরদিনই অধিকার করিয়া আছে। তথাপি ধর্ম্মসম্বন্ধে শূদ্রেরা যে নিজেদের উন্নতির নিমিত্ত কখন কোন চেষ্টা করে নাই সে কথা সত্য নয়। হিন্দুদিগের সকল স্তর হইতেই ধর্ম্মসংস্কর্ত্তা সময়ে সময়ে দেখা দিয়াছে। "কবীর জোলা (তাঁতি) ছিলেন, রুইদাস চর্ম্মকার ছিলেন; দাদুপন্থির প্রবর্ত্তনকর্ত্তা দাদু ধুনরী ছিলেন। ধনা জাঠ ছিলেন,

সেনপন্থিপ্রবর্ত্তক সেন নাপিত ছিলেন, এবং তুকারাম শূদ্র ছিলেন।" এইরূপ অগণিত ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাম ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল সম্প্রদায়ই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংঘর্ষে আসে, এবং সকলেরই অবশেষে এক পরিণাম হয়; সংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই জয় হয়। সম্প্রদায়গুলি হয় লোপ পায়, না হইলে ক্ষীণ ও বিকলাঙ্গরূপে কোথাও কোথাও এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের ইতিহাসে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী এক প্রকার যুগপ্রবর্ত্তনের কাল বলিলে বলা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে তিন শত বৎসরব্যাপী পাঠানদিগের প্রভুত্ব লোপ হয়, মুসলমান পাঠান গিয়া মুসলমান মোগল ভারতবর্ষের অধিকারী হয়। কিন্তু যে রাজপুতগণকে মহম্মদ ঘোরী সরস্বতীনদী-তীরে পরাজয় করিয়াছিলেন সেই রাজপুতগণ মোগল সম্রাট্‌দিগের ভারতবর্ষ শাসন করিতে প্রধান সহায় ও অবলম্বন হইল। হিন্দুরা পুনরায় বল সঞ্চয় করিল এবং দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌দিগের অধীনে থাকিলেও দেশ-মধ্যে তাহাদের স্থান মুসলমানদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিম্নতর ছিল না। মানসিংহের তুল্য কোন মুসলমান কর্ম্মচারী তাঁহার পূর্ব্বে দেশমধ্যে তাঁহার সদৃশ উচ্চস্থান অধিকার করে নাই।

এই সকল হইল রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা। এ সময়ে হিন্দু-দিগের পক্ষে অনেকগুণে গুরুতর কাণ্ড ঘটিতেছিল। বহু শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ হইতে বেদ লোপ পাইয়াছিল; স্থানে স্থানে কোন কোন বেদের কোন কোন শাখা দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সকল বেদের শাখা লইয়া ব্রাহ্মণদিগের ভিতর অগণিত বিভাগের

উৎপত্তি হইয়াছিল। বংশানুক্রমে শ্রৌত ব্রাহ্মণেরা স্বশাখোক্ত বেদ নিজেরা শিখিতেন ও পুত্র এবং শিষ্যগণকে শিখাইতেন ; কিন্তু বেদের মর্ম্ম-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের কিংবা জনসাধারণের বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহা বোধ হয় না। স্মৃতিমধ্যে গায়ত্রীজপের মাহাত্ম্য যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাহা হইতে মনে হয় যে উহা সাধারণ বৈদিক ব্রাহ্মণের বেদানুশীলনের চরম সীমা ছিল। এই সময়ে মনে হয় যেন হিন্দুদিগের মধ্যে পুনরায় বেদসম্বন্ধে অনুসন্ধানের লক্ষণ দেখা দিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে সায়নাচার্য্য বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করেন, আর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানক ও চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। দেড় সহস্র বৎসর পরে হিন্দুদিগের মধ্যে পুনর্জ্জীবনের প্রথম লক্ষণ দেখা দিল।

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের জাতীয় জীবনে চৈতন্যদেবের স্থান এখনও পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালী হিন্দুদের মনে 'জাতি' জ্ঞান এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের মনে স্থূলভাবে একপ্রকার জ্ঞান আছে যে, তিনি বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই কথাতে চৈতন্যদেব বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে কি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা কিছুই প্রকাশ পায় না। সকলের মনে এক প্রকার ধারণা আছে, যে, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ভারতবর্ষকে হিন্দু ভারতবর্ষ করেন, এই কথাটির ঐতিহাসিক পক্ষ হইতে বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। চব্বিশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। যাহাকে লোকগুরু বা লোকশিক্ষক বলে তিনি তাহা ছিলেন না। ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিশেষ উপদেশও তিনি

কাহাকেও দেন নাই। কোন নূতন ধর্ম্মপন্থা তিনি আবিষ্কার করেন নাই; কোন ধর্ম্মগ্রন্থও তিনি লিখিয়া যান নাই। চেষ্টা করিয়া তিনি যে কোন নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন তাহাও বলা যায় না। তাঁহার জীবনে অলৌকিক বা অতিমানুষিক কোন ঘটনা নাই, অথচ তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মপ্রচারক কোন কালে করে নাই। তাঁহার ভক্তিজীবনের ফলে বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসাম এই তিন প্রদেশ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই; ইহার নিমিত্ত তর্ক বা বিচার, যুদ্ধ বা বিরোধ কিছুই করিতে হয় নাই। কি করিয়া যে এই তিন প্রদেশের লোক তাঁহার প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মজগতের একটি রহস্য।

জাতিগঠন-বিষয়ে চৈতন্যদেবের স্থান ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। বৌদ্ধ-অভ্যুত্থানের পর ভারতবর্ষের কোন অংশে একধর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবফলে দুই সহস্র বৎসর পরে বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের লোকেরা একধর্ম্মাবলম্বী হইল। বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণ এতদিন বিকৃত বৌদ্ধ এবং বিকৃত পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। যদি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায়, তাহা হইলে সমগ্র বাঙ্গালাদেশ চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে প্রথমে হিন্দু হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত এই নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সংঘর্ষ হইল, ব্রাহ্মণেরা চৈতন্য-দেবকে ভগবৎ-ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণবপন্থা হিন্দু-দিগের পঞ্চ পন্থার অন্যতম পন্থা, এ বিষয় লইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত কোন প্রকার বিরোধ হইবার কথা নয়, কিন্তু নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর এক দিক্ ছিল, তাহা সামাজিক। পূর্ব্বে পাতঞ্জলপন্থী যোগী-

দিগের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংঘর্ষ হয়, সেই বিরোধ ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া হয়। এবারও তাহাই হইল। যোগিগণ চতুর্ব্বর্ণকে, বিশেষ শূদ্র ও শূদ্রতুল্য বৈশ্যদিগকে তাহাদের সম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিতে নিমন্ত্রণ করেন। যোগিগণের মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক বৈষম্য ছিল না, তাহারা সকলেই এক ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিল। ধর্ম্মশিক্ষা বা ধর্ম্মসাধন-সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হিসাবে, এক যোগপন্থা-অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীর (স্ত্রী বা পুরুষই হউক) অপর যোগাবলম্বীর সহিত কোন প্রকার ভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণদের সহিত যোগিগণের বিরোধে যে ফল হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এবারও ব্রাহ্মণদের সহিত সংঘর্ষের ফলে বৈষ্ণবদিগের তদনুরূপ অবস্থা হইয়াছিল। সামাজিক হিসাবে পূর্ব্বে যোগিগণের পরাজয় হইয়াছিল, বৈশ্য ও শূদ্র দেশমধ্যে, পূর্ব্বে যে স্থানে পড়িয়াছিল পরেও সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। ধর্ম্মমতসম্বন্ধে যে বিরোধ হইয়াছিল তাহাতে উভয় মতের সামঞ্জস্য হইল, কিন্তু শূদ্র ও শূদ্রতুল্য বৈশ্যগণের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না, এবারও অবিকল তদনুরূপ ফল হইল।

ব্রাহ্মণ্য মতের সহিত অপর যে কোন মত সংঘর্ষে আসিয়াছে সেই মতেরই পরাজয় না হউক, উভয়-মতমধ্যে একটা সন্ধি হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজের সহিত অন্য কোন সমাজ যখন সংঘর্ষে আসিয়াছে তখন উভয় সমাজের কোন প্রকার সন্ধি বা মিলন হয় নাই। এইরূপ হইবার কারণ বিচার করিবার এ স্থান নহে। জাতিগঠন পক্ষে সকল দেশে ধর্ম্মই প্রধান উপাদান। মুসলমানজগতে ইস্‌লামধর্ম্ম একমাত্র বন্ধন, খৃষ্টান্‌জগতেরও অবস্থা কতকটা তদনুরূপ। মুসলমান ও

খৃষ্টানদিগের মধ্যে ধর্ম্মের একতা হইলেই সামাজিক সাম্য আপনা-আপনি হয়। বাঙ্গালাদেশে নামে অন্ততঃ একধর্ম্ম হইলেও সামাজিক বৈষম্যের কোন প্রভেদ হইল না। বৈষ্ণব-অভ্যুত্থানের প্রথম অবস্থায় এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে অন্ততঃ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সামাজিক ভেদ উঠিয়া যাইবে, কিন্তু এভাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

চৈতন্যদেবের সহিত আর একজনের নাম এইস্থানে উল্লেখ করা উচিত, তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও সহপাঠী, তাঁহার নাম রঘুনন্দন শিরোমণি। বাঙ্গালাদেশে চৈতন্যদেবের ন্যায় ভক্তিগুরু কেহ জন্মে নাই, আর রঘুনন্দনের মত অদ্ভুতমেধাসম্পন্ন দ্বিতীয় পণ্ডিত ও জন্মগ্রহণ করে নাই। এই দুইজনের মত লোক পৃথিবীতে আর কোথাও জন্মিয়াছে কিনা তাহা সন্দেহ। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম লইয়া দেশের জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলকেই তাঁহারা শূদ্র নাম দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জনকয়েককে সৎশূদ্র নাম দিয়া নিজেদের নিকট আসিবার এবং সেবা করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দেশের লোকের সহিত তাঁহারা কোন প্রকার সংস্রব রাখিতেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে কোনকালে সংস্কৃত চর্চ্চা এত অধিক হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থের চর্চ্চার ফলে শিক্ষিত ব্রাহ্মণের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সে সময়ের সাহিত্য হইতে দেখিতে পাওয়া যায় পাঠানদিগের শাসনকালে সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। মুসলমানদের অধীনে আমরা ব্রাহ্মণ পাইক, কর্ম্মকার পাইক, চামার পাইক প্রভৃতি (পদাতি) দেখিতে

পাই। সংস্কৃতশিক্ষার পুনঃ প্রচলন ও বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মণদিগের মানসিক বলেরও বৃদ্ধি হইল। শূদ্রদিগের সহিত বাসের ফলে তাহাদের মধ্যে অনেক স্মৃতিবিরুদ্ধ ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল, এই সকল দূর করিতে ও আপনাদিগকে বিশুদ্ধ রাখিতে তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন। যে কারণে সাত আটশত বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, সেই কারণে বাঙ্গালাদেশে পুনরায় স্মৃতিরচনার প্রয়োজন হইল। পুরাতন স্মৃতিগুলিতে চতুর্ব্বর্ণ-সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখিত আছে, রঘুনন্দনের স্মৃতিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ নাই। রঘুনন্দন মত দিলেন যে বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ নাই। ব্রাহ্মণদিগকে বিশুদ্ধ রাখিতে তিনি তত্ত্ব নাম দিয়া আটাইশ খানি স্মৃতি রচনা করেন। বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যখন বল সঞ্চয় করে, তখনই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভুত্বরক্ষার নিমিত্ত এই তত্ত্ব স্মৃতিগুলি রচিত হইয়াছিল। দেশের ইতিহাসে কিংবা বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের ইতিহাসে এই তত্ত্বগুলির সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন স্থান নাই, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের রচনা। একাদশীতত্ত্ব, মলমাস-তত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত দেশের সাধারণ ইতিহাসের কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেও দেশের লোক ইতর ছিল, ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, এখনও তাহারা সমভাবে ব্রাহ্মণগণ হইতে পৃথক্ রহিল। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে রঘুনন্দনের স্মৃতিগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ইহাদের রচনার পরে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগের বল অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ হইলেন এবং ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ্য-সমাজে শিথিলতা-প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইল। চারিশত বৎসর বাঙ্গালার

ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা রঘুনন্দনের স্মৃতিগুলিকে নিজেদের আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রায় এই সময়ে আপনাদিগকে বিশুদ্ধ রাখিতে ব্রাহ্মণেরা আর এক উপায় অবলম্বন করেন, তাহার নাম মেলবন্ধন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানন্দী, সদানন্দী, এবং মালাধারী মেল প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন বৌদ্ধপ্রধান বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণদিগকে বিশুদ্ধ রাখিতে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করেন; সেই উদ্দেশ্যে তিনশত বৎসর পরে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধনের প্রথা প্রচলিত করেন। এ উভয় চেষ্টা হিন্দুদিগের মধ্যে মৌলিক সংবিভাগ প্রথার উদাহরণ। তবে বল্লালসেন দেশের অধিপতি ছিলেন, দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি এই প্রথা প্রচলন করেন। তিনশত বৎসর পরে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা কেবল আপনাদিগকে বিশুদ্ধ রাখিতে নিজেরাই এইরূপ বিভাগে আবদ্ধ হন।

বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানপ্রসঙ্গে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। বৈষ্ণবধর্ম্ম-অভ্যুত্থানের আর এক নাম ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব, উভয় বিষয় সম্বন্ধে ইহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ নীতির বিপক্ষে বিদ্রোহ বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালাদেশে জনসাধারণের ইহা প্রথম সমবেত বিদ্রোহ। ব্রাহ্মণেরা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে শূদ্রদিগের ধর্ম্ম ও স্থান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভাগে নিরূপিত হইয়াছিল এবং সেই কারণে অতিশয় নীচ স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবফলে এক নূতন শক্তি দেখা দিল। এই শক্তির ফলে যাহারা এতদিন সমাজপ্রান্তে হেয় ও নগণ্যভাবে পতিত ছিল, তাহারা

ব্রাহ্মণদিগের বিধানের বিপক্ষে বিদ্রোহ করিল। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের সহিত এ বিদ্রোহের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, এতদিন পর্য্যন্ত দেশের 'ইতর' লোকেরা নানাপ্রকার বিকৃত ও সঙ্কর ধর্ম্মের উপাসক ছিল, যাহারা তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিত তাহারাও তাহাদের ন্যায় সমভাবে অজ্ঞ ও কলুষিতচরিত্র ছিল। চৈতন্যদেবের পবিত্র জীবন ও পবিত্র শিক্ষায় এতদিন পর্য্যন্ত আবর্জ্জনাপূর্ণ দেশের স্ত্রীপুরুষের মন পরিষ্কৃত হইল। তাহার ফলে এতদিন তাহারা যে অবস্থায় বা যে ভাবে ছিল তাহার বিপক্ষে তাহাদের মনে একটা স্বাভাবিক প্রতিঘাত হইল; ব্রাহ্মণদিগের বিপক্ষে বিদ্রোহ এই প্রতিঘাতের প্রথম ফল। এমন কুকথা নাই যে ব্রাহ্মণেরা এতদিন পর্য্যন্ত অব্রাহ্মণদিগের প্রতি (যাহাদিগকে তাঁহারা শূদ্র চণ্ডাল প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন) ব্যবহার না করিতেন। সেই শূদ্রগণ বৈষ্ণব হইয়া এখন তাহার প্রত্যুত্তর দিল।

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ *
শ্রীকৃষ্ণভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥
সর্ব্ববর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

---

* এইসকল শ্লোকগুলি বৃহৎ পাষণ্ডদলন হইতে গৃহীত।

অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয়পাত্র।
শাস্ত্রে বলে যেই ভজে সেই প্রিয়পাত্র॥
ভক্তে যেই দেন কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
অভক্ত বিপ্রের দ্রব্য না করে স্পর্শন॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেহপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেইজন ভাগবত শুনহ সংসারে॥
উত্তম বর্ণতে নাহি ভঁজে জনার্দ্দন।
সর্ব্ববর্ণমধ্যে শূদ্র হয় সেই জন॥
বিপ্রাদ্দ্বাদশগুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।

দ্বাদশ গুণেতে যুক্ত হয়ত ব্রাহ্মণ।
বিমুখ হইলে পদ্মনাভের চরণ॥
শ্বপচ হইতে নীচ সেই সে অধম।
শ্বপচে ভজিলে কৃষ্ণ সবার উত্তম॥
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বশাস্ত্রেষু দীক্ষিতঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্যস্য বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

সহস্র শাখা বেদ পড়ে আর ত ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ববিদ্যা আছে ষড়্‌শাস্ত্রেতে নিপুণ॥
অবৈষ্ণব হয় যদি গুরুযোগ্য নয়।
শ্বপচ বৈষ্ণব হৈলে সেই গুরু হয়॥

শিবলিঙ্গসহস্রাণি শালগ্রামশতানি চ।
দ্বাদশকোটিবিপ্রাণামেকঃ শ্বপচ-বৈষ্ণবঃ ॥

সহস্র শিবলিঙ্গ যদি হয় পূজ্যমান।
একশত শালগ্রাম তাহার সমান ॥
দ্বাদশ কোটি বিপ্র যদি না ভজে কেশব।
তার সমতুল্য এক শ্বপচ বৈষ্ণব ॥

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পূজা ব্রাহ্মণদিগের দর্শন বৈষ্ণবদের পক্ষে নিষ্ফল; সেইরূপ ব্রত-তপস্যাদিও নিষ্ফল।

ন দানং ন তপঃ পূজা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীতো নাহং পরং তস্য সর্ব্বমেতদ্বিড়ম্বনম্ ॥

নির্ম্মল ভক্তিতে দান করে যেই জন।
কৃষ্ণ বহির্মুখ হইলে সব বিড়ম্বন ॥
তপ পূজা শৌচ ব্রত যেই জন করে।
কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে ফল নাহি ধরে ॥

তীর্থদর্শন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল, তীর্থদর্শন-সম্বন্ধে বৈষ্ণবেরা বলিলেন—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যথাচ্যুতো হরিকথাপ্রসঙ্গঃ ॥

সেই স্থানে গঙ্গাদেবী আর যে কাবেরী।
সেই স্থানে সরস্বতী আর গোদাবরী॥
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ আসি করে বাস।
যে স্থানে অচ্যুতকথা করেন প্রকাশ॥

সাঙ্খ্য পাতঞ্জল-মতাবলম্বীরা বেদের বিরোধী ছিলেন না; মোক্ষ-সম্বন্ধে বৈদিক পন্থা নিষ্প্রয়োজন এইমাত্র বলিতেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের অপেক্ষাও অবৈদিক ছিলেন।

অন্যনির্ম্মাল্যং ভুঞ্জতে ভক্তাস্তে মর্ত্ত্যমানবাঃ।
গোবিন্দোপাসকাঃ যে তে নিত্যং বেদান্তরং বিনা॥

শ্রীকৃষ্ণেতে হয় যার দৃঢ় উপাসনা।
বেদের নিষেধ বিধি না করে ভাবনা॥
অন্যের নির্ম্মাল্য তারা না করে ভক্ষণ
নিশ্চয় জানিবা এই ভক্তের লক্ষণ॥

বিষ্ণুর নিকটে অন্য দেবের পূজনে নরকগামী হয়; বিষ্ণুর মন্দিরে অন্যদেবপূজায় নরকে বাস হয়; অন্য দেবের নৈবেদ্য দর্শন স্পর্শন কিংবা ঘ্রাণ বৈষ্ণব গ্রহণ করিবে না। বৈষ্ণব কালকূট বিষ খাইবে, না হয় প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি কদাচ অন্য দেবোচ্ছিষ্ট এক কণাও গ্রহণ করিবে না। বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ দ্রব্যাদি প্রাণান্তেও ভক্ষণ করিবে না; স্মৃতিতে লিখিত ছিল যে শূদ্র শিখাবন্ধন করিতে পারিবে না, ব্রাহ্মণগণ অচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করিত। বৈষ্ণবেরা তাহাতে ছিদ্র দিত, ব্রাহ্মণের অচ্ছিদ্রতিলক-সম্বন্ধে বৈষ্ণবেরা বলিত—

অচ্ছিদ্রঃ মূর্দ্ধপুণ্ড্রস্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শ্বানঃ পাপো ন সংশয়ঃ॥

তিলক করিয়া ভালে ছিদ্র নাহি দেয়।
দ্বিজের অধম তারে পুরাণেতে কয়॥
তাহার কপালে যেন কুকুরের চিহ্ন।
নিশ্চয় জানিহ সবে না জানিহ অন্য॥

স্মৃতিতে ম্লেচ্ছপ্রভৃতির সম্ভাষণে আচমন ও অপরাপর প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, বৈষ্ণবেরা বলিল—

দৃষ্ট্বা ভালে দ্বিজাত্মানমচ্ছিদ্রপুণ্ড্রকং তথা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মৃতিং কৃত্বা বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েন্মুখম্॥
অচ্ছিদ্র তিলক ভালে ব্রাহ্মণকে দেখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মৃতি করি বস্ত্র দিবে মুখে॥

জাতিভেদ-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিতেন—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

কৃষ্ণভক্ত শূদ্র নীচ চণ্ডাল যবন।
তার জাতি দৃষ্ট কৈলে নরকে গমন॥

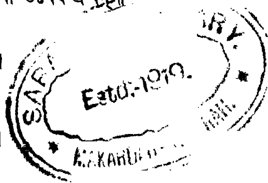
তাঁহারা বলিতেন কৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রস্তর জ্ঞান, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান, এবং বৈষ্ণবের জাতি জ্ঞানে নরকগামী হয়।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া

ভক্তি প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবের পাদোদক-পানে সহস্র জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যার পাপ মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণেরা বলিতেন সহস্র দোষ করিলেও তাঁহারা পূজ্য, বৈষ্ণবেরা বলিলেন ভগবদ্ভক্ত অনাচার করিলেও সর্ব্বদা শুচি, বৈষ্ণব পরম আরাধনীয়; চক্ষুর সার্থক বৈষ্ণবদর্শন। বৈষ্ণবের পদধূলি গ্রহণে কুমতি, ও চরণামৃতপানে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। উপরে সংসারী গৃহী বৈষ্ণবের কথা বলিয়াছি, তাহারা গৃহে থাকিলে দেব-দেবী-পূজার আশঙ্কা থাকে সেই সম্ভাবনা নিবারণের জন্য তাঁহারা নিয়ম করিলেন—

সংসারী বৈষ্ণবঃ কৃষ্ণোপাসকঃ পরমঃ সুধীঃ।
দেবান্ পূজয়েৎ যো হি সোঽবৈষ্ণবো ভবেৎ ধ্রুবম্॥

কৃষ্ণ-উপাসক হয় কোন বুদ্ধিমান্।
সংসারী হইয়া সেই বৈষ্ণবপ্রধান॥
সেই জন পূজে যদি দেবদেবী সব।
নিশ্চয় জানিহ সেই হয় অবৈষ্ণব॥



তাহা হইলে বৈষ্ণবের ধর্ম্মই বা কি হইল কর্ম্মই বা কি হইল? ধর্ম্মসম্বন্ধে বৈষ্ণবেরা বলিল—

নাম্মৈব পরমোধর্ম্ম নাম্মৈব পরমন্তপঃ।
নাম্মৈব পরমোবন্ধুঃ নাম্মৈব জগতাং গতিঃ॥
যত ধর্ম্ম আছে নামের নহে এক লব।
সর্ব্বতপ হইতে নাম পরম দুর্ল্লভ॥

নামপরে বন্ধু নাহি এতিন ভুবন।
জগতের গতি নাম জানিহ কারণ।
সে করিল সর্ব্ব কর্ম্ম যে ভজিল হরি।
যে ভজিল হরি সেই সর্ব্বধর্ম্মচারী॥

কলিযুগে হরি নামই সার ; হরিনাম-সংকীর্ত্তন হইল পরম ধর্ম্ম, আর কর্ম্মসম্বন্ধে বিধান হইল যে কামনা রহিত হইয়া হরিনাম করিবে।

যে নাম বিচরন্তি ভূমৌ, ত্যক্ত্বা চ কামনা বিষয়াংশ্চ ভোগান্।
তেষাঞ্চ মুক্তিং পরমাং হি নিষ্ঠাং, দাস্যামি সত্যং মনসা নিযুক্তাম্॥

নাম যুক্ত হৈয়া যেবা পৃথিবী বেড়ায়।
কামনা বিষয় ছাড়ি যেবা আমা গায়॥
ভক্তি ছাড়ি যেবা মোরে অন্য নাহি চায়।
সত্য তারে মুক্তি দেই কহিল সবায়॥

কিন্তু ভক্তিমার্গ অনুসরণ করিতে আরও কিছু প্রয়োজন।

জাতির্ব্বিদ্যা মহত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেবচ।
যত্নতঃ পরিবর্জ্জিত পঞ্চৈতে ভক্তিঘাতকাঃ॥

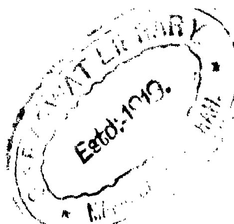
অনন্তশাস্ত্রং বহুধা চ বিদ্যা স্বল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতা চ।
যৎসারভূতং তদুপাসনীয়ং, হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

পড়িলে শুনিলে ভাই হরিভক্তি নহে।
কন্দল করিতে তার ব্যর্থ দিন যাহে॥

অনেক আছয়ে শাস্ত্র বিদ্যাও বিস্তর।
অল্পকাল বাঁচে তাতে বিঘ্ন বহুতর॥
সারভূত উপাসনা কর মতিমান্।
হংস যেন জলমধ্যে দুগ্ধ করে পান॥

তাহা হইলে আদর্শ বৈষ্ণব হইল কে?

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ



তৃণ হৈতে আপনাকে নীচ করি মান।
তরু হৈতে আপনাকে হবে সহবান॥
অতিদীনহীন দেখি করিবে সম্মান।
একমত হৈয়া সদা লবে হরিনাম॥

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে বাঙ্গালায় বৈষ্ণববিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস বুঝা যাইবে না, উহা বাঙ্গালী বৈষ্ণব জগতে বৈষ্ণব গুরুর স্থান।

যত্র তত্র গুরুর্দৃষ্টঃ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভূমৌ ছিন্নমূলতরুর্যথা॥
যথা তথা পায় যদি গুরু দরশন।
দেখিলে কৃতাঞ্জলি হইবে তখন॥
অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ হইবে নিশ্চয়।
ছিন্নমূল তরু যেন ভূমিতে পড়য়।

গুরুসেবা কর ভাই করিয়ে যতন।
গুরুকৃপা হৈতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

এই হইল অভিবাদনের নিয়ম; তাহার পর আজ্ঞা প্রতিপালনের কথা।

কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যমদেয়ঞ্চ অকিঞ্চনৈঃ।
গুরুপরিকৃতা দেহে কুলস্ত্রীনাং পতিরিব॥
কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিবা করেন উপহাস্য।
তথাপি গুরুর আজ্ঞা রাখিবে অবশ্য॥
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কিবা কহেন কারণ।
করিবেন তাহা জানি গুরুর বচন॥
গুরুসেবা করিবেন করি প্রাণপন।
পতিব্রতা ধর্ম্ম পতির আজ্ঞার পালন॥

গুরুসেবার পদ্ধতি এবং তাহার সহিত গুরুর প্রতি আচরণের এই প্রকার নিয়ম:—

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকাপাদপীঠকম্।
বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥

গুরুর আসন শয্যা আর যে বাহন।
পাদুকা হয়েন কিবা আর সিংহাসন॥
ছায়া আদি আর যত বসন ভূষণ।
কদাচিত শিষ্য নাহি করিবে লঙ্ঘন॥
গুরুসন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাম্।
ন সদ্গতিমবাপ্নোতি পূজনং কেবলনিষ্ফলম্॥

গুরুর অগ্রেতে যদি পূজে দেবগণ।
সে সত্য অর্চ্চন নহে নিষ্ফল পূজন॥

গৃহী বৈষ্ণবদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই শ্লোক বিশেষ উপযোগী। এ সম্বন্ধে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কর্ম্ম দানং সঙ্কল্পমানসম্।
দৈবকর্ম্ম তথা পৈত্র্যং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

পদ্মপুরাণেতে কহে পুরাণের মর্ম্ম।
গৃহস্থ বৈষ্ণব যেই করিবেক কর্ম্ম॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নাহি করে দান।
মনেতে সঙ্কল্প কিছু না করে সন্ধান॥
দৈবকর্ম্ম পৈতৃককর্ম্ম ত্যাগ করে সব।
তবে সে বলিবা তারে গৃহস্থ বৈষ্ণব॥

গৃহস্থই হউক, সন্ন্যাসীই হউক উভয়ের পক্ষে গুরুর স্থান অতি উচ্চ।

যো গুরুঃ স হরিঃ সাক্ষাৎ যো হরিঃ স গুরুঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টঃ হরিঃ স্বয়ম্॥

যেই গুরু সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেই গুরু।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট বাঞ্ছাকল্পতরু॥

ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান গুরুকে প্রদান করিতেন—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুদেবং প্রসাদয়েৎ ॥

কৃষ্ণেতে অপরাধ যদি হয় কদাচিত।
গুরু হইতে ত্রাণ পায় জানিহ নিশ্চিত ॥
গুরু-অপরাধী যদি হয় কোন জন।
কৃষ্ণও না পারে তাহা করিতে খণ্ডন।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বৈষ্ণব-অভ্যুত্থান সর্ব্বপ্রধান ঘটনা, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে ইহার অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই, ইহা বাঙ্গালী জনসাধারণের অভ্যুত্থান, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা ইতর বা পৃথক্ বলিতেন ; যাহাতে তাহাদের কোন প্রকার শিক্ষা না হয়, ব্রাহ্মণেরা স্মৃতিতে সেই উদ্দেশ্যে নিয়ম বন্ধন করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করিত তাহারা ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বিতাড়িত হইত। দেশের পনর আনার অধিক লোক শত শত বৎসর এই ভাবে বাস করিতেছিল। কখন বা কোন অবৈদিক সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মের কথা বলিত, অথবা তাহারা নিজেরাই কোন প্রকার ধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়া লইত ; তাহাদের মধ্যে এই প্রকারে ধর্ম্মসম্বন্ধে অগণিত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। দেশের লোক এই সকল সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, চৈতন্য-দেব-প্রদর্শিত বৈষ্ণব পন্থা এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত বাঙ্গালীদিগকে এক ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। ভারতবর্ষে সকল স্থানেই সম্প্রদায় গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের গঠন-ফলে, সে দেশে সে সম্প্রদায়ের মত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়

নাই, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব মত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইল। উপরে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম-অভ্যুত্থানের অনেক পূর্ব্বে রচিত। যে প্রকার মনের ভাব লইয়া ঐ সকল শ্লোক রচিত হইয়াছিল সেই প্রকার ভাব বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, চৈতন্যদেব এ প্রকার ভাব প্রচার করেন নাই। বৈষ্ণব জগতের সুষুপ্ত ভাবগুলি কিকারণে বাঙ্গালাদেশে জাগরিত হইল তাহা বিচার করিবার এস্থান নয়, তবে একথা স্থির যে, যে সকল বীজ ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে অলক্ষিতভাবে এতদিন পড়িয়াছিল, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবফলে বাঙ্গালাদেশে সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুরুগোবিন্দ শিখ সম্প্রদায় গঠন করেন। মুসলমানগণকর্ত্তৃক হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারের ফলে গুরুগোবিন্দ এই সম্প্রদায় গঠন করেন; ইহাদের মধ্যেও জাতিভেদ ছিল না, শিখেরা প্রত্যেকেই সিংহ উপাধি গ্রহণ করিল। মুসলমানদিগের অত্যাচার হইল গুরুগোবিন্দের আবির্ভাবের কারণ। কি কারণে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়, তাহা বলা কঠিন। কোন সম্প্রদায় গঠন করিবার সঙ্কল্প যে চৈতন্যদেবের মনে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়-গঠনে চৈতন্যদেবের কি স্থান তাহা বলা কঠিন। তাঁহার আচরিত ধর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্ত দেশে অব্রাহ্মণগণ যে প্রস্তুত হইয়াছিল সে কথা নিশ্চয়। চৈতন্যদেব বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের উপলক্ষ্যমাত্র না হইলেও দেশের লোক তাঁহার আগমনের নিমিত্ত অনেক শত বৎসর হইতে প্রস্তুত হইতেছিল। আর এক কথাও নিশ্চয় যে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগের হাতে পড়িয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্ম

পরে যে রূপ ধারণ করিল তাহার নিমিত্ত চৈতন্যদেব দায়ী নন, সে বাঙ্গলার মাটির গুণ; শত শত বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণ্যসমাজের শাসন-ফলে বাঙ্গালী অব্রাহ্মণদিগের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত ও বিলুপ্ত হইয়াছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাম্য ও প্রেম শিক্ষা তাহাদিগের মধ্যে স্থান পাইল না। বৈষ্ণব-অভ্যুত্থানের সামাজিক ফল ভয়ঙ্কর হইল, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া দূরে থাক্, যাহা কিছু ছিল, তাহাও লোপ পাইল, বৈষ্ণব গুরু ব্রাহ্মণের চৌদ্দ পুরুষ হইলেন।

বৈষ্ণবদিগের দাস-উপাধিগ্রহণ নূতন কথা নয়; পদ্মপুরাণে আছে—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ নীচাশ্রয়াঃ।
দাসা ভবন্তি দেবর্ষে যদর্থে কৃষ্ণসেবিনঃ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র লোকে কয়।
কৃষ্ণের ভজন কৈলে দাস নাম হয়॥

এ কথার অর্থ ভারতবর্ষের অপর স্থানের কৃষ্ণসেবীদিগের জানা ছিল, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে আসিয়া কথাটি বর্ণে বর্ণে সার্থক হইল। আর একটি কথা, পাঞ্জাবদেশে অল্পমাত্র হিন্দু শিখ হইল, বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমগ্র বাঙ্গালীর ধর্ম্ম হইল। কোন কোন ব্রাহ্মণ একথায় প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙ্গালার প্রতিঘরে কোন না কোন রূপে প্রবেশ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে ইহার অনুরূপ ঘটনা হয় নাই, তবে পাঞ্জাবে শিখেরা হইয়াছিল গুরুগোবিন্দের শিষ্য ও তাহাদের উপাধি হইয়াছিল সিংহ, আর বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবেরা হইল বৈষ্ণবগুরুদিগের শিষ্য এবং তাহাদের উপাধি হইল দাস।

মুসলমান-অধিকার। (৩)

বারশত চারি খৃষ্টাব্দে পাঠান বখ্‌তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা বাঙ্গালাদেশের রাজা হয়। প্রায় চারিশত বৎসর পাঠান অধিকারফলে বাঙ্গালাদেশে যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এখন তাহা সংক্ষেপে একত্রিত করা যাইতে পারে। যখন মুসলমানেরা প্রথম বাঙ্গালাদেশে আসে, বাঙ্গালাদেশে শতকরা নব্বই জনের অধিকের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কোন পরিচয় অথবা সম্বন্ধ ছিল না। দেশের জনসাধারণ আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরবিরোধী নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সকল সম্প্রদায়গুলিই বিকৃত বৌদ্ধ ও বিকৃত পৌরাণিক ধর্ম্মের দ্বারা গঠিত ছিল। দেশের রাজা ও বোধ হয় অধিকাংশ ভূঞা রাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-অবলম্বী ছিলেন। তাহাদেরই আশ্রয়ে প্রধানত ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় লিখিত ছিল, দেশের জনসাধারণের পক্ষে, ইচ্ছা করিলেও, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা ছিল না; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ তাহাদের একমাত্র শিক্ষাদাতা ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই সকল ধর্ম্ম পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল এ কার্য্যে ব্রাহ্মণেরা কিছুমাত্র সাহায্য প্রদান করেন নাই। মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের আদেশে ও আনুকূল্যে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থসকল বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করেন। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বাঙ্গালার জনসাধারণ হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে সুযোগ পায়, এইভাবে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণমধ্যে প্রবেশ করে।

একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে মৈনামতির গান, শূন্যপুরাণ, বৌদ্ধধর্ম্ম-

মঙ্গল এই সকল দেশমধ্যে প্রচলিত ছিল। চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা অন্য এক ভাব দেখিতে পাই। কৃত্তিবাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে, অদ্বৈতানন্দ চৌদ্দশ চৌত্রিশ খৃষ্টাব্দে, চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক ছিলেন, তিনি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন এবং স্বহস্তে ভাগবত লিখিয়াছিলেন। সঞ্জয় কৃত্তিবাসের সময়ের লোক, তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন।

তাহা হইলে দেখা যায় যে, পাঠানদিগের অধিকারসময়ে বাঙ্গালাদেশে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞান বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। দেশের পুরাতন সঙ্কর ও অসংস্কৃত লৌকিক ধর্ম্ম ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের আকার গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শাস্ত্রানুশীলনের বৃদ্ধি হয়, নবদ্বীপপ্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দুর্গস্বরূপ হয়। ব্রাহ্মণ্যসমাজ দৃঢ়বদ্ধ করিতে রঘুনন্দন স্মৃতি রচনা করেন। দেশের জনসাধারণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কোনকালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। তাহাদের সামান্য অংশমাত্র বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত গ্রন্থ হইতে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের কিছু সংবাদ পাইয়াছিল। চৈতন্যদেব দেশের সকলকে স্ত্রীপুরুষ-জাতিবিভাগ-অভেদে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

পাঠান-অধিকারের সময়ে বাঙ্গালাদেশে আর এক ঘটনা হইয়াছিল, যাহার সদৃশ ঘটনা এদেশে আর কখনও ঘটে নাই, ভারতবর্ষের অন্যত্র ঘটিয়াছিল কিনা তাহাও সন্দেহ। প্রায় দুইশত বৎসর অধিকারের পর গৌড়ের বাদসাহ সামসুদ্দিন (দ্বিতীয়) হিন্দুরাজা গণেশ কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং তাঁহার স্থলে রাজা গণেশ ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন, পুনরায় একজন হিন্দু গৌড়ের অধীশ্বর

হন। এভাব সাত বৎসর পর্য্যন্ত থাকে, তাহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং জালাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া ১৩৯২ সালে গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন। একজন বাঙ্গালী হিন্দুরাজা যে পুনরায় পাঠানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিবে ইহা এক আশ্চর্য্যের বিষয়। তদপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় রাজা গণেশ এই কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নৃসিংহ। "যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হল রাজা।" (অদ্বৈতপ্রকাশ ঈশান নাগরকৃত) চৈতন্যদেবের সহচর অদ্বৈতানন্দ এই ব্রাহ্মণ নৃসিংহের পৌত্র ছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে পাঠানরাজত্বকালে কোটি কোটি হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালায় পাঠান-অধিকারে হিন্দু-দিগকে কি ভাবে থাকিতে হইত চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এসকল ঘটনাতে ব্রাহ্মণেরা বিশেষ বিচলিত হইতেন না। দেশের সাধারণ লোকদিগকে তাঁহারা ইতর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ হইতে বিভিন্ন মনে করিতেন, এই ইতরগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণদের বিচলিত হইবার বিশেষ কোন কারণ থাকিবার কথা নয়। ইতর লোক ভিন্ন ব্রাহ্মণগণ নিজেরা মুসলমানদিগের হস্তে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইতেন। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে অনিচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে অপর ব্রাহ্মণেরা যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, কিংবা নিবারণ করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত বাঙ্গালার ইতিহাসে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাঠানদিগের পরে, মোগলেরা বাঙ্গালার রাজা হইল। ষোড়শ

শতাব্দীর শেষভাগে যখন রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গালাদেশের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিতে আসেন, তখন বাঙ্গালাদেশকে বারভূঞা বাঙ্গালা বলিত অর্থাৎ সমস্ত দেশ মুসলমানদের অধীনে বারজন ভূঞা রাজার অধিকারে ছিল, এই বারজনের মধ্যে দশজন ছিলেন হিন্দু। মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগেও প্রায় সমস্ত বাঙ্গালাদেশ হিন্দু জমিদারগণের সম্পত্তি ছিল। ইতিহাসপাঠকগণ জানেন যে. ভারতবর্ষের হিন্দুরা পাঠানদিগের সময়ে দেশে বা রাজকার্য্যে যেরূপ অবস্থায় থাকিত মোগলদিগের সাম্রাজ্যে তাহারা তদপেক্ষা অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিত। বাঙ্গালাদেশেও সেইরূপ ঘটে, বাঙ্গালার জমিদারগণ অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতেন।

রাজনৈতিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলে, মোগলসাম্রাজ্য-কালে বাঙ্গালীদিগের অবস্থা অনেক বিষয়ে উন্নত হয়; ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এ উন্নতির লক্ষণ বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশের প্রতিঘরে প্রবেশ করে, বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী রচনা করিয়া গ্রামে গ্রামে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৬৫ জন পদাবলী-প্রণেতার নাম এখনও পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে এগার জন ছিলেন মুসলমান; স্ত্রীলোক রচয়িত্রীরও অসদ্ভাব ছিল না। বাঙ্গালা-দেশে হিন্দুদের ইতিহাসে সকলে একধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিযোগী আরও অনেক সম্প্রদায় ছিল, পুরাণব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, শাক্ত, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, ইহাদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এই সকলেরই সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সংঘর্ষে আসে; পরিশেষে চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পরাজয় হয়। এ কথাটা বোধ হয় অত্যুক্তি হয়; সংঘর্ষের ফলে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় বলিলে

কথাটা অধিকতর যথার্থ হইবে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর একশত বৎসর বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কাল, এই একশত বৎসরে বাঙ্গালীর প্রতিভার অদ্ভুত বিকাশ হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, ইহাতেও বিশিষ্ট জাতিবর্ণ প্রভেদ ছিল না, এই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের ফলে দেশের সাধারণ লোক যাহারা ব্রাহ্মণ্যসমাজে এতকাল নগণ্য ছিল, তাহাদের মনে মনুষ্যত্বজ্ঞানের প্রথম সঞ্চার হয়, তাহার ফলে যে সকল মানসিক বৃত্তি এতদিন নিষ্পেষিত বা সুষুপ্ত ছিল, সেই সকল কিয়ৎপরিমাণে জাগরূক হয়। এ জাগরণ সর্ব্বতো-মুখী হয় নাই। চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম ; সেই প্রেমের অংশটুকুমাত্র জনসাধারণের মনে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল ; তাহার ফলে বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি হয়। এই একমুখী বিকাশও অধিকদিন রহিল না, ধর্ম্ম হিসাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধের বিশেষ কারণ ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে পৌরাণিকধর্ম্ম-আকারে সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বভক্ষক বলিলেও বলা যায়। সকল সম্প্রদায়ই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংঘর্ষে আসিয়া পরিবর্ত্তিত-আকারে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-দেহের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে ; বৈষ্ণবধর্ম্মেরও তাহাই ঘটিল, ইহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একদেশ আশ্রয় করিয়া আজও রহিয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সামাজিক নীতির সহিত ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের নীতির সহিত সংঘর্ষ হইল ; যে নূতন জীবনীশক্তির প্রভাবে বৈষ্ণব-কবিগণের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই বলে দৃপ্ত হইয়া নবজাগরিত বৈষ্ণবসমাজ সকলকে বলিল—

বৈষ্ণব হইয়া যেবা জাতিভেদ করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥

ব্রাহ্মণ্যসমাজের সহিত এই যুদ্ধঘোষণা সফল হয় নাই। বৈদিক-দিগের সহিত বৌদ্ধদিগের যুদ্ধের যে ফল হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যসমাজের সহিত যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যে পরিণাম ঘটিয়াছিল এবারও তাহাই হইল। ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, এবং বৈষ্ণবেরা শীঘ্রই এ পথ পরিত্যাগ করিল। যে যে কারণে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের নিকট পরাজিত হইল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে যাহাই হউক শেষ অবস্থায় নিবৃত্তিমূলক হইয়াছিল। যোগপথ, জ্ঞানপথ এবং অপরাপর অসংখ্য পথ যাহারা বৈদিক ও বৌদ্ধমতের সংঘর্ষে জন্মিয়াছিল সে সকলগুলিই নিবৃত্তি-মূলক ছিল। ইহা একটি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভারতবর্ষে বৈদিক পন্থা ভিন্ন কর্ম্মমূলক কোন সম্প্রদায়ই জন্মগ্রহণ করে নাই। শাক্ত-দিগের মধ্যে বোধ হয় যেন ইহার ইঙ্গিত এক সময়ে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা অদৃশ্য হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তবে পিতা-পুত্রের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা এখন দুরূহ ব্যাপার। অসংখ্য নিবৃত্তিমূলক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যে বিলীন হইয়াছে, এই সকল সম্প্রদায়ের নিবৃত্তি ভাব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বোধ হয়, পূর্ব্ব-সম্বন্ধ-ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এককালে সন্ন্যাসধর্ম্মে পরিণত হয় নাই। নানাসম্প্রদায়সঙ্কুল দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অস্তিত্বের ইহাই বোধ হয় প্রধান কারণ।

চৈতন্যদেব নিজে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দশনামি-শৈবসম্প্রদায়-ভুক্ত একজন সন্ন্যাসীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডের সহিত তাঁহার জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণ্য

ধর্ম্মের চতুরাশ্রমের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না; এক আশ্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন নিষিদ্ধ, মাতার অমতে সন্ন্যাস-গ্রহণ নিষিদ্ধ, স্ত্রী থাকিতে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষিদ্ধ—তিনি এসব কিছুই মানিলেন না। তাঁহার উদাহরণ ও শিক্ষার ফলে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিবৃত্তিমূলক হইল এবং বৈরাগ্যই ইহার প্রথম লক্ষণ হইল।

যেমন যোগিগণের মধ্যে হইয়াছিল, বৈষ্ণবদিগের অবস্থাও সেইরূপ হইল। বৈষ্ণবেরা দুইভাগে বিভক্ত হইল, গৃহী বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। অপর অপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যেরূপ ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও সেইরূপ ব্যভিচার সত্বর দেখা দিল; তাহার ফলে তাহাদের সমাজে স্থান অতি নিম্নে পড়িল। চরিত্রহীন সন্ন্যাসীর যে দুর্দ্দশা ঘটে, তাহাদেরও তাই ঘটিল। গৃহী বৈষ্ণবেরা শীঘ্রই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ্যসমাজের বশে আসিল।

ব্রাহ্মণপূজার ন্যায় মনুষ্যপূজা পৃথিবীর কোনস্থানে নাই, ইহা সকলের বিশ্বাস। খৃষ্টানদিগের মধ্যে তাহাদের প্রধান ধর্ম্মযাজক হইলেন পোপ, এক সময়ে পোপকে খৃষ্টানেরা যেরূপ পূজা করিত তাহা হিন্দুদিগের ব্রাহ্মণ পূজা অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নহে। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করিত যে পোপ ঈশ্বরের পুত্র যিশুখৃষ্টের পার্থিব প্রতিনিধি, এবং তাঁহার হস্তে স্বর্গদ্বারের চাবি থাকে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গুরু-সম্বন্ধে বিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহার উদাহরণ উপরে দেখিয়াছি। পোপদের প্রতি খৃষ্টানদিগের মনের ভাব, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অব্রাহ্মণ দিগের মনের ভাব ও বৈষ্ণবগুরুদিগের প্রতি বৈষ্ণবদিগের মনের ভাব যেরূপ হইয়াছিল, তাহা এক জাতীয় এবং একই কারণে হইয়া-

ছিল। সে কারণটি শিক্ষার অভাব। খৃষ্টান জগতে শীঘ্রই এভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এখন কোন শিক্ষিত খৃষ্টান মনে করেন না যে বাস্তবিকই স্বর্গদ্বারের চাবি আছে এবং সেই চাবি পোপের হাতে আছে। এ কথাটা তাঁহারা এখন রূপকভাবে দেখেন। শিক্ষিত হিন্দুরা এখন ব্রাহ্মণকে বাস্তবিকই ঈশ্বর এ কথা মনে করেন না। কিন্তু বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে পুরাতন ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন আজও হয় নাই। তাহার কারণ সাধারণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রবেশ করে নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের ধর্ম্ম হইল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব প্রায় একশত বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার পর ইহা ক্রমে ক্ষীণতর হইল।

ষোড়শ শতাব্দীতে পাঠানের রাজত্ব গিয়া মোগলের রাজত্ব হইল। রাজা টোডরমল্লের বাঙ্গালাদেশের জমির বন্দোবস্তফলে দেশে জমি-দারদিগের স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় হইল, প্রায় সকল প্রধান জমিদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ তালুকদারেরা হিন্দু ছিলেন; পাঠান দিগের সময়ের জমিদার অপেক্ষা মোগলদিগের সময় জমিদারেরা অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন। দিনাজপুর, নাটোর, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বাঙ্গালার বৃহৎ জমিদারি মোগলদিগের সময়ে স্থাপিত হয়। সেই সময়ে আর এক কাণ্ড ঘটে, বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থসকল বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, "ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ"; সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সেই ভাব রহিল। বিদ্যা-স্থান, বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দেশের ধনশালী ব্যক্তিগণ অর্থ ও আশ্রয় দিয়া অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠ-

পোষক হইলেন। সকল জমিদারেরই আশ্রয়ে পণ্ডিতের সভা থাকিত, তাহাদের মধ্যে যিনি বিদ্যাগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি সভাপণ্ডিত হইতেন। শাস্ত্রীয় বিচার সকল স্থানেই হইত, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ শিষ্যগণের সহিত দেশমধ্যে বিচরণ করিতেন; যেখানেই যাইতেন স্থানীয় পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিতেন এবং জয়পত্রী সংগ্রহ করিতেন। রঘুনন্দনের স্মৃতির ফলে পূর্ব্বে যে সকল আবর্জ্জনা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেখা দিয়াছিল তাহা অনেক পরিমাণে দূর হয়, এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা রঘুনন্দনকে গুরু করিয়া সকলেই তাঁহার স্মৃতি-অনুমোদিত কার্য্য করিতে একতাবদ্ধ হইলেন। দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনফলে ভিন্ন ভিন্ন মেলে বিভক্ত ব্রাহ্মণগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন, মৌলিক শাস্ত্রের শিক্ষা ও বিস্তার দেশমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের ভিতর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে আসিয়া, বৈষ্ণবেরা পরাজিত হইল। কি কারণে এই পরাজয় হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস লিখিবার এ স্থান নয়। এ সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত আর কিছু বলা যাইতে পারে। দুই একটি কথা সকলেরই মনে উদয় হইবে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিক্ষা ছিল, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে যে এককালে শিক্ষার অভাব ছিল তাহা নয়, তবে শাস্ত্রীয় জ্ঞান অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ভক্তিরই অধিকতর প্রাবল্য ছিল। চরিত্রসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ দেশমধ্যে চিরদিনই উচ্চস্থান অধিকার করেন, সন্ন্যাসী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চরিত্রদোষ শীঘ্রই দেখা দিল। কিন্তু যে কারণে ব্রাহ্মণদিগের বিপক্ষে সকল বিদ্রোহ বিফল হইয়াছিল সেই কারণেই

বৈষ্ণববিপ্লব বিফল হইল। বৈদিক ধর্ম্ম হইল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল, এ সময়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য একান্ত অস্পষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ধর্ম্মকে বেদপ্রামাণ্য ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ড বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে কর্ম্মানুষ্ঠান কথন এককালে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম হইল নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈরাগ্যের তারতম্য অনুসারে ধর্ম্মের উৎকর্ষতা লাভ হয়; পরম বিরাগী হইল ভাগবতের লক্ষণ। গৃহে থাকিয়াও বৈষ্ণবগণ ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে এবং বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে, এই ছিল বৈষ্ণব গুরুও সন্ন্যাসীদিগের প্রধান শিক্ষা। যে সকল সম্প্রদায় বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিপক্ষে উত্থিত হইয়াছে সকলেরই ব্রাহ্মণদিগের হস্তে এক পরিণাম ঘটিয়াছে, সকলেই পরাজিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যতই কেন বিকৃত বা অসংস্কৃত হউক না ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই বৈরাগ্য-অবলম্বন, কর্ম্মপরিত্যাগ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ ইহা স্বভাববিরুদ্ধ। যাহা স্বাভাবিক তাহার সহিত অস্বাভাবিকের বিরোধের ফলে অস্বাভাবিকের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল।

নব উত্থিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল তাহা নহে, ষোড়শ শতাব্দী ও তাহার অনেক পরেও শক্তিপূজা দেশ-মধ্যে প্রবল ছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের বীভৎস ধর্ম্ম প্রচলিত না থাকিলেও শক্তিপূজা অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত-আকারে দেশে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম ছিল। তাহাদের মত ও আচার বৈরাগী বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কর্ম্মত্যাগী সংকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবেরা শক্তিপূজকগণের অনুষ্ঠান ও আচার যে অনুকূল নয়নে দেখিবেন

তাহা সম্ভব নয়। উভয় দলের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ছিল, হাতাহাতির অসদ্ভাব হইলেও উভয় দলের গালি বিনিময়ের অভাব ছিল না, এমন কি প্রাচুর্য্য ছিলই বলিতে হইবে। বৈষ্ণবেরা শাক্তদিগকে পাষণ্ড, ব্রহ্মদৈত্য, রাক্ষস, এ সকল কথা বলিতেন, কালীপূজার সহিত কোন রূপ সম্পর্ক রাখা পাপ মনে করিতেন। বৈষ্ণবেরা বিল্বপত্রকে তেফড়কার পাতা নাম দিয়াছিলেন, জবাফুলকে ওড়্ফুল বলিতেন। এই নাম দেওয়া সম্বন্ধে একটু রহস্যও ছিল, শাক্তদিগের উপাস্য দেবতা হইলেন কালী, বৈষ্ণবদের পক্ষে এ নাম মুখে আনা অসম্ভব, সেই কারণে তাঁহারা হাঁড়ির কালিকে বলিতেন ভূষা, আর দোয়াতের কালিকে বলিতেন সিহাই। ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী পাঠানদিগের ফার্সি কথা হইল সিহাই। বেদব্যাসের মাতার নাম মহাকালি; ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন "কালোহি পরমেশ্বরঃ" এই পরমেশ্বরীর নামান্তর হইল কালী। বৈষ্ণবেরা এই নাম উচ্চারণ করিতে এককালে অসম্মত ছিলেন, তাঁহারা ইহার পরিবর্ত্তে মুসলমানদিগের সিহাই শব্দ প্রশস্ত-তর ও পবিত্রতর ভাবিতেন।

ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। ষোল শ আট খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের অনেকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত পুথি লিখিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামানন্দ ঘোষ বলিয়া একজন বৌদ্ধ নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া প্রচার করেন। তিনি নিজের অনুচরদিগকে মুসলমানদিগের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের সহিত একদিকে মুসল-মানদিগের ও আর একদিকে বৈষ্ণবদের সহিত শত্রুতার কারণ ছিল। জগন্নাথের মন্দির রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক স্থাপিত, এবং মন্দিরস্থ

মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিকৃতি বলিয়া এখন সকলে বিশ্বাস করেন। বৈষ্ণবেরা এই মন্দির ও মূর্ত্তি স্বায়ত্ত করেন, "সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা বৈষ্ণবদিগের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাই; এবং তাঁহারা বুদ্ধদেবের জগন্নাথ মন্দিরকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরাভূত শক্তির শেষ শিখা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে জ্বলিয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছিল"—বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য। অপরদিকে মুসলমানদিগের প্রতি বৌদ্ধদিগের ক্রুদ্ধ হইবার অনেক কারণ ছিল, আরাঙ্গজেবের সেনানী এক্রাম খাঁ জগন্নাথমূর্ত্তির দুই চক্ষুস্বরূপ দুইখানি হীরক লুণ্ঠন করেন। তাঁহার হস্তে বৌদ্ধদিগকে আরও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কারণে মুসলমানদিগের বিপক্ষে বৌদ্ধেরা বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করে, যে কারণেই হউক বৌদ্ধধর্ম্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে বাঙ্গালাদেশ হইতে একপ্রকার লোপ পায়। তাহাদের বংশধরগণের সংখ্যা এখন প্রায় তিন লক্ষ, প্রধানত চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধগণকে এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

মোগলদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে নানা কাণ্ড হয়; সম্রাট্ আকবরের সময় কাবুল হইতে আসামপর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্য তিনি বাইশ সুবাতে বিভক্ত করেন, তাঁহার সময়ে যুক্ত গৌড় ও বঙ্গদেশের নাম সুবা বাঙ্গালা হয় এবং অপরাপর সুবার ন্যায় একজন সুবাদারের শাসনাধীন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগঠনের নিমিত্ত এই সুবা বিভাগ বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।

দেশবিভাগ-ব্যতীত মোগলদিগের সময়ে আর এক ঘটনা হয়।

ভারতবর্ষের কতকগুলি অংশে জাতিগঠন হয়, রাজপুত, জাঠ, মহা-রাষ্ট্রীয়, শিখ ও গুর্‌খা এই সকল হিন্দুজাতির অভ্যুদয় হয়। একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রাজপুত ব্যতীত উপরিউক্ত কোন জাতি ব্রাহ্মণ্যসমাজে দ্বিতীয় বর্ণ বলিয়া পরিচয় দেয় না। কৃষিব্যবসায়ী সাধারণ লোক লইয়া এই সকল শৌর্য্যপ্রধান হিন্দুজাতি গঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বর্ণবিভাগ অথবা স্মৃত্যুক্ত বর্ণ-বিভাগ-হিসাবে ইহারা ব্রাহ্মণ্যসমাজের বহির্ভূত বলিলে কথাটা অপ্রকৃত হয় না। তথাপি ক্ষত্রিয়ের যে কর্ম্ম নির্দ্ধারিত আছে ইহারা নিজেই সেই কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষের প্রকৃত অধীশ্বর ছিল। পাঞ্জাবে শিখদের সংখ্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে সে দেশবাসীদিগের মধ্যে শতকরা তের জন মাত্র ছিল। এই অল্পসংখ্যক শিখ কেবল পাঞ্জাবদেশের অধীশ্বর হইয়াছিল তাহা নয়, পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়া বর্ত্তমান পেশোয়ার প্রদেশ পাঞ্জাবের অন্তর্গত করিয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতি লড়্‌লেক্ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজয় করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। গুর্‌খারা আজও নিজেদের স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে। ব্রাহ্মণদিগের সহিত এই পাঁচ জাতির অভ্যুত্থানের কোন ও সম্পর্ক নাই, তথাপি শিখ ভিন্ন এই কয়জাতি ব্রাহ্মণদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নিমিত্ত যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন সেই স্থান তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া আছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্য সমাজনীতি স্মৃতিযুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহার মধ্যে জীবন্ত বলিয়া কোন পদার্থ আছে তাহা কেহ বিশ্বাস করে না। উপরি উক্ত জাতিগুলি নিজেদের স্বাভাবিকগুণে

দেশে উচ্চস্থান অধিকার করে, ব্রাহ্মণেরা সে বিষয়ে তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্যদান করেন নাই। স্মৃতির বিধানানুসারে বোধহয় রাজপুতগণ ব্যতিরেকে সকলেই শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইবার কথা এবং সেই কারণে দাসধর্ম্ম অর্থাৎ সেবাধর্ম্ম তাহাদের একমাত্র আচরণীয়। এই সকল স্মৃতিলিখিত নিয়ম অতিক্রম করিয়া তাহারা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে; ইহা হিন্দুদিগের সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণববিপ্লব ধর্ম্মমূলক, জাঠ বা মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থান সমাজ বা দেশমূলক। বৈষ্ণব অভ্যুত্থান নিবৃত্তিমূলক; এবং বৈরাগ্যই ইহার প্রধান উপাদান। মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতিগণের অভ্যুত্থান প্রবৃত্তিমূলক, কর্ম্মই ইহাদের প্রধান লক্ষণ। বৈষ্ণবধর্ম্ম হইল অস্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত না হইলে কেহ কর্ম্মকে পাপ বলে না এবং এই কর্ম্মের নাশ না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হয় না। আর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-জ্ঞানের প্রথম উদ্রেক হইলেই তাহার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

আমরা এখন বাঙ্গালাদেশে মুসলমান-অধিকার লোপ হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। মহাভারতের সময় হইতে সহস্রাধিক বৎসর হইতে বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্য জানা যায়, তাহা এখন একত্রিত করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পূর্ব্বে যখন সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল বাঙ্গালাদেশেও লোকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অনুসরণ করিত; এবং দেশে চতুর্ব্বর্ণবিভাগ ও চতুরাশ্রম প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্ব-দেশ জয়ের কথা আমরা দেখিতে পাই, সেই সূত্রেই হউক কিংবা অপর কারণই হউক বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করে। মহা-

ভারতে কথিত সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন সমুদ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তই হউন বা না হউন তাঁহারা যে অবৈদিক ছিলেন তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজকদিগের বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ে বাস করিত। অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী আদিশূর বাঙ্গালার বৌদ্ধ রাজাকে পরাজয় করেন। আদিশূর উপাধিধারী আর একজন ব্যক্তি পাঁচজন সাগ্নিক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আনয়ন করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। তাহা হইলে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এককালে লোপ না পাইলেও অতিশয় বিকৃতভাবে ছিল। বৌদ্ধ পালেরা একা-দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের রাজা ছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে দেখা যায় যে, অগণিত বিকৃত বৌদ্ধ ও বিকৃত হিন্দু সম্প্রদায়, জৈন সম্প্রদায়, আরও অনেক সম্প্রদায় দশম ও একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান ছিল। পালবংশীয়দিগের পরে সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন বাঙ্গালার অধীশ্বর হন। আদিশূর যে সকল ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরদিগের মধ্যে নানা প্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আদর্শ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের সংস্কারের নিমিত্ত বল্লালসেন তাহাদের মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশের সকল অংশে কিন্তু এ প্রথা প্রচলিত হয় নাই। যখন পালেরা রাজা ছিলেন তখন বাঙ্গালাদেশে সামন্ত রাজগণ যে সকলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা সম্ভব নহে। হিন্দু সেন-রাজগণের অধীনে ভূঞা রাজগণ বা জমিদারগণ যে অনেকে হিন্দু

হইয়াছিলেন তাহা সম্ভব। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সময় অনেক হিন্দু জমিদার ছিলেন তাহা স্বীকার করা যায়, তবে দেশের জনসাধারণ যে কি ধর্ম্ম অনুসরণ করিত তাহা বলা কঠিন। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সম্প্রদায়সকল বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষে আসিয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের প্রভাব একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং তাহার অনেক পরে পর্য্যন্ত বিশেষ প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একমাত্র পৌরাণিক ধর্ম্ম বোধ হয় প্রচলিত ছিল। বেদের সহিত বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের কি প্রকার ও কতদিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ ছিল তাহা বলা কঠিন।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা যে ধর্ম্মই অনুসরণ করুন না কেন, দেশের জনসাধারণের সহিত তাহাদের অতি অল্পই সম্বন্ধ ছিল। বিশখানি পুরাণ স্মৃতির মধ্যে কোন খানি যে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশের জন্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। বাঙ্গালাদেশে কোন প্রকার স্মৃতি ছিল তাহার প্রমাণ নাই। ভবদেব গঙ্গোপাধ্যায় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, ইঁহার রচিত দশকর্ম্মপদ্ধতি এবং ব্যবহারতিলক এই দুই গ্রন্থকে বাঙ্গালার পুরাতন স্মৃতি বলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালাদেশ হইল ম্লেচ্ছদেশ, সে দেশে যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ব্রাহ্মণ্যপ্রধান দেশেই স্মৃতিগুলি রচিত হইয়াছিল, নবসৃজিত ক্ষত্রিয়গণ এরূপ স্থানে ব্রাহ্মণদিগের সহায় ছিল। ম্লেচ্ছ বাঙ্গালাদেশের নিমিত্ত কেহ যে স্মৃতি সঙ্কলন করিবেন এবং কেহ যে সেই স্মৃতির বিধান মানিবে তাহা সম্ভব নয়। আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছ দেশে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালাদেশে অপর ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু বাঙ্গালার পুরাতন ব্রাহ্মণদিগকে নবাগত ব্রাহ্মণেরা যে বিশিষ্ট

স্থান প্রদান করিতেন তাহা বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় আগন্তুক ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে একমাত্র উপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা দেশের লোক হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। মৌলিক নিয়মানুসারে যাজনকার্য্যে সহায়তা হইল ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম্ম, অব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রদিগের ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণের স্থান নাই। সেই কারণে নানামতাবলম্বী দেশের জনসাধারণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কোন সম্পর্ক রহিল না, তাঁহারা হিন্দু রাজা ও হিন্দু জমিদারদিরের আশ্রয়ে থাকিতেন, ইঁহারাই প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞা বা উপদেশ প্রতিপালন করিতেন। মুসলমানদিগের আক্রমণ সময় এই ভাব ছিল, তখন দেশের লোকসংখ্যা অনুপাতে শতকরা দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সমস্ত ভুঞা রাজাদিগের মধ্যে কতজন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহাও বলা কঠিন। তাহার পর বল্লালসেনকে বাঙ্গালী বলা কতদুর সঙ্গত তাহাও বিবেচনার বিষয়।

১২০৪ সালে যখন পাঠানেরা বাঙ্গালা আক্রমণ করে তখন দেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। ১৫৭৩ সালে পাঠান রাজত্ব লুপ্ত হয়। বাঙ্গালাভাষা ও হিন্দুধর্ম্ম এবং বাঙ্গলাসাহিত্য যাহা পূর্ব্বে ছিল না বলিলেও চলে—পাঠানদের রাজত্বকালে প্রায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশের প্রতিকুটীরে হরিনাম প্রবেশ করে, যে সকল বিকৃত ও অসংস্কৃত ধর্ম্ম ছিল, তাহারা সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের আকার ধারণ করিতেছিল। সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থের বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, সংস্কৃতশিক্ষা দেশমধ্যে বিস্তার হইতেছিল। রঘুনন্দনের স্মৃতির ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও

সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিল। নূতন প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হয়, বৈষ্ণবসাহিত্য এই সময়ে পূর্ণাবয়ব ও পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মোগলদের অধিকারে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই, বৈষ্ণবেরা ক্ষীণ-বল হইয়া আসিতেছিল, চৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র প্রথম বৈষ্ণবদিগের আদর্শস্বরূপ ছিল; সেই আদর্শ একশত বৎসর রক্ষিত হইয়াছিল। তাহার পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সমাজে নানা-প্রকার দুর্ব্বলতা দেখা দেয়, সেই সকল ব্যভিচারের ফলে বৈষ্ণব-সমাজ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রেমমূলক সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রবেশ করিলে যে ফল হয় তাহাই হইল। পুরাতন বিকৃত ও সঙ্কর ধর্ম্মগুলির স্থলে বাঙ্গালাদেশের প্রতিঘরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবেশ করিল, যদিও তাহা সত্য, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের বিশুদ্ধতা ও শক্তি আর রহিল না।

যে অনুপাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের শক্তি হ্রাস হইতেছিল, সেই অনু-পাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শাস্ত্রের অনুশীলন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হিন্দু জমিদারগণ সকলেই ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানব্যতীত ব্রাহ্মণ-দিগের বিমল চরিত্র চিরদিনই প্রসিদ্ধ। তান্ত্রিক, শাক্ত ও বৈষ্ণব-দিগের বীভৎসতা ও কলুষতা হইতে ব্রাহ্মণেরা চিরদিনই দূরে থাকিতেন। কোন সম্প্রদায়েরই দুরাচার বা ব্যভিচার দোষ ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। তাহার পর রঘুনন্দনের স্মৃতি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একতাবন্ধনের একটি প্রধান উপায় হইল। অষ্টাদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশমধ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যশাসন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইল।

মুসলমানেরা পাঁচ শত বৎসর বাঙ্গালাদেশে রাজত্ব করে, এই সময়ের মধ্যে কোটি কোটি হিন্দুকে মুসলমানেরা স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করে, তাহাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণও ছিল। মুসলমানদিগের হস্তে এমন নির্য্যাতন নাই যাহা হিন্দুদিগকে সহ্য করিতে হইত না, এমন দিন নাই, এমন স্থান নাই যেখানে হিন্দুরা লাঞ্ছনা না ভোগ করিত। নৃসিংহদেব ও রাজা গণেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণের চেষ্টায় একজন হিন্দুরাজা, মুসলমান রাজাকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের কবল হইতে হৃতরাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা একটি আশ্চর্য্যের বিষয়। বিদেশীয় ইতিহাসলেখকগণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে দুই একটি স্থানে ভিন্ন নিজ দেশ জাতি এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণেরা কখনও কোনপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন বা কাহাকেও উৎসাহ দিয়াছেন এমন উদাহরণ নাই। বৈদিকধর্ম্ম রক্ষা করিতে (গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত), বর্ণসঙ্কর নিবারণের নিমিত্ত চতুর্ব্বর্ণ অস্ত্রধারণ করিবে, এই কথা মহাভারতে অগণিত স্থানে লিখিত আছে। পিতাই হউক আর গুরুই হউক যে কেহ মোক্ষপথের বিরোধী হইবে তাহাকে বধ করিবে, যদি বর্ণসঙ্করের আশঙ্কা থাকে চতুর্ব্বর্ণ অস্ত্র গ্রহণ করিবে, স্ত্রীলোককে সদা রক্ষা করিবে, আততায়ীকে বধ করিবে, এই সকল কথা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সে সময়ে এই সকল কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-মধ্যে পরিগণিত হইত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী যদি মহাভারত লিখিবার সময় হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে এই

প্রকার শিক্ষা দেশ হইতে লোপ পায়? মহম্মদঘোরীর পরে একাধিক মুসলমান সেনানায়ক ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন। তিমূরলাং, বাবর, নাদিরশাহ, আমেদসাহ আবদালী প্রভৃতি মুসলমান-গণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, হিন্দু রাজগণ ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত দেশরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ যে কাহাকেও সে কাজে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। যখন আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন এ দেশ বৌদ্ধ ছিল। একতাবদ্ধ ভারতবাসীদিগের সহিত সংগ্রামের ফলে আলেক্‌জাণ্ডারকে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা হইতে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কবে বাল্মীকি রামচন্দ্রের মুখে বলিয়াছিলেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" —তাহা বলা যায় না, সম্ভবত ইহার সময় খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী। মহাভারতের সময় অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে চতুর্ব্বর্ণ মিলিয়া অর্থাৎ দেশে সকলে মিলিয়া বিধর্ম্মীদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে ইহাই নিয়ম ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীকে স্মৃতিযুগের আরম্ভ বলা যাইতে পারে। দশম শতাব্দীতে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই পাঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ-দিগের যে শিক্ষা ছিল, দশম শতাব্দীতে সে শিক্ষার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কি কারণে ও কোন সময়ে পূর্ব্ব নীতি লোপ পায়?

ভারতবাসীদিগের যুদ্ধস্পৃহা নাই; এই কথা অপর দেশবাসীরাও

বলে; কথাটা অসত্য নয়। এ স্পৃহা কোন সময় বা কি কারণে লোপ পাইল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই, তবে দেশে ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতি অনুসন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। সম্রাট্ অশোকের সময়ে ভারতীয় সৈন্য ভারতবর্ষের বাহিরে অনেক দেশ আক্রমণ ও জয় করে, সে হইল তিনশত বৎসর খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের কথা। মহাভারতের সময়ে অর্থাৎ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে যজ্ঞ লইয়া বৈদিক ও অবৈদিকদিগের মধ্যে মহা বিরোধ চলিতেছিল। প্রধানত যজ্ঞে পশুহিংসা এই বিরোধের কারণ হয়, এ বিরোধের ফল পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ফল কথা জীবহিংসাকারীদিগের পক্ষ সমর্থিত হইল না। বৌদ্ধদিগের অহিংসা পরমো ধর্ম্ম বৈদিকেরা গ্রহণ করিলেন, জ্ঞান ও যোগ-বাদীদিগের জপযজ্ঞ, মনোযজ্ঞ, বাক্‌যজ্ঞ, শ্রদ্ধাযজ্ঞ বৈদিকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিল। এমন সময় হইল ব্রাহ্মণেরা অবৈদিক ক্ষত্রিয়-দিগকে হিংসাব্যঞ্জক সিংহ উপাধি দিলেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বোধ হয় দেশের লোকের ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও নিবৃত্তি-মূলক হইল। এবং সেই সময়ে অথবা তাহার কিছু পরে হইতেই ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণ হইতে পৃথক্ হইল। স্মৃতিযুগে শূদ্রদিগকে শিক্ষাদান অধর্ম্মের মধ্যে পরি-গণিত হইল, তাহাদের পক্ষে একমাত্র শিক্ষাদাতা রহিল সন্ন্যাসিগণ। সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের উপদেশ নিবৃত্তিমূলক, নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য দেশকে বৈরাগ্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। মহা-ভারতে কর্ম্ম করিব, না কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, গৃহে থাকিব, না সন্ন্যাসী হইব, প্রবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করিব, না নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করিব এই লইয়া দেশে ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। এ বিরোধের সন্ধি মহাভারতমধ্যে গীতাতে আছে, কিন্তু এ সন্ধি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-

দিগের অন্ততঃ ত্রিবর্ণিকের পক্ষেই উপযোগী। যজ্ঞ (কর্ম্ম) হীন শূদ্র, শূদ্রসদৃশ বৈশ্য এবং অবৈদিক ক্ষত্রিয়দিগের এ সন্ধিতে বিশেষ কিছু লাভ হইবার কথা নহে। বৈরাগ্য ও নিবৃত্তি-প্রধান ধর্ম্মে যুদ্ধস্পৃহা সম্ভব নহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে বাঙ্গালার চিত্র আমরা দেখিয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তের অপর অংশে ক্ষত্রিয় অথবা ক্ষত্রিয়সদৃশ রাজপুত ছিল। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তখনও সে জ্ঞান লোপ পায় নাই, পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতেই পূর্ব্বদেশবাসিগণ শূদ্র ইহা স্থির হইয়াছে, বাঙ্গালীরা শাস্ত্রমতে সকলেই ক্ষত্রিয়, তবে বাঙ্গালাদেশে দ্বিতীয় বর্ণ কোন্ সময়ে ছিল তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালাদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই, তাহা হইলে মুসলমানদিগের আক্রমণসময় বৈরাগ্য ও নিবৃত্তি ছিল দেশের লোকের শিক্ষা, পরে বৈষ্ণবেরা বৈরাগ্যকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, জাঠ, গুর্খা ইহাদিগের উত্থান স্মৃতিকথিত বিধানের বিরোধী। ব্রাহ্মণদিগের অনুশাসন, সন্ন্যাসীদিগের অনুশাসন, বৈষ্ণব গুরুদিগের অনুশাসন লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালীদের কখন হয় নাই, এ সম্বন্ধে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বহুদিন হইতে লোপ পাইয়াছিল।

ইংরেজ-অধিকার ও তাহার প্রতিঘাত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করে, তখন বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যেরূপ প্রতাপ ছিল, দেশমধ্যে পূর্ব্বে কখনও সেরূপ প্রতাপ হয় নাই। পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশের এক কোণে অবশিষ্ট রহিল; চৈতন্য-

দেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্তর্গত হইল। তান্ত্রিক ও শাক্তগণের ধর্ম্ম রামপ্রসাদ সেনের হস্তে বৈরাগ্যমূলক হইল, এবং পূজকদিগের বৈষ্ণবদিগের ন্যায় পৃথক্ সম্প্রদায় রহিল না। পুরাতন গ্রাম্য দেবতাসকল ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক দেবতার রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গালীসমাজে ব্রাহ্মণের শক্তি পূর্ব্বে কখন এরূপ প্রবল হয় নাই; রঘুনন্দনের স্মৃতি হইল ব্রাহ্মণের শাসনদণ্ড। বাঙ্গালাদেশে তখন প্রায় সকল জমিদার হিন্দু ছিলেন, ব্রাহ্মণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সকলেই শ্লাঘা মনে করিতেন। দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, এই সকল ছিল ব্রাহ্মণদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়, পৌরাণিক ধর্ম্মই ছিল একমাত্র দেশের লোকের আচরণীয় ধর্ম্ম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত এই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কালে বাঙ্গালাদেশের পুরাতন জমিদার-দিগের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়। এখন তাহারা বেতনভোগী তহশীলদার না হইলেও, নির্দ্দিষ্টহারে উপসত্ত্বভোগী ইংরেজ কর্ম্মচারী-দিগের আজ্ঞাধীন রাজস্ব-সংগ্রহকারীর দল হইলেন এবং পূর্ব্বে দেশমধ্যে তাঁহাদের যেরূপ প্রতিপত্তি ছিল ও যে সকল স্বত্ব এবং অধিকার পূর্ব্বে তাঁহারা উপভোগ করিতেন সে সকলের ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল। ইংরেজ-অধিকার-ফলে আর একশ্রেণী সম্পত্তিশালী লোক দেখা দিল। সে সময়ের প্রধান প্রধান ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের এক একজন করিয়া দেশীয় লোক মুন্সী বা দেওয়ান থাকিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে এই শ্রেণী লোকের বিশেষ রূপে উন্নতি হয়। ইংরেজ রাজসরকারে ইঁহাদের উচ্চস্থান ছিল, এখন তাঁহারা বিদ্যা, ধন ও পদমর্য্যাদায় দেশমধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কায়স্থবিভাগ-ভুক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে কয়জন প্রধান জমিদার ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেবল দিনাজপুরের জমিদার কায়স্থ ছিলেন, নাটোর, ও নদীয়ার জমিদার ব্রাহ্মণ এবং বর্দ্ধমানের জমিদার ক্ষত্রিয় ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুরাতন জমিদারশ্রেণী এক প্রকার বিলুপ্ত হইল, বাঙ্গালাদেশ কায়স্থপ্রধান হইল; কলিকাতা প্রধানতঃ কায়স্থনগরী। এই সময়ে কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কায়স্থেরা বলিতেন, যে কায়স্থ দাস নয় সে কায়স্থ নয়। ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞাপালন করিতে তাঁহারা গৌরব মনে করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীদের অবস্থা অতিশয় হীন হয়। ১১৭৬ সালে যে চিরস্মরণীয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়, তাহার ফলে দেশের পাঁচ আনা ভাগ লোক অর্থাৎ প্রায় আশীলক্ষ নরনারী, শিশুবৃদ্ধ আহার অভাবে বিনষ্ট হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত এই ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসরে পুরাতন বাঙ্গালাদেশ ধ্বংস হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাঙ্গালীদের নষ্টপ্রায় জীবনীশক্তির পুনর্বিকাশের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়। মহাত্মা রামমোহন রায় বাঙ্গালীদিগের পুনর্জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ন্যায় রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের, কোন পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার পূর্ব্বে এমন কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি কোন অংশে তাঁহার সদৃশ

ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দেশের লোক অমানুষিক যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল, তাহার সহিত রামমোহন রায়ের জন্ম বা জীবনের কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। চৈতন্যদেবের সহিত রামমোহন রায়ের আর এক সাদৃশ্য আছে। ইউরোপীয়গণ যে বৎসর জলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে, তাহার পাঁচ বৎসরের মধ্যে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়, আর ইংরেজদিগের বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তির দশবৎসর মধ্যে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন, উভয়েই বাঙ্গালাদেশের যুগপ্রবর্ত্তক ছিলেন। মনে হয় হিন্দু বাঙ্গালীজাতির রক্ষার নিমিত্ত এই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল।

সকল বিষয়েই রামমোহন রায় বাঙ্গালাদেশে নবজীবনের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁহার বহুমুখী কর্ম্মনিষ্ঠার আলোচনার এ স্থান নয়; তবে তৎকালে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের সংঘর্ষে আসিয়া তাঁহার যে দুর্গতি হয়, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন হইবে না। একর্ম্ম করিতে পূর্ব্বে যিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারই পতন হয়, রামমোহন রায়ের অদৃষ্টেও সেই ফল ঘটিল। তখন বাঙ্গালাদেশে সতীদাহ হইত, ব্রাহ্মণেরা এসম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। এরূপ হইবার তাহাদের যথেষ্ট কারণ ছিল, স্ত্রীলোক বিধবা হইলে আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অথবা সহমরণ এই দুইয়ের অন্যতর হইল স্মৃতির বিধান। রামমোহন রায় এই প্রথা উঠাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; সেই সময়ে হিন্দুদিগের ভিতর একজন কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার আশ্রিত ও অনুগত ছিলেন, এবং তিনিও ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞাপালন ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। সতীদাহ প্রশ্নে যদি একপক্ষে রামমোহন রায় থাকিতেন

অপরপক্ষে যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা থাকিতেন তাহা হইলে সতীদাহপ্রথা, বলা বাহুল্য, কখন নিবারিত হইত না। রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ও আগ্রহাতিশয্যে তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্ত্তা সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে বিধি প্রণয়ন করেন, এবং সেই রাজকীয় দণ্ড-ভয়ে ঐ প্রথা নিবারিত হয়। সতীদাহ প্রশ্ন ভিন্ন অপর কারণেও রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরাগভাজন হন। বাঙ্গলাদেশে বেদ ও বেদপাঠ কবে লোপ পাইয়াছে তাহা কেহ জানে না; বেদের রহস্যের নাম উপনিষদ্, রামমোহন রায় সেই উপনিষদ্-অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। পুরাণপরিষিক্ত দেশাচার-প্রতিপালক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্মণ্য সমাজ হইতে বিতাড়িত করিলেন—রামমোহন রায় অহিন্দু হইলেন।

ইংরেজ-আঘাতের ফলে প্রতিঘাতস্বরূপ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য; তবে এই মাত্র বলিলে কথাটি অসম্পূর্ণ হইবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের অধিকারফলে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, সমাজনীতি বা শিক্ষা ইহাদের সহিত ইংরেজদিগের ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও শিক্ষার কোনপ্রকার সংঘর্ষ হয় নাই, তখন তাহারা সাম্রাজ্যস্থাপন, রাজস্ব-আদায় এবং বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত ছিল। আঠার শ' তের খৃষ্টাব্দে প্রথমে খৃষ্টান পাদ্রিরা এ দেশে আসিয়া তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইংলণ্ড-গভর্ণমেণ্ট্ হইতে অনুমতি পায়। তাহার পূর্ব্বে চুঁচুড়া শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে, যেখানে ইংরেজদিগের অধিকার ছিল না, খৃষ্টান পাদ্রিরা এ দেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যে আড্ডা খোলে। সেই উদ্দেশ্যে

শ্রীরামপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি ইংরেজ পাদ্রি গুটিকতক বাঙ্গালা স্কুল খুলিয়াছিল। এই সকল স্কুলে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা অতি সামান্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই বাঙ্গালীরা আপনাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজেরা স্কুল ও কলেজ খুলিতে সঙ্কল্প করেন। তাহার ফলে ১৮১৭ সালের আরম্ভে বাঙ্গালীরা নিজেদের মধ্যে একলক্ষ তের হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপন করেন। আঠার শ তেইশ সালে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তথায় কেবল ব্রাহ্মণ বালকেরা পড়িতে পারিত, এবং মৌলিক প্রথা অনুসারে সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ান হইত; যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষার স্থলে পাশ্চাত্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার জন্য রামমোহন রায় অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা দেওয়া তৎকালে ইংরেজদিগের অভিমত ছিল না। ১৮৩৩ সালে রাজকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ইংলণ্ডস্থিত গভর্ণমেণ্ট ইংরেজি শিক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের সংগৃহীত রাজস্ব হইতে সাহায্য প্রদান করিতে স্থির করেন, পলাশী ব্যাপারের আটাত্তর বৎসর পরে ইংরেজেরা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার নিমিত্ত দেশের রাজস্ব হইতে প্রথমে সাহায্য দেন। আঠার শ চল্লিশ সালে তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্ত্তা প্রচার করিলেন যে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে দেশীয় লোকেরা সরকারের অধীনে চাকরি পাইবে। এই সময়ে পাদরিরা, এবং দেশীয় লোকদিগের প্রদত্ত চাঁদা লইয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা বিহারের নানাস্থানে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুল ও কলেজ খুলে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালীদের চেষ্টায় ও অর্থে এই সময়ে দেশমধ্যে অসংখ্য ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়; উপরে

১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ-স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে, ১৮১৮ সালে কাশীতে ইংরেজী কলেজ খুলিবার নিমিত্ত জয়নারায়ণ ঘোষাল চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিশ্ববিত্যালয় স্থাপিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালীদের ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত পরিচয় হয়, ১৮৩০ সালের পর হইতে এই পরিচয়ের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতির শিক্ষা এবং পাদ্রিদিগের উত্তেজনা, অপর দিকে পুরাণষিক্ত স্মৃতিশাসিত জাতিভেদ-জর্জ্জরিত দেশাচারনিষ্পেষিত জীবনহীন বাঙ্গালী ছাত্র; এই সংঘর্ষের যাহা অনিবার্য্য ফল তাহাই ঘটিল। দলে দলে বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকেরা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। দেশের পুরাতন আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ইংরেজী আচার ব্যবহার অবলম্বন করিল, পুরাতন যাহা কিছু ছিল পান ভোজন শিষ্টাচার এমন কি ভাষাপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। সকল বিষয়ে পুরাতন বর্জ্জন করা ও ইংরেজদের অনুকরণ করা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত নূতন দলের নিয়ম হইল।

এ ভাব প্রায় বিশ বৎসর থাকে। এ শ্রেণীর নাম ছিল যুবক বাঙ্গালী দল। এই যুগকে মর্কট যুগ অথবা অনুকরণ যুগ বলা যায়। তাহার পর দেশে আর এক নূতন শ্রেণী দেখা দেয়। আঠারশ পঞ্চাশ সালের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালীদের প্রতিভাবিকাশের যুগ আরম্ভ হয়। যাহারা প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ইংরেজদের সংঘর্ষে আসিয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই সেই আঘাতের ফলে মোহাচ্ছন্ন ও অবশ

হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে শ্রেণী দেখা দেয়, তাঁহারা ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত ছিলেন। অভিভূত বা মুগ্ধ করা দূরে থাক্, পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহাদিগকে দাসভাবে সেবা করিল, সকলদিকে বাঙ্গালীদের সুষুপ্ত প্রতিভা জাগরিত হইল। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্ত ; ধর্ম্মশিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ; সামাজিক শিক্ষকতায় ভূদেব, রাজনারায়ণ, অক্ষয়চন্দ্র ; দেশহিতৈষিতায় রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র ; বাঙ্গালার ইতিহাসে এই সকল নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ প্রতিভাশালী এত অধিক সংখ্যায় লোক পৃথিবীর কোন দেশে জন্মে নাই। এই যুগের নাম প্রতিভাবিকাশ। আঠারশ পঁচাশী সালে বাঙ্গলাদেশে জাতীয়তা যুগের আরম্ভ হয়, সে যুগ এখনও চলিতেছে।

ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে একশত বৎসরে যে ফল হইয়াছিল তাহা উপরে সংক্ষেপে লিখিত হইল। সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে ও হিন্দুধর্ম্মে এ সংঘর্ষের ফলে একশত বৎসরে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা বলিতে অধিক সময় প্রয়োজন হয় না। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা যাহারা নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মৌলিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ এ সংঘর্ষফলে কিছুমাত্র বিচলিত বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। উপরে যাঁহাদের নাম লিখিত হইয়াছে রামকৃষ্ণ পরমহংস ব্যতীত সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে পরমহংস সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মশিক্ষক অনেক সময়ে দেখা দিয়াছেন ; প্রায়ই দেশের সাধারণ লোক তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে

অনেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনকয়েকমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যসমাজের সহিত সংঘর্ষে আসেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইলেন রামমোহন রায়, তাঁহার কথা উপরে বলিয়াছি, তাঁহার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুল্য পণ্ডিত সেই সময়ে দেশে অতি অল্পই ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে পাঠ শেষ করিবার কিছু পরেই সেই কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার সময়ে তাঁহার সদৃশ উচ্চমনা ব্যক্তি দেশে ছিল কিনা তাহাও সন্দেহ। ব্রাহ্মণ্য সমাজে ব্যভিচার, বিশেষ বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার মনে যেরূপ আঘাত লাগিয়াছিল সেরূপ পূর্ব্বে আর কখন বাঙ্গালাদেশে কাহারও মনে লাগে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি জানিতেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তাঁহার মনের কিছুমাত্র বিকার হয় নাই, তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যসমাজের আবর্জ্জনা দূর করিতে তিনি জীবনপাত করেন, তিনি মৌলিকশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে দেখাইয়া দেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে তিনি সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা এক কালে বিফল হইল। সহস্রবৎসরব্যাপী অজ্ঞতা এবং কুশিক্ষার নিকট তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এককালে বিফল হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের মর্ম্মভেদী শেষকথা "ধন্যরে দেশাচার", তিনি বলিলেন "যদি দেশের লোক শাস্ত্র জানিত অথবা শাস্ত্রে বিশ্বাস করিত তাহা হইলে আমার কথা তাহারা শুনিত।"

শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া রামমোহন রায়ের যে দুর্গতি হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও তাহাই হইল, তিনিও ব্রাহ্মণ্য সমাজ হইতে বিতাড়িত হইলেন। রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের বিধান লইয়া শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের হস্তে তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরাভব হয়। যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা যাবজ্জীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ব্রাহ্মণশাসিত বাঙ্গালা সমাজ পূর্ব্বেও যেভাবে ছিল পরেও সেইভাবে রহিল।

বাঙ্গালী জাতির শিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার সমান তাঁহার সময়ে কেহ ছিল না। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের সদৃশ না হইলেও তাঁহার সংস্কৃতভাষায় পারদর্শিতা যথেষ্ট ছিল। সমাজ কিংবা ধর্ম্ম লইয়া তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের সহিত কোন প্রকার বিরোধ বা বিচার করেন নাই, তিনি দেশমধ্যে নূতন এক শিক্ষা প্রচার করেন, তাহার নাম দেশভক্তি। একথা পূর্ব্বে কখন এদেশে কেহ প্রচার করে নাই। ইহার সহিত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের বিরোধের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ দেশহিতৈষিতা বলিয়া কোন পদার্থ আছে তাহাদের মনে কখন উদয় হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি আর কাহারও ছিল কিনা তাহা সন্দেহ, হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি ও দেশভক্তি তাঁহার নিকট একই ছিল। বঙ্কিম আনন্দমঠের ডাকাতের মুখে বলিলেন "আমাদের দেশই দেবতা, আমরা অন্য দেবতা জানি না"।

শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি, ব্যক্তিগত চরিত্র, এ সকল

তাঁহার নিকট মাতৃপূজার উপযোগী ও সেই কারণে অনুশীলনের সামগ্রী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও সহিত বিচার বা তর্ক করেন নাই, শিক্ষার নিমিত্ত তিনি নূতন এক উপায় আবিষ্কার করেন, তাঁহার যাহা বলিবার ছিল প্রধানতঃ গুটিকতক উপকথার দ্বারা তিনি তাহা বলিলেন। দেশের লোক এতদিন ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের তর্ক ও বিচার শুনিতেছিল, তর্ক ও বিচারের দ্বারা তাহাদের মনের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দেশাচার ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের শাস্ত্র ও পৌরাণিক উপকথা ইহাই ছিল দেশের লোকের একমাত্র ধর্ম্ম শিক্ষার উপায়। পণ্ডিতদিগের বিচারের ফলে কাহারও কখনও মত পরিবর্ত্তিত বা গঠিত হয় নাই, আর তর্কের ফলে সহস্রবর্ষব্যাপী দেশাচার বা ব্যক্তিগত আচার কেহ কখন পরিত্যাগ করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে পথে গিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কখন সে পথে যায় নাই, তাঁহার নিকট হইতে দেশের লোক এক নূতন ভাষা পাইল; বাঙ্গালীরা প্রথমে আদর্শ বাঙ্গালী পুরুষ ও আদর্শ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি দেখিল, আরও দেখিল যে এই আদর্শ স্ত্রী ও পুরুষ সকল বাঙ্গালীর গৃহে আছে। বাঙ্গালীর গৃহ যে পুণ্যময় স্থান, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে তাহা বাঙ্গালীকে দেখাইয়া দিলেন। যে জাতির মধ্যে জন কয়েক ভিন্ন সকলেরই নাম দাস, তাহারা প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষায় বাঙ্গালী গৃহস্থ জীবনের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা ও দেশপ্রেম অনুভব করিতে শিখিল। দেশ-পূজায় ব্রাহ্মণশূদ্রের সমান অধিকার, এই দেশপূজা বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তন করেন, বাঙ্গালাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপূজার প্রবর্ত্তক।

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

ইঁহারা তিনজনই ব্রাহ্মণবিভাগের অন্তর্গত ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন বৈদ্যপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাঙ্গালাদেশের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। যে সকল বাঙ্গালীদিগের চেষ্টায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয় রামকমল সেন তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিস্তারের নিমিত্ত তিনি সমস্ত জীবন চেষ্টা করেন। অপরদিকে তাঁহার ন্যায় ভক্ত বৈষ্ণব সে সময়ে অতি অল্পই ছিল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে তাঁহার মাতৃভাষার উপর ভক্তির, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের হ্রাস হওয়া দূরে থাক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেন পিতামহের দুই গুণই পাইয়াছিলেন ; তবে তিনি হরি না বলিয়া ব্রহ্ম বলিতেন। তাঁহার নিকট "হরে র্নামৈব কেবলম্" না হইয়া "ব্রহ্ম নামৈব কেবলম্" হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ কেবল-মাত্র ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সেন পাশ্চাত্য দেশের যাহা কিছু ভাল স্বদেশে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদের ভক্তির সহিত পাশ্চাত্যদিগের কর্ম্ম-লিপ্সা মিল খায় না, দেশের জনসাধারণের নিকট হরিনাম, হরিভক্তি হরিসংকীর্ত্তন এ সকলের সহিত বৈরাগ্য ও কর্ম্মত্যাগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কর্ম্মব্যস্ত পাশ্চাত্যগণের সহিত ভক্তির বিশেষ পরিচয় নাই, সেই কারণে দেশের জনসাধারণ ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণ ভাল বুঝিতে পারিল না, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহাকে সম্মান করিল। কেশবচন্দ্রের অগাধ পাণ্ডিত্য, বিমল চরিত্র, সৎশিক্ষা, কর্ম্মলিপ্সা ও প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি তাঁহার সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজমধ্যে গাঢ়রূপে প্রবেশ করে। ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভে দেশে শিক্ষিত যুবকগণের

মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ হইয়াছিল প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষার ফলে সেই স্রোত অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম ও সমাজ ক্ষেত্রে আরও জনকয়েকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র দত্তের বংশের মধ্যে সকলেই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদেরই গোষ্ঠী স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। রমেশচন্দ্রের মন ইংরেজী শিক্ষায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল, আচার ব্যবহারে তিনি ইংরেজের সদৃশ ছিলেন কিন্তু স্বজাতি ও স্বদেশের ও স্বধর্ম্মে ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্মের মূল হইল বেদ, এই বেদের সহিত পরিচয় না হইলে পুরাণে লুক্কায়িত হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কেহ বুঝিবে না। এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের নিকট বেদ বলিয়া নামমাত্র এক গ্রন্থ ছিল; বেদ কি পদার্থ ও তাহার মধ্যে কি আছে একথা বাঙ্গালাদেশে কেহ জানিত না। দেশের লোকদিগকে বেদের পরিচয় প্রদান করিতে রমেশচন্দ্র সঙ্কল্প করেন। ঋগ্বেদের কিংয়দংশ মূল ও তাহার সায়নভাষ্য বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া রমেশচন্দ্র প্রকাশ করেন, তাঁহার আশা সফল হয় নাই। মহাভারতে লিখিত আছে, বেদের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ কেহই নাই, সে হইল দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। সময়ে খুব সম্ভব এদেশে পুনরায় লোকে বেদ পড়িবে; এই ইচ্ছা রমেশচন্দ্রের মনে প্রথমে উদয় হইয়াছিল এবং যাহাতে স্বদেশের লোক বেদ পড়িতে পারে তিনি সেই বিষয়ে তাঁহার যতদূর সাধ্য ছিল চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার ঘোষ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক এবং রাজনীতিক্ষেত্রে

একজন নির্ভীক লেখক বলিয়া দেশের লোকের নিকট পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফল অনেকগুণ অধিক হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সহকর্ম্মিগণ ও তাঁহার আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সকলেই জ্ঞান ও চরিত্রগুণে দেশে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা ও বৈষ্ণবদিগের উন্নত চরিত্র এ সকলেরই পতন হয়, সময়ে নানাপ্রকার ব্যভিচার বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করিল। গৃহী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই সকল ব্যভিচার প্রবেশ না করিলেও সন্ন্যাসী বৈষ্ণবেরা নিজেদের দোষে সমাজে অতি নিম্নস্থানে পতিত হইল এবং তাহাদের চরিত্র ও ব্যবহারের নিমিত্ত দেশের শিক্ষিত লোকদিগের চক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ সম্মানের সামগ্রী রহিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালীদের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপহাস ও ঘৃণার সামগ্রী ছিল। শিশিরকুমার সেই পঙ্কিল ও অধঃপতিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত অমিয় নিমাই চরিত পড়িয়া ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা চিনিতে ও বুঝিতে শিখিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মন একটি অস্ফুটভাবের প্ররোচনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; এইরূপ চঞ্চলতা এদেশে পূর্ব্বে কখন দেখা দেয় নাই। উহা ইংরেজী শিক্ষার ফল, কিংবা ইংরেজী শাসননীতির ফল কিংবা কালধর্ম্ম, অথবা এই ত্রিতয়ের সংমিশ্রণে জন্মিয়াছিল তাহা বলা কঠিন। জাতি, ধর্ম্ম ও

দেশ চিরদিনই ছিল, কিন্তু স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম বলিয়া এ সকল কথা এ দেশের লোকেরা কখন ভাবে নাই, ভাবিলেও তাহাদের মন এসব চিন্তায় কখন বিচলিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে এই চিন্তা প্রথমে দেখা দেয়।

রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণ নিজেরা না জানিয়া দেশের লোকদিগকে এই পথে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পথপ্রদর্শক, তিনি দেশের লোকদিগকে অনুশীলন ও সাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ উভয়ই কর্ম্মমূলক, নিবৃত্তি ও বৈরাগ্যসিক্ত দেশ হইতে কর্ম্ম বহুদিন লোপ পাইয়াছিল; সহস্র বৎসর হইতে দেশের লোকের চক্ষে কর্ম্ম, ধর্ম্মের বিরোধী এই জ্ঞান দৃঢ়মূল হইয়াছিল। এখন নূতন জাতীয়তার আবেগে দেশের লোক কর্ম্মের কথা মনে করিল। বেদলুপ্ত দেশে কর্ম্মের গৌরব, শেষ ভগবদ্গীতায় কীর্ত্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতা শিক্ষিত-সমাজের নিকট পরিচিত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু যাঁহার শিক্ষাফলে ইংরেজীশিক্ষিত যুবকসমাজ গীতা-উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিল তাঁহার নাম বিবেকানন্দ স্বামী। তাঁহার শিক্ষায় ধীরে ধীরে জাতীয়তার জ্ঞান ও জাতীয়তার তৃষ্ণা দেশমধ্যে প্রবেশ করিল। জাতীয়তা কর্ম্মসাপেক্ষ, কর্ম্মের গৌরব ও পবিত্রতা গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা। দেশের যুবকদল বিবেকানন্দ স্বামীর নিকট হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিল। বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তা লইয়া এ দেশে শিক্ষিতসমাজে যে চঞ্চলতা হইয়াছে, তাহা গীতার শিক্ষার ফল, প্রধানতঃ বিবেকানন্দ স্বামীর চেষ্টায় নব চিন্তায় চঞ্চল দেশের লোক গীতাকে আদর করিতে শিখিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে

জন্মিয়াছিলেন এরূপ আরও অনেক মহাপুরুষের নাম লিখিতে পারা যায়, কিন্তু যাঁহারা এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিত আছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার এখনও সময় হয় নাই।

প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর হিন্দু বাঙ্গালীরা বিদেশীয় ও অহিন্দু-দিগের দাসভাবে আছে। সাড়ে পাঁচ শত বৎসর মুসলমানদিগের অধীনতাকালে এমন নির্য্যাতন নাই যে মুসলমানদিগের হস্তে হিন্দু-দিগকে না ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহারা হিন্দুদিগকে বল-পূর্ব্বক মুসলমান করিত, হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতিমা ভাঙ্গিত দেবমন্দির ভূমিসাৎ করিত, হিন্দুদিগকে হত্যা করিত, তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ করিত, তাহাদিগকে জীবন্ত কবর দিত; তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত, স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করিত; হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে মুসলমাম করিত, কখন বা বিবাহ করিত, কখন বা দাসীভাবে রাখিত। দেশের রাজস্ব নিজেরা উপভোগ করিত, হিন্দুরা তাহাদের অধীনে দাসভাবে চাকরি করিত। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর দেশমধ্যে এই ভাব ছিল। হিন্দুদিগের এই দুর্দ্দশার সময়ে তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রব্যবসায়ী অথবা ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ কি করিয়াছিলেন? ভারতবর্ষব্যতীত সকল দেশেই স্বাধীনতার আদর আছে। নৃসিংহ দেবের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা দেশের লোকের দুর্গতি আপনোদনের নিমিত্ত যে কোনরূপ চেষ্টা কখন করিয়াছিলেন এ প্রকার ইঙ্গিত কোথাও নাই। আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে স্বজাতি, স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, জাতীয়তা, পরস্পর সহকারিতা, সহযোগিতা, সাহচর্য্য প্রভৃতি কথা শিখিয়াছি। এ সকল কথা পূর্ব্বে অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর এদেশে কেহ কখন

শুনে নাই। বিদেশীয়গণ এ কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিস্ময়বোধের কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কালে যাহাকে হিন্দুসমাজ বলি তাহা স্মৃতিনিয়মিত সমাজ, স্মৃতিযুগে এই সমাজ গঠিত হইয়াছে। কোন স্মৃতিতে এ সকল কথা সম্বন্ধে এক বর্ণও নাই, স্মৃতিকারেরা যে প্রকার মনের ভাব লইয়া এবং যে উদ্দেশ্যে নিয়মগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে কেন স্বাধীনতা জাতীয়তা প্রভৃতির সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথা বলেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য সমাজ, ব্রাহ্মণদের অধিকার, ব্রাহ্মণদের মর্য্যাদা, ব্রাহ্মণদের শাসন, এই সকল রক্ষা করা হইল স্মৃতিকারদের উদ্দেশ্য। ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের কথা বাঙ্গালাদেশে আসে না। শূদ্রদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা স্মৃতিতে পরিষ্কার করিয়া লিখিত আছে। এই শূদ্রেরা হইল ইতর অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের হইতে ভিন্ন, প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা শূদ্রদিগেরই দেশ। প্রাচ্যাঃ দাসাঃ—পূর্ব্বদেশবাসিগণ দাস, এই শূদ্র বা দাসদিগের সহিত সহানুভূতি, সহকারিতা, তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাব বা একতা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের চক্ষে নিরর্থক ও একান্ত হেয় কথা। দেশের স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ দেশের লোকের স্বাধীনতা, ব্রাহ্মণেরা দেশের লোকদিগকে যে স্থান দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে যে চক্ষে দেখিতেন তাহাতে তাহারা সুখে থাকিত কি দুঃখে থাকিত, তাহাদের অন্ন জুটিত কি তাহারা উপবাস করিত, মরিত কি বাঁচিত, এ সব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের চিন্তা করিবার বা ব্যাকুল হইবার কথা নহে। যে সকল জমিদারদের আশ্রয়ে ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন, সেই সকল জমিদারকে মুসলমান রাজকোষে কর দিতে হইত, প্রজাগণ আপন

আপন জমিদারদিগকে খাজানা দিত, প্রজাগণের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ জমিদারের ভাবিবার বিষয় ছিল। কিন্তু তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্মব্যবসায়ী এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের প্রজাগণের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিবার কথা নহে। প্রজাদের ধর্ম্ম লইয়া, জাতি লইয়া, আচার লইয়া যদি কখন প্রশ্ন উঠিত, তাহা হইলে হয়ত জমিদারের প্রতিপালিত পণ্ডিতগণ কোন প্রকার সদ্যুক্তি প্রদান করিতেন। কাহাকেও একঘ'রে করিবার, কাহাকেও জা'তে তুলিবার, কাহারও বা প্রায়শ্চিত্তবিধি—এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা খুব সম্ভব সময়ে সময়ে বিধান দিতেন, কিন্তু এ সকলের মধ্যে দেশের মঙ্গল, সমবেত চেষ্টা, সহকারিতা এ জাতীয় কোন কথা আসে না। সময়ে দেশে ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা হইল।

ইংরেজ-অধিকারে ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সুবিধা হইল, মুসলমানদিগের সময়ে এ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কোন পরাক্রান্ত হিন্দু জমিদারের অধীনে থাকিবার চেষ্টা করিত, কেহ রক্ষাকর্ত্তা না থাকিলে অনেক সময় বিপদের আশঙ্কা হইত; ইংরেজ-অধিকারে সে ভয় দূর হইল। ধর্ম্ম বা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা এখন যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাস করিতে পারিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গ্রামে একজন এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বসাইতে হিন্দু গ্রামবাসীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিয়া গ্রামে গ্রামে বাস করিতেন, অনেক স্থানে চতুষ্পাঠী খুলিতেন, গ্রামের লোকেরা তাঁহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত জমি নির্দ্ধারিত করিয়া দিত; এই উপায়ে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র-আলোচনা দেশমধ্যে বিশেষ প্রসার পায় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য,

কায়স্থ বিভাগের ভদ্র লোকেরাই প্রধানতঃ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আনাইবার উদ্‌যোগী হইতেন, এবং নবাগত ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদেরই সহিত সম্বন্ধ রাখিতেন। ইতর অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের সহিত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোন সম্বন্ধ রহিল না। বরঞ্চ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাতিশয্যের ফলে ইতর লোকের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা হীনতর হইল।

মুসলমানদিগের রাজত্বসময়ে মুসলমান ধর্ম্ম ও ফার্সি ভাষার প্রভাব হিন্দুধর্ম্ম ও বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় না। সমাজের অতি নিম্নস্তরে বিকৃত মুসলমান ধর্ম্ম ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্ম এই উভয়ই মিলিয়া একপ্রকার সঙ্কর ধর্ম্ম কোথাও কোথাও বা দেখা যাইত; কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু শাস্ত্রের উপর ইস্‌লাম ধর্ম্মের ছায়া কখন পড়ে নাই। নিজ শাস্ত্রব্যতীত অপর শাস্ত্র পাঠ করা ব্রাহ্মণদের কখন অভ্যাস নাই। ইংরেজরাজত্ব-কালেও ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ, খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র, কি ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা করিবার সামগ্রী কখন মনে করেন নাই। স্মৃতিযুগের আরম্ভে অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণদিগের যে ধর্ম্ম ছিল এবং তাঁহারা যে সকল শাস্ত্র আলোচনা করিতেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা অবিকল সেই ধর্ম্ম ও সেই সকল শাস্ত্র অনুশীলন করিতেন। কাল বা অবস্থা-ভেদে এ সম্বন্ধে এক সহস্র বৎসরে তাঁহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী সাহিত্যের সংঘর্ষফলে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যেরূপ প্রতিভার বিকাশ হয়, তদনুরূপ বিদ্যাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন লক্ষণই দেখা দেয় নাই। স্মার্ত্ত ধর্ম্মে পরিবর্ত্তনের কোন স্থান নাই; রক্ষণ হইল ইহার

মূল নীতি; কিন্তু সকল ধর্ম্মাপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে আচার হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র আলোচনা করেন, স্মৃতির বিধান দেন ও আচার রক্ষা করেন, পরিবর্ত্তন, গতি বা উন্নতি, ইহাদের সহিত ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথম ইংরেজী-শিক্ষা-ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়, তাহাতে হিন্দুসমাজে, পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ ঘৃণা হয় ও মৌলিক ধর্ম্ম আচারের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়, এবং সেই অনুপাতে সমাজমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে প্রধানতঃ আচার লইয়া ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় ও মৌলিক ধর্ম্ম ও শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিরোধ হয়। ভেদ হইবার আর একটি কারণ ছিল, একদিকে নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন পাশ্চাত্যশিক্ষায় পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, অপরপক্ষে পুরাতন শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পুরাতন পথ হইতে চুলমাত্র বিচলিত হইলেন না, সময়ে উভয় দলের মধ্যে পরিখার বিস্তৃতি ও গভীরতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য; আঠার শ আটান্ন খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সংস্কৃতভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয়, উপরে লিখিত হইয়াছে যে হিন্দুদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণ প্রথমে আঠার শ তেইশ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন, প্রথমে কেবল ব্রাহ্মণ বালকদিগের পড়িবার অধিকার ছিল, অনেক বৎসর পরে বৈদ্যবালকেরা সেই অধিকার পায়। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অপর কোন বিভাগস্থ বাঙ্গালী বালক, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-

স্থাপনের পূর্ব্বে সংস্কৃত শিখিতে সুযোগ পায় নাই। ব্রাহ্মণের টোলে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ বালকেরাই পড়িত, বৈদ্য অথবা কায়স্থ বালকেরা কখন কখন ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িতে পারিত; কিন্তু এই দুই বিভাগ ভিন্ন অপর কোন বিভাগস্থিত বাঙ্গালী বালকের পক্ষে চতুষ্পাঠীতে পাঠ, এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতপাঠ, সকলের পক্ষে অবারিত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথমে মানুষ-গণনা হয়, গণনার ফলে দেখা গেল যে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান, হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমানদিগের অপেক্ষা চারি লক্ষ অধিক।

দেশ ও দেশের লোক।

কাহাকে লইয়া দেশ? কাহাকে লইয়া সমাজ? হিন্দুদিগের দেশ, হিন্দুসমাজ এই দুই কথার অর্থ কি? ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুশাসন-অনুসারে বাঙ্গালাদেশে দুই শ্রেণীর লোক আছে, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ। শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের মতে অব্রাহ্মণেরা হইল ইতর অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হইতে ভিন্ন, তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণদের কোন সম্বন্ধ নাই এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজে তাহাদের কোন স্থান নাই। অব্রাহ্মণদের সাধারণ নাম শূদ্র, তাহাদের পদবী দাস। দাস পদবী বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে বিশেষ সুলভ নয়, অতি অল্পসংখ্যক অব্রাহ্মণেরা দাস নাম ব্যবহার করে, নতুবা রামা হাড়ী ও গোপালে মুচি তাহাদের সামাজিক পরিচয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেদিন পর্য্যন্ত কায়স্থেরা বলিতেন' যে, যে দাস নয় সে কায়স্থ নয়; বাঙ্গালাদেশে এই ভাব আজ এক

সহস্র বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশে হিন্দুসমাজ কাহাকে বলে?

হিন্দু বাঙ্গালীরা অগণিত বিভাগে বিভক্ত, সাধারণতঃ আমরা "ছত্রিশ জাতে'র" সম্বিক জাত কথা শুনিতে পাই; বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভাগসংখ্যা কিন্তু অনেক অধিক, বোধ হয় এক শতেরও উপর হইবে। প্রভেদের সংখ্যাগুলি কেহ একত্রিত করে নাই, তাহার প্রধান কারণ, সেগুলি একত্রিত করিবার কেহ প্রয়োজন বোধ করে নাই। কিসে প্রভেদ হয় তাহাও কেহ জানেনা, তাহার পর ইতর ও ছোটলোকদের মধ্যেই সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালীরা না করিলেও ইংরেজেরা তাহা করিয়াছে। ১৯০১ সালে ইংরেজকর্ম্মচারিগণ বাঙ্গালার মানুষ-গণনার সময়ে বাঙ্গালী জাতির একটি তালিকা ও তাহার সহিত প্রতি জাতির অন্তর্গত জনসংখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমাদের প্রয়োজনপক্ষে সে তালিকার কোন মূল্য নাই। তাঁহারা আরও এক হিসাব দিয়াছিলেন, এই সকল জাতিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, বিভাগগুলির নাম ব্রাহ্মণ, শুদ্ধজাতি, অভক্ষ্যভোজী অশুদ্ধ জাতি, মৃতপশুভোজী ইত্যাদি ইত্যাদি।

সামাজিক বিভাগানুসারে বাঙ্গালী হিন্দুরা দুই ভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র; ইহাই রঘুনন্দন বিধান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ আজ চারিশত বৎসর এই অনুশাসন পালন করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালাদেশে একলক্ষের অধিক ক্ষত্রিয় (অথবা রাজপুত) আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপর প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন। বাঙ্গালায় বৈশ্য বলিয়া বর্ণ নাই, যাহারা বৈশ্য বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের পূর্ব্ব-

পুরুষগণ ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় বাঙ্গালার বাহির হইতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণব্যতীত বাঙ্গলায় আছে কেবল শূদ্র। সামাজিক আচার-অনুসারে শূদ্রেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম সৎশূদ্র, বৈদ্য ও কায়স্থগণ এই শ্রেণীভুক্ত; দ্বিতীয় জলচল শূদ্র, ইহারাও দুইভাগে বিভক্ত, নবশাখ প্রভৃতি এই বিভাগ-অন্তর্গত, আর গোপ ও কৈবর্ত্ত (ইঁহারা উভয়ই ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন) ইঁহারাও জলচলমধ্যে পরিগণিত। যাহারা বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে জলচল নয়, তাহাদের লইয়া শূদ্রদিগের তৃতীয় বিভাগ গঠিত হইয়াছে। হিন্দু বাঙ্গালীদিগের আনুমানিক সংখ্যা ২৪০ লক্ষ। সামাজিক বিভাগ অনুসারে একশত জন হিন্দুবাঙ্গালীদের মধ্যে ৬ ছয়জন ব্রাহ্মণ, ৬ জন কায়স্থ, আধজন ক্ষত্রিয়, আধজন বৈদ্য, ১৭ জন নবশাখ, ১২ জন গোপ ও কৈবর্ত্ত আর বাকী শতকরা ৫৮ জন অর্থাৎ ১৫০ লক্ষের অধিক বাঙ্গালী নরনারী জল-অচল; তাহাদের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণদের ও অপর উচ্চজাতিদের অস্পৃশ্য।

প্রতি দশবৎসর যখন লোক গণনা হয়, তখন প্রত্যেক নরনারীর সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা হয়; প্রত্যেকের বয়স, ধর্ম্ম, উপজীবিকা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করা হয়, এবং উত্তরগুলি তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়; এতদ্ভিন্ন তাহারা কি জাতি (কাস্ট্) এপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যে ব্রাহ্মণ সে লেখে জাতি ব্রাহ্মণ, যে সূত্রধর সে লেখে জাতি সূত্রধর, যে যোগী সে লেখে জাতি যোগী। আমরা শত শত বৎসর হইতে অজ্ঞানতায় পরিপুষ্ট ও অভ্যস্ত হইয়াছি, নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে এই অদ্ভুত জাতি-বিভাগের কৌতুক উপলব্ধি করিতে পারি না।

তোমরা কয় সহোদর এ প্রশ্নের উত্তরে 'আমরা তিন সহোদর, আমি, পুঁটে মামা ও পদি পিসি' ; একথা সকলেই শুনিয়াছি, মানুষগণনায় "জাতি" বিভাগ ইহার নিকটসম্পর্কীয়। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ "জাতি" (কাস্ট্) নয় ব্রাহ্মণ বর্ণ, সূত্রধর "জাতি" নয় সূত্রধর ব্যবসা, আর যোগী "জাতি" নয়, যোগী সম্প্রদায়। সময়ক্রমে এই মানুষগণনার তালিকা ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের সরকারী কাগজ হয়। উপরে বলিয়াছি ১৯০১ সালের মানুষগণনার তালিকাতে ইংরেজকর্ম্মচারিগণ শুদ্ধ, অশুদ্ধ, অখাদ্যখাদক প্রভৃতি নাম দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুদিগের বিভাগ করেন। ১৯০১ সালের পরে যে কয়বার মানুষগণনা হয় তাহাতে এই বিচিত্র মেলবন্ধন আর পরিদৃষ্ট হয় নাই, তবে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের পদাঙ্ক-অনুসরণে ইংরেজ বাহাদুর রাজকীয় কার্য্য পরিচালনার সুবিধার নিমিত্ত হিন্দুদিগকে বিভাগ করিতে আর এক শ্রেণী আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর নাম দিয়াছেন, ডিপ্রেস্ড্ অর্থাৎ অধঃপতিত শ্রেণী। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণের নিমিত্ত দাস, হীন, নীচ, অন্ত্যজ-প্রভৃতি নানাপ্রকার নামের সৃজন করিয়াছিলেন, ইংরেজ বাহাদুর সৌভাগ্যবান্ হিন্দুদিগের নিমিত্ত ঐ সকল নামের সহিত আর একটি নামের যোজনা করিয়াছেন। ইংরেজেরা যে নাম দিয়াছেন সে নামটির বিশেষ মূল্য আছে, যে সকল হিন্দু নিজদিগকে এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে তাহারা ইংরেজ শাসন-কর্ত্তৃগণ হইতে নানাপ্রকার সাহায্য পাইবে, ইহাই বিধান হইল।

এদেশে কতদিন হইতে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানিত না, এখন যেভাবে জাতিভেদ লক্ষিত হয় সেভাবে বৌদ্ধযুগে জাতিভেদ ছিল না, তাহা

নিশ্চয়। কিন্তু সে সময়েও লোকে জীবিকার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিত, তাহাও নিশ্চয়। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও তাহাদের অগণিত শাখা ও উপশাখা দেশের লোকের চিরদিনই উপজীবিকা। আমরা মহাভারতে নিষাদ অর্থে মৎস্যজীবী কৈবর্ত্ত দেখি (১৫—৫০ অঃ অনু)। কর্ম্মকার (২২—২২অঃ অনু), গোপাল, মেষপাল (৫২—২৩২ অঃ বন), খনক-কর্ম্মকারী (১—১৪৭ অঃ আদি), নাপিত (৮৪—৩৩ অঃ উদ্), বধ্যঘাতী (জল্লাদ) দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণবেশে কুলাল(কুম্ভকার)-গৃহে বাস করিত (৪৭—১৬০ অঃ আদি)। আমরা তৈলিক (৯—২২৫ অঃ অনু), উগ্র (১৭—১৪৩ অঃ অনু), কাপালিক, আভীর (আহির), বল্লভ, আরালিক, গোবিকর্ত্তা, সূপ-কর্ত্তা, নিযোধক (৯—২ অঃ বিরাট), ঘোষ (গোয়ালা), রজক (২—৯১ অঃ শান্তি), এই সকল দেখি। আরও দেখি গোপ বৃত্তিবিশেষ, জাতি নয় (৩২—১৬৭ অঃ শান্তি)। আমরা দাশ অর্থে ধীবর দেখি (৪৭—১০০ অঃ আদি)। অপর স্থলে দেখি দাশায় অর্থে কৈবর্ত্তায় (৬৭—৬৩ অঃ আদি)। আমরা মাংসবিক্রয়কারী ব্যাধ (১১—২০৬ অঃ বন), মালাকার (১৬—৬২ অঃ সভা), বাদ্যকার (২৪—২৮৮ অঃ আদি), নাবিক (কৈবর্ত্ত) (২৯—৫৩ অঃ অশ্বমেধ), সূত, বন্দী চারণ, মাগধ, (২—৮০ অঃ দ্রোণ), বৈতালিক, মহামাত্র (মাহুত) (৪৫—১৯ অঃ দ্রোণ) এসকল দেখিতে পাই। আমরা কুমারের কর্ম্মশালা দেখিতে পাই (১৮—১৯১ অঃ আদি)। যাহারা স্নেহভাণ্ডে জীবী ছিল তাহাদিগকে উষ্ট্রীক বলিত (২৫—৪৫ অঃ কর্ণ)। যেস্থানে গোয়ালারা বাস করিত তাহার নাম ছিল ঘোষপল্লী বা ঘোষা (৪৯—৬৯ অঃ বন)। আমরা চণ্ডাল, শৌণ্ড (১১—২৩৩ অঃ বন), শৌণ্ডিক

(১৭—৩৫ অঃ অনু) দেখি। আমরা ব্যাপার শব্দে 'দ্রব্যনির্ম্মাণস্থানং' দেখি; বল্লাল সেন কুলীন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, এই কুলীন শব্দ মহাভারতে আছে (২১—৭৮ অঃ আদি)। আমরা গণক ও লেখক দেখি (৮—১৪৩ অঃ আশ্রমবাসিক)। মহাভারতের সময়ে দেশে যে সকল জাতি প্রচলিত ছিল, তাহার তালিকা নাই। যে সকল কর্ম্মোপজীবীদিগের নামের উল্লেখ আছে তাহাই উপরে দেওয়া হইল।

মহাভারতমধ্যে দেখিতে পাই, শূদ্রেরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরা ছিল সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী; এই কথাটির মধ্যে জাতিভেদের অনেক রহস্য বোধ হয় লুক্কায়িত আছে। বৌদ্ধদিগের সময়ে রজকের পুত্র বোধ হয় রজক হইত, কিন্তু আর আর পুত্রেরা সূত্রধর, কুলাল, কি লেখক, কি গণক হইতে পারিত, অন্ততঃ হইবার কোন বাধা ছিল না। নব ব্রাহ্মণ্যসমাজে সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী নিন্দার কথা হইল, সমাজ পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের শাসনে আসিল, তখন রজকের পুত্র আর অপর কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাহস পাইল না। তখন রজকও ব্রাহ্মণদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে ব্যগ্র হইয়াছে, "সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী" বলিয়া পরিচয় দিতে সে একান্ত অস্বীকৃত হইল। কর্ম্মানুসারে "জাতি"-গঠন, বোধ হয় বৌদ্ধযুগের পরে এবং নব ব্রাহ্মণ্যসমাজ পুনঃ সংস্থাপনের সময়ে বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যে ইচ্ছা করিয়া, কি চেষ্টা করিয়া, জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নয়, ব্রাহ্মণেরা ইতরদিগের সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করে নাই। ব্রাহ্মণেতরগণ হইল শূদ্র, ইতর, তাহাদের সামীপ্য বর্জ্জনীয়, এই হইল স্মৃতির বিধান। কর্ম্মানুসারে "জাতি"-গঠন আপনা আপনি হইয়াছিল।

"জাতি"-গঠনের আর একটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমরা মহাভারতে ও স্মৃতিতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অগণিত কারণে পতিত হইত। বিপ্লবের সময় ব্রাহ্মণ্যসমাজ বিশুদ্ধ রাখিতে ও সমাজ হইতে বিশৃঙ্খলা দূর করিতে কেবল ব্রাহ্মণ নয়, তিন বর্ণই আপনাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার নিয়ম করিয়াছিলেন। নিয়ম লঙ্ঘন করিলে স্ব স্ব সমাজ হইতে পতিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে কতকগুলি দ্রব্য বিক্রয় অনুজ্ঞাত ছিল, কতকগুলি নিষিদ্ধ ছিল। বৈশ্যদিগের পক্ষে গন্ধদ্রব্য, তিল, বসা প্রভৃতি বিক্রয় নিন্দনীয় ছিল। এই নিন্দিতকর্ম্মকারীরা পুরাতন সমাজ বা শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইয়া সময়ে আর এক নূতন 'জাতি' হইত। বাঙ্গালা দেশে যতপ্রকার 'জাতি' আছে, ভারতবর্ষে অপর কোন প্রদেশে সেরূপ নাই; বোম্বাই প্রদেশে কোন ব্যক্তি যে ব্যবসা করে অথবা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থশালী হয়, কিংবা প্রতিষ্ঠালাভ করে, সেই ব্যক্তি সেই দ্রব্যের নামে পরিচিত হয়; যেমন বটলিওয়ালা কম্বলওয়ালা ইত্যাদি, এই সকল নাম অথবা উপাধিমাত্র। ইহাদের সহিত 'জাতি'র কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ ফুলের চাষ করিয়াছিল সে মালী, পানের চাষ করিয়াছিল সে বারুই, হাঁড়ী গড়িয়াছিল সে কুম্ভকার 'জাতি'র অন্তর্গত হইল। আরও একপ্রকারে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদে জাতি হইয়াছে; উপরে যোগী সম্প্রদায় দেখিয়াছি, পরেও ইহার উদাহরণ পাইব; একথা পরে দেখিব।

বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণেতর সকলেই শূদ্র, তাহার প্রমাণ যেমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া

যায় না। ব্রাহ্মণব্যতীত সকলে নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দেয়; উৎকল ভিন্ন এ প্রথা আর কোথাও নাই। দাস শব্দের অর্থ পূর্ব্বে দেখিয়াছি 'শূদ্রধর্ম্মা', এই শূদ্রধর্ম্ম যে বৌদ্ধ বা কোন অবৈদিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম তাহা বলা বাহুল্য। যেমন রাজপুতদিগের সিংহপদবী বৌদ্ধ-সম্পর্কের ফল, সেইরূপ বাঙ্গালার দাস। বোধ হয় এক সময়ে ভারতবর্ষের অপর অপর স্থানেও অবৈদিকদিগকে দাস বলিত, সময়ে তাহারা সেই নাম ত্যাগ করিয়াছে। উড়িয়া শব্দ বোধ হয় ওড্র শব্দ হইতে হইয়াছে; সে প্রদেশে এখনও অনেক ব্রাহ্মণের দাস উপাধি আছে, বাঙ্গালীদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। বাঙ্গালাদেশেও দাসশর্ম্মা উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। যে কোন ব্যক্তি অবৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই উপাধি দাস হইয়াছে; আর সে-ই শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রচলিত বাঙ্গালী 'জাতি'র ইতিহাস দেখিলে একথাটা অধিকতর স্পষ্ট হইবে।

বৈদ্যবিভাগের উৎপত্তি হইতে বাঙ্গলাদেশের জাতিভেদের রহস্য-সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার প্রমাণ মহাভারতমধ্যে যথেষ্ট আছে। বৈদ্য অর্থে বেদপারগ, পূর্ব্বে এরূপ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; অপর পক্ষে তাঁহারা যে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়,—"বৈদ্যাশ্চাতুরাঃ" বৈদ্যগণও পীড়িত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা নিন্দিত কর্ম্ম ছিল, চিকিৎসা করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইত। এই হইল চিকিৎসা-কারী ব্রাহ্মণদের পাতিত্যের এক কারণ; কর্ম্মহেতু পাতিত্য হইত তাহা বুঝা যায়। ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্মহেতু শূদ্রতুল্য হইত, তাহারও উল্লেখ

আছে; কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইত, সে সব স্থলে চণ্ডাল অর্থে পতিত, যেমন বিশ্বামিত্র ও তাঁহার পুত্রগণ। বৈদ্যদিগের শূদ্রত্বের ইতিহাস তাঁহারা নিজেই প্রদান করেন; তাঁহারা অশ্বিনী-কুমার হইতে নিজেদের সম্ভব কীর্ত্তন করেন। অশ্ব, অশ্বী, এবং অশ্বিনী, এই তিনটি একই শব্দ; প্রত্যেকটি হইতেই নাস্তিকতা, বৌদ্ধধর্ম্ম, অবৈদিকতার ইঙ্গিত আসে। পুরাণের শাসন অনুসারে অশ্বিনীকুমারগণ শূদ্রবর্ণ, মরুৎগণ বৈশ্যবর্ণ; পূর্ব্বে বলিয়াছি বংশকীর্ত্তন একটি মতবিস্তারের বিবরণ রূপকাকারে কোন ব্যক্তির বংশরূপে লিখিত। তাহা হইলে অবৈদিকতার সহিত একসময়ে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধ হয় ও তাহাদিগকে সেই কারণে অবৈদিকতাসূচক দাস উপাধি গ্রহণ করিতে হয়, সেই ব্রাহ্মণেরা এখন শূদ্র বৈদ্য নামে পরিচিত।

আমার বোধ হয় কায়স্থদিগেরও অবস্থা কতকটা ইহার অনুরূপ। কায়স্থেরা নিজদিগকে মসিজীবী বলেন। যেমন চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্যেরা পতিত, সেইরূপ রাজপ্রেষ্য অথবা রাজকর্ম্মচারিগণ শাস্ত্রানুসারে পতিতদিগের মধ্যে এক সময়ে পরিগণিত হইত। আমরা "লেখক ও গণকের" উল্লেখ দেখি, রাজকর্ম্মচারীদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার ও দুরাচারের উল্লেখ দেখি। মহাভারতমধ্যে আমরা "ধনলোভী রাজভৃত্য" দেখিতে পাই; ৪৩—৯১ অঃ অনু।

শূদ্রো রাজন্ ভবতি ব্রহ্মবন্ধুর্দ্দুশ্চারিত্রো যশ্চ ধর্ম্মাদপেতঃ।
বৃষলীপতিঃ পিশুনো নর্ত্তশ্চ রাজপ্রেষ্যো যশ্চ ভবেদ্বিকর্ম্মা॥

৪—৬৩ অঃ শান্তি।

ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অধম ব্রাহ্মণ এবং দুশ্চরিত্র, স্বকর্ম্মপরিত্যাগী,

বৃষলীপতি, পিশুন, নর্ত্তক, রাজপ্রেষ্য ও কুকর্ম্মরত ব্রাহ্মণ শূদ্রসদৃশ, সুতরাং সে বেদোক্ত মন্ত্রসকল জপ করুক বা না করুক, দাসগণের ন্যায় শূদ্রপংক্তিতে ভোজনীয় হইয়া থাকে। রাজপ্রেষ্যাদি সকলেই শূদ্রসদৃশ সুতরাং তাহাদিগকে দেবকৃত্যে বর্জ্জন করিবে। আমরা ব্রাহ্মণের পাতিত্যের অসংখ্য কারণ দেখিতে পাই; ৩৭—১৬৫ অঃ শান্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্মৃতিতে কায়স্থদিগের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগেরও উদাহরণ দেখিয়াছি। বিপ্লবের সময় রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার দুর্ব্বহ হইয়াছিল তাহাও অনুমান করা যায়। তাহাদিগের (কায়স্থদিগের) সম্বন্ধে অনেক প্রকার কথা মনে হয়; অনেক পুরাণে 'জাতি'-উৎপত্তির দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে। অমুক বর্ণের পিতার ও অমুক বর্ণের মাতার পুত্র প্রতিলোম ও অনুলোম-বিচারে অমুক অমুক জাতি হয়, এরূপ বংশবিবরণের কোন মূল্য নাই। যদি বংশবিস্তারের অর্থ মতবিস্তার হয়; তাহা হইলে এরূপ বর্ণনার হয়ত কিছু অর্থ থাকিতে পারে, কিন্তু এসময়ে এপ্রকার অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। শত শত বৎসর বৌদ্ধ-অধিকারের ফলে, সহস্রবৎসরব্যাপী গৃহযুদ্ধের ফলে সমাজে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা এতদুর সময়ে কেহ বলিতে পারে না; তবে পুনর্গঠনের সময় যে সকল কারণে 'জাতি'-গঠন হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুএকটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। উপজীবিকাভেদে 'জাতি'-গঠন বোধ হয় বহু সহস্র বৎসর হইতে এদেশে আছে। পাতিত্য হইতে 'জাতি'-গঠন হইত তাহারও প্রমাণ আছে; তবে বোধ হয় ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রভেদ-অনুসারে প্রধানতঃ 'জাতিভেদ' হইয়াছে।

পরে দেখিব কুর্ম্মীরা নিজেদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি বলে, তাহারা সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষে বাস করে। অমুক বর্ণের পিতা এবং অমুক বর্ণের মাতার পুত্র অমুক জাতি হয়, ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ অথবা বিভাগ-অন্তর্গত লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল এবং তাহাদের সন্ততিগণ কুর্ম্মী হইল, ইহা বোধ হয় কষ্টকল্পনা।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র বিভাগ আছে, সকলগুলির সহিত বেদের শাখা অথবা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন না কোন প্রকার কারণ সংশ্লিষ্ট আছে, আমার বোধ হয় ব্রাহ্মণেতরদিগের পক্ষেও এইরূপ হইয়াছিল। যখন কোন 'জাতি'কে ভারতবর্ষের প্রায় সকল অংশেই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এইপ্রকার সন্দেহ দৃঢ়তর হয়। একই 'জাতি' ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে ও সামাজিক অবস্থাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্থান অধিকার করে তাহারও উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজে রজকগণ অস্পৃশ্য নহে, বাঙ্গালাদেশে তাহারা অস্পৃশ্য; পূর্ব্বে হৈহয়-সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি; ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মৈমনসিংহ জেলার সের-পুর এলেকায় যে সকল হৈহয় ছিল, তাহাদের সামাজিক অবস্থা চতুষ্পার্শ্বস্থিত নমঃশূদ্রদিগের মত ছিল; অথচ কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটে কিংবা যুক্তপ্রদেশে যাঁহারা আপনাদিগকে হৈহয় বলেন তাঁহারা সমাজে বিশিষ্ট ও সম্মানিত স্থান অধিকার করেন।

কায়স্থেরা ভারতবর্ষে প্রায় সকল স্থানেই আছেন, বাঙ্গালাদেশে তাঁহাদের সংখ্যা সাড়ে পনর লক্ষ। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহাদে

সংখ্যা এক কোটির ন্যূন হইবে না, এই এক কোটি নরনারী সঙ্কর বা শুদ্ধ কোন বিশেষ বর্ণ বা জাতির অন্তর্গত স্ত্রীপুরুষের সন্ততি বলিয়া বোধ হয় না; এক সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয়; এরূপ অনুমান করিবার কারণও আছে।

কায়স্থদিগকে কেন 'দাস' নাম গ্রহণ করিতে হইল তাহা বিচার করিবার বিষয়। যখন 'দাস' শব্দ রহিয়াছে তখন অবৈদিকতার সহিত সম্বন্ধ আপনা-আপনি আসে, কোথায় কায়স্থদিগের সহিত অবৈদিকতার মিশ্রণ হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কায়স্থেরা চিত্র-গুপ্তের সহিত নিজেদের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। পূর্ব্বে দেখিয়াছি গুপ্ত শব্দ হইতে মিশ্রিত ভাব আসে। চিত্রগুপ্ত শব্দ হইতেও এ মিশ্রিত ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতে চিত্রগুপ্তের সহিত আমাদের এক স্থানে দেখা হয়।

যেন যঃ প্রীয়তে দেবঃ প্রীয়ন্তে পিতর স্তথা।

ঋষয়ঃ প্রমথাঃ শ্রীশ্চ চিত্রগুপ্তো দিশাং গজাঃ ॥ ৬—১২৫ অঃ অনু।

যদ্দ্বারা দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, প্রমথগণ, শ্রী, চিত্রগুপ্ত ও দিক্-গজসকল প্রীতিযুক্ত হন। এস্থলে চিত্রগুপ্তকে আমরা দেবগণের সহিতও দেখি এবং প্রমথদিগের সহিতও দেখি। দেবগণের সহিত বৈদিক পন্থার সম্বন্ধ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর শ্মশান-বাসী প্রমথগণ শব্দ হইতে অবৈদিকতার ইঙ্গিত আসে। মহাভারতে এই মিশ্রিত ভাব ধর্ম্মসম্বন্ধে, সমাজসম্বন্ধে, সম্প্রদায়সম্বন্ধে, মতসম্বন্ধে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বিপ্লবের শেষ ভাগে সন্ধি ও মিশ্রণ অনিবার্য্য হইয়াছিল; বোধ হয় বর্ত্তমান হিন্দুদিগের প্রত্যেক

সম্প্রদায়ের উদ্ভব অনুসন্ধান করিলে এই মিশ্রণের ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এখানে একটি রহস্যের কথা আছে, কায়স্থেরা এবং অপরাপর বিভাগস্থ বাঙ্গালী হিন্দুরা এখন নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। মহাভারত হইতে দেখা যায় যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয় শব্দ গৌরবের ছিল না; ক্ষত্রিয় ও অবৈদিক প্রায় একই শব্দ হইয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে ক্ষত্রিয়ের নাম হইয়াছিল অশ্ববাহন, মাতঙ্গবাহন; শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণব্যতীত সকল বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় নামের অধিকারী, ইহারা দীর্ঘতমার অর্থাৎ চির জ্ঞানান্ধের সন্ততি।

আদিশূর কেবল ব্রাহ্মণ আনেন নাই, তিনি সম্ভবতঃ বাঙ্গালা-দেশে রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য "লেখক ও গণক" অথবা অন্য প্রকার রাজকার্য্যকুশল লোক আনাইয়াছিলেন। ধর্ম্মসূত্রেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক তাঁহারা পূর্ব্বে বোধ হয় পতিত হইয়া-ছিলেন, তাহা না হইলেও বাঙ্গালাদেশে আসিয়া কেন দাস উপাধি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বাঙ্গালা-দেশে ব্রাহ্মণ্যসমাজের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণব্যতীত সকলেই শূদ্র অথবা দাস নামের অধিকারী।

বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের আর এক প্রান্তে একটি বিভাগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালাদেশে ২০ লক্ষ নমঃশূদ্র আছেন, সমস্ত হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ২৪০ লক্ষ, তাহা হইলে প্রায় ১২ জন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন নমঃশূদ্র। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বিভাগস্থ বাঙ্গালীরা ইহাদিগকে চণ্ডাল বলিত। বলা বাহুল্য নমঃশূদ্রগণ এনামে

অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল ; চণ্ডাল শব্দের সহিত ব্রাহ্মণ্যসমাজে কতকগুলি হীনতাব্যঞ্জক ভাব বহুদিন হইতে ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত আছে, চণ্ডাল কাহাকে বলিত, পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, অবৈদিকগণকে চণ্ডাল বলিত, কিন্তু অবৈদিক একটি সাধারণ শব্দ, ইহাদের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় ও বিভাগ ছিল। আমরা মতঙ্গ-উপাখ্যানে চণ্ডাল শব্দ হইতে নানা প্রকার ইঙ্গিত পাই। মতঙ্গ ব্রাহ্মণ হইতে চাহিয়াছিলেন, ইন্দ্র তাহাকে বর দিলেন যে তুমি কামরূপী বিহঙ্গম হইবে। দৈত্যদিগকে কামরূপী বলিত, আর বিহঙ্গম অর্থে দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ইন্দ্রের বরের অর্থ তাহা হইলে হয় যে, কোন অবৈদিক পতিত অথচ ব্রাহ্মণসম্প্রদায় পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা করিতেছিল ; তাহারা ব্রাহ্মণ না হইয়া অবৈদিক-দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইল। এই (আংশিক) অবৈদিকগণের ব্রাহ্মণ-দিগের উপর বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ ক্রোধ এবং ঘৃণা হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায় এবং তাহার ফলে তাহাদের যে চণ্ডাল নাম হইবে তাহাও বুঝা যায়। পূর্ব্বে আর্হত বলিয়া এক অবৈদিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের মধ্যে জাতকর্ম্মাদি সকল সংস্কার হইত। শূদ্রের কোন প্রকার সংস্কার নাই, তাহা হইলে আর্হতগণ এক প্রকার পতিত ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণসদৃশ সম্প্রদায় ছিল তাহা বলিয়া মনে হয়। মতঙ্গ শব্দের এক অর্থে চণ্ডাল, "মতং গচ্ছতি ইতি মতঙ্গঃ"। এ মত কোন বিশেষ মত অথবা সাধারণ অবৈদিক মত তাহা বলা যায় না ; বর্ত্তমান নমঃশূদ্রদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময়ে অন্ততঃ আংশিক অবৈদিকমতাবলম্বী ছিলেন তাহা নিশ্চয়। তবে সে সময়ে তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন কিনা

তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান নমঃশূদ্রদিগেয় মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত দুই একটি আচার এখনও লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের ন্যায় শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে অশৌচকাল ১০ দিন। নাম হইতে নমঃশূদ্র-দিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে বোধ হয় কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। নমঃ ও শূদ্র শব্দ উভয় পরস্পরবিরোধী, শূদ্র অর্থে অবৈদিক করিলে শূদ্র অথচ ব্রাহ্মণের ন্যায় নমস্য এই মিশ্রিত ভাব আসে।

বাঙ্গালাদেশে আর একটি সম্প্রদায়ের নাম বাগ্‌দী। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের সংখ্যা দশ লক্ষ ছিল, বিশ বৎসরে ইহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হয় নাই, বরঞ্চ কিছু কমিয়াছে। নামের সাদৃশ্য দেখিয়া আমার বোধ হয় বাগ্‌দী শব্দ ব্যাঘ্রদত্তী শব্দের অপভ্রংশ। মহাভারতে আমরা তিন জন ব্যাঘ্রদত্তের নাম দেখিতে পাই, এক ব্যাঘ্রদত্ত ছিলেন পাঞ্চালরাজ, তিনি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে তিনি বৈদিক ছিলেন। আর একজন ব্যাঘ্রদত্ত ছিলেন অনূপ দেশের রাজা। আর একজন ব্যাঘ্রদত্ত ছিলেন, তিনি কুরুপক্ষে যুদ্ধ করেন; তাহা হইলে তাহার উপর অবৈদিকতার ইঙ্গিত আসে; এ ধারণা আর এক কারণে দৃঢ় হয়, তিনি মগধরাজপুত্র ছিলেন, মগধ বলিলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ স্বভাবতঃই আসে; আর এক কারণে তাঁহার অবৈদিকতা সন্দেহ হয়, তিনিও বাঙ্গালার রাজা সমুদ্রসেনের ন্যায় সাত্যকির হস্তে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হন। আমরা বিষ্ণুপুরের বাগ্‌দী রাজার নাম শুনিয়াছি। এই সকল কথা গুলি একত্রিত করিলে আমার মনে হয় যাহাদিগকে আমরা বাগ্‌দী বলি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময়ে কোন প্রকার অবৈদিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন

এবং কোন কারণে নমঃশূদ্রদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে হেয় হইয়াছিলেন, সেই কারণে ব্রাহ্মণশাসিত দেশে তাঁহাদের পক্ষে সমাজে স্থান অতিনিম্নে নির্দ্দিষ্ট হয়।

বাঙ্গালাদেশের উত্তর ভাগে রাজবংশী বলিয়া আর একটি বৃহৎ সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা এখন নিজেদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, ইঁহাদের সংখ্যা ১৮ লক্ষ। মুসলমান-অধিকারের অনেক পরেও পূর্ব্বোত্তর বাঙ্গালা বৌদ্ধ অথবা মিশ্রিত হিন্দু-বৌদ্ধ প্রধান ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান হয়; আর এক অংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অনেকে অনুমান করেন যে বর্ত্তমান রাজবংশীরা তাহাদের সন্ততি।

বাঙ্গালায় যোগী-সম্প্রদায় এখন যোগী জাতি বলিয়া পরিচিত, ইহাদের সংখ্যা পূর্ব্বে অনেক অধিক ছিল। বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রের ব্যবসা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল, ইংরেজ-অধিকারের অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালীদের বস্ত্রব্যবসা ধ্বংস হয়। উপজীবিকা বিনষ্ট হইবার ফলে ইহাদিগের সংখ্যারও অনেক হ্রাস হইয়াছে, এখন ইহাদের সংখ্যা চার লক্ষও হইবে না। নবম দশম শতাব্দীতে নাথ সম্প্রদায় একটি মিশ্রিত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ছিল, বর্ত্তমান যোগীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

একশত হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে গোপ ও কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা ১২ জন। গোপ (বল্লভ) ও কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত মহাভারতে লিখিত আভীর ও কৈবর্ত্তদিগের যদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই দুই সম্প্রদায়ের উপর এক সময়ে অবৈদিকতার ছায়া পড়ে, অবৈদিক হইলেও ইঁহারা উপরে লিখিত সম্প্রদায়গুলি অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশে মাহিষ্য ২৩ লক্ষ, নমঃশূদ্র ২০ লক্ষ, রাজবংশী ১৮ লক্ষ, বাগ্‌দী ১০ লক্ষ, গোপ ৬ লক্ষ, যোগী ৪ লক্ষ, এই সকল বিভাগে মোট জনসংখ্যা ৮১ লক্ষ। ইহাদের সকলেরই পূর্ব্ব-পুরুষগণ এক সময়ে পতিত বা অবৈদিক ছিল, তাহা নিশ্চয়; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বাঙ্গালার সকল জাতিরই উৎপত্তি এই প্রকার দেখা যাইবে।

এখন ব্রাহ্মণদিগের কথা, আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণদের বংশধরগণকে লইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজ প্রধানতঃ গঠিত। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্রাহ্মণদিগের অসংখ্য বিভাগ আছে, তন্মধ্যে কান্যকুব্জ অন্যতম। যে যে কারণে ব্রাহ্মণদিগের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এখন কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; তবে ধর্ম্মের সহিত অথবা বেদের শাখার সহিত এপ্রকার বিভাগের সম্বন্ধ ছিল তাহা একপ্রকার নিশ্চয়। কান্যকুব্জ শব্দ হইতে কতকগুলি কথা মনে আসে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থিত মধ্যদেশে বৌদ্ধবিপ্লবের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধরূপে রক্ষিত ছিল, যদিও সে ভাগেও যথেষ্ট ব্যভিচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি ভারতবর্ষের অপর অপর ভাগের সহিত তুলনায় মধ্য-দেশের ধর্ম্ম ও আচার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। কান্যকুব্জের সহিত মধ্যদেশের কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা স্থির করা কঠিন। পক্ষান্তরে কান্যকুব্জ-সম্বন্ধে অন্য প্রকারের কথা মনে আসে। পুরাণমতে কান্যকুব্জ হইল গাধি রাজার দেশ, গাধিবংশ ক্ষত্রিয় ছিল পরে ব্রাহ্মণ হয়, এই বংশে বেদ-অপহরণকারী বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়, আর এই বংশে ক্ষত্রিয়নিধনকারী পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। বলা

বাহুল্য বর্ণনাটি একটি রূপক, ইহার যে নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহার সন্দেহ নাই। গল্পটির বহিঃ আবরণ উন্মোচন করিলে অস্পষ্ট হইলেও এক সময়ের সামাজিক চিত্রের আবছায়া ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সসীমের নাম দিতি, তাহার পুত্রেরা হইল দৈত্য; অসীম আকাশের নাম অদিতি, তাহার পুত্রেরা হইল আদিত্য অর্থাৎ দেবগণ। গাধ শব্দ সীমাব্যঞ্জক, যাহার তল আছে তাহা গাধ, আর যাহার তল নাই তাহা অগাধ। তাহা হইলে গাধি শব্দের সহিত দিতি শব্দের ন্যায় অবৈদিকতার সম্বন্ধ আসে, কিন্তু এই বংশ পরে ব্রাহ্মণত্বে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহা হইলে এই বংশে মিশ্রিত ভাবের লক্ষণ আছে বলিয়া মনে হয়। বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের জন্ম-বিবরণে এই মিশ্রিত ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। রূপকটির গল্প-আবরণ উন্মোচন করিলে মনে হয় যেন কান্যকুব্জ শব্দের পশ্চাতে বৈদিক ও অবৈদিক উভয় মিশ্রিত ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে, একটু চিন্তা করিলে এ মিশ্রিত ভাব আছে বলিয়া বিস্ময় বোধ হইবে না, এক সহস্রের অধিক বৎসরব্যাপী বৌদ্ধদিগের সহিত বিরোধফলে ও বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যহেতু ব্রাহ্মণ্যসমাজের সকল দিকেই যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। এক সময়ে অবৈদিক ধর্ম্ম অথবা অবৈদিকতা-সম্পৃক্ত ধর্ম্ম, পুনরায় ব্রাহ্মণত্বের রূপ গ্রহণ করিতেছে এভাব বোধ হয় সকল স্থানেই ঘটিতেছিল। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে মিশ্রিত ভাব ছিল, তাহা প্রকারান্তরে প্রকাশ পায়। প্রবাদ আছে যে, যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিলেন। ভরদ্বাজের বংশবিবরণ আমরা জানি; ইহাতে এই মিশ্রিত ভাব পরিষ্কাররূপে রক্ষিত আছে। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণদের

মধ্যে মিশ্রিত ভাব নিন্দার কথা নহে ; এক সময়ে বোধ হয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই ভাব অল্প-বিস্তর সকল স্থানেই দেখা যাইত। স্মৃতি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় অত্রিগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা কোথাও কোথাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন।

ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে, ভারতবর্ষের কোন ব্রাহ্মণ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, তাঁহার শিরাতে অবিমিশ্রিত ব্রাহ্মণরক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বৈদিক-বৌদ্ধসংগ্রামে কি ভাবে সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না, আমরা দেখিয়াছি যে এক সময়ে একজন বৈশ্য যদি শূদ্রাণী (অর্থাৎ অবৈদিক স্ত্রীলোককে) বিবাহ করিত তাহার পুত্রকন্যারা বৈশ্য হইত, একজন ব্রাহ্মণ যদি সেই বৈশ্যা কন্যা বিবাহ করিত সেই বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইত। ব্রাহ্মণ হইবার এতদ্‌ব্যতিরিক্ত অগণিত উপায় ছিল ; এইসব কথাগুলি একত্রিত করিলে, আমাদের মনে যে ধারণা আছে যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ও তাঁহারা সৃষ্টির আরম্ভ হইতে পর্য্যায়ক্রমে সমভাবে চলিয়া আসিতেছেন, সে ধারণাটি কতদূর অলীক তাহা বুঝা যাইবে। সমস্ত ভারতবর্ষে প্রায় দেড় কোটি ব্রাহ্মণ আছেন, চামারের সংখ্যাও প্রায় দেড় কোটি, যাহারা চর্ম্মব্যবসায়ী তাহাদিগকে চামার বলে, ইহাই সাধারণ ধারণা। দেড় কোটি লোক যে চর্ম্মব্যবসায়ীদিগের বংশধর ইহা স্পষ্টই অশ্রদ্ধেয় কথা, বাঙ্গালাদেশে চণ্ডালদিগের যেমন কোন বৃত্তিবিশেষের নিমিত্ত চণ্ডাল নাম হয় নাই, এনাম তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবৈদিকতার জন্য হইয়াছিল, সেইরূপ যাহাদের এখন" নাম হইয়াছে চামার, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময়ে অবৈদিকতার

জন্য ঘৃণাসূচক চর্ম্মকার নাম পাইয়াছিল। মহাভারতে চর্ম্মকার অর্থে চণ্ডাল দেখি। আমরা যেমন ভারতবর্ষব্যাপী ব্রাহ্মণসমাজ দেখি সেইরূপ ভারতবর্ষব্যাপী কায়স্থ, গোপ প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে পাই। কুর্ম্মীদিগের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব।

বাঙ্গালাদেশে জাতিবিভাগ বুঝিতে আরও কিছু কথার প্রয়োজন। বৌদ্ধবিপ্লবের ফলে হিন্দুসমাজ কিরূপে ভাঙ্গিয়াছিল, আবার পুনরায় ধীরে ধীরে কিরূপে গঠিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে ছোটনাগপুরের মানভূম জেলা যেরূপ উপযোগী সেরূপ ভারতবর্ষের অপর কোন অংশ উপযোগী কিনা সন্দেহ। মানভূম জেলা বাঙ্গালার উত্তর রাষ্ট্র (রাঢ়) ভাগের অন্তর্গত, তাহাদের শাসনকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ইংরেজেরা ইহাকে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহারের অন্তর্গত করিয়াছে; তথাপি মানভূম পূর্ব্বেও বাঙ্গালী ছিল এখনও আছে। বিহারের (মগধ) সান্নিকট্য হেতুই হউক অথবা অপর কোন কারণেই হউক, এক সময়ে এভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। যেস্থানেই বৌদ্ধেরা বড় পাহাড় বা উচ্চস্থান দেখিত, তাহারা সেই স্থানে স্তূপ, মঠ, বিহার, অথবা মন্দির নির্ম্মাণ করিত। মানভূম জেলায় অনেক ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, এতকাল পরেও এই সকল পাহাড়ে বৌদ্ধদিগের নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সকল বিভাগ আছে মানভূম জেলাতে বাঙ্গালীদের মধ্যে সেই সকল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ সকল বিভাগীয় লোকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালা

বা অপর প্রদেশ হইতে এস্থানে আসিয়াছিল। এস্থানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহারা এখন বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণদের সহিত আদান প্রদান করেন ; অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় সকল ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালা অথবা বিহার কিংবা অপর স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বিভাগীয় বাঙ্গালীরা প্রধানতঃ বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে এ জেলাতে বাস করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিলে মানভূম জেলায় নানা শ্রেণী হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহারা ভূতপূর্ব্ব বৌদ্ধদিগের বংশধর। কলিকাতা হইতে বাঙ্গালীরা এদেশে আসিলে ইহাদিগকে সাঁওতাল নাম দেন, বলা বাহুল্য কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। এ জেলায় সাঁওতাল আছে, কিন্তু যাহাদের কথা বলিতেছি তাহারা সাঁওতালদিগের হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। ইহাদের রূপ, ভাষা, আচার দেখিয়া নবাগত বাঙ্গালীরা ইহাদিগকে অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক সাঁওতাল নাম দেন।

যাহাদিগের কথা বলিতেছি তাহারা নানা ভাগে ('জাতিতে') বিভক্ত, ইহাদেরও পরস্পরের মধ্যে উচ্চ, নীচ, জলচল, জল-অচল, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ভেদ আছে। আমি যে স্থানে থাকি তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামে এই শ্রেণীর লোকেরা বাস করে, আজ ত্রিশ বৎসর ইহাদের সহিত আমার পরিচয় আছে, ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর কথা বলিব, এ ভাগে ইহাদিগকে মাহাতো কিংবা মাহাতোকুর্ম্মী বলে। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী, উড়িষ্যার কুর্ম্মীদের সহিত ইহাদের বিবাহ চলে।

প্রথমে ইহাদের আচার-ব্যবহারের কথা বলি—বাহির হইতে দেখিলে ইহাদিগকে সাধারণ বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দক্ষিণ

বা পূর্ব্ব বাঙ্গালার হিন্দুদিগের সহিত তুলনা করিলে অনেক প্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহারা ইঁদুর খাইত, এখনও বোধ হয় অনেক স্থানে খায়, তবে স্বীকার করে না। তাহারও পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষহীন সাপ খাইত, তাহাদিগকে ঢোঁড়াকুর্ম্মী বলিত, অনেক স্থানে ইহারা এখনও শূকরমাংস খায়। পূর্ব্বে ইহাদের ব্রাহ্মণ ছিল না, এখন হইতেছে, বিবাহে ইহাদের ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় না, ইহারা অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহ করে না। বিবাহে কোন মন্ত্র নাই, গায়ে হলুদের প্রথা আছে; লেন দেন, সামাজিক ভোজন, এ সকলের আয়োজন আছে, অতি অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে সাঙ্গা প্রথা আছে, বিধবা হইলে স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করে, জনকয়েক সাক্ষীর সামনে এ প্রকার (সাঙ্গা) বন্ধন হয়। সামাজিক ভোজ ভিন্ন এ বিবাহে আর কোন প্রকার অনুষ্ঠান নাই। অনেক সময়ে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের মধ্যে কলহ করিয়া অন্য স্ত্রীপুরুষের সহিত এরূপ সাঙ্গা করে। স্ত্রীলোক এদেশে পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম করে ও উপার্জ্জন করে, সেই কারণে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

ইহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন, ইহারা এখন মন্ত্র গ্রহণ করে, ইহাদের ব্রাহ্মণেরা অথবা বৈষ্ণবেরা এ মন্ত্র দেয়, এই মন্ত্র তান্ত্রিক বীজমন্ত্র নয়, বয়স হইলে প্রায় সকলে মালা পরে, অতি অল্প বয়সে মন্ত্রগ্রহণ সমাধা হয়, মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বেও কেহ কেহ মালা পরে। এখন ইহারা সকলেই হরিনাম করে, গত দশ পনর বৎসর হইতে এই ভাবের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন ক্ষেত্রের কাজ থাকে না, তখন প্রায় প্রতিগ্রামে 'হরিবোল' হয়। এই

'হরিবোল' কোথাও বা অষ্টপ্রহর কোথাও বা নবরাত্র, কোথাও বা চব্বিশপ্রহর কিংবা ততোধিক সময় স্থায়ী হয়; এই 'হরিবোলে' বৈষ্ণব আনাইতে হয়, তাহাদিগকে সিধা ব্যতীত নগদ কিছু দিতে হয়। গ্রামের কোন স্থানে কোথাও বা বৈষ্ণবদিগের খোল কর-তালের সহিত কোথাও বা দেশের লোকের মাদলের বাজনার তালে তালে 'হরিবোল' হয়। গ্রামের সকল বিভাগের নরনারী 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে চক্রাকারে একটি স্থানে ঘোরে। রাতদিন অবিরাম এই হরিবোল বলে, যে যতক্ষণ পারে যোগ দেয়। কাজ পড়িলে 'হরিবোল' বন্ধ করিয়া কাজ করিতে যায়, কাজ শেষ হইলে আবার যোগ দেয়। এই অনুষ্ঠানে একশ দেড়শ টাকা কি তাহার অধিক ব্যয় হয়, গ্রামের লোকে চাঁদা করিয়া এ টাকা তোলে। স্থানে স্থানে হরিসংকীর্ত্তনের দল দেখা দিতেছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই কালীপূজার সময় পূজা অথবা উৎসব হয়, এদেশে ইহা একটি 'পরব' ইহাতে উৎসব ও খেলার ভাগই প্রধান উপকরণ। পূজা অথবা কোন প্রকার ধর্ম্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। মনসাপূজা ইহাদের মহাপূজা; নিম্ন বাঙ্গালার দুর্গোৎসবের সমান। এ মনসা কে, আর এই পূজার উৎপত্তি বা কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না। পৌরাণিক উপকথানুসারে নাগ জরৎকারু মুনির জরৎকারু বলিয়া স্ত্রী ছিল, আস্তিক মুনি ইহাদের সন্তান, মনসাদেবী 'আস্তিকস্য মুনের্মাতা'। বর্ষাকালে ইহার পূজা হয়, দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় ইহার প্রতিমা গঠিত হয়। এ অঞ্চলের সকল বিভাগের লোকে প্রতিমা গড়িয়া পূজা করে, প্রতিমা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার মধ্যে

একটু বিচিত্রতা আছে প্রতিমার চোখের তারা কোন ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে দিতে হয়, যাহারা প্রতিমা গড়ে তাহারা দিতে পারে না। কোথাও বা ব্রাহ্মণে আসিয়া পূজা করে,—কোথাও বা পরিবারস্থ কেহ পূজা করে। আমার একজন হাড়ী প্রতিবেশীর ঘরে এই পূজা হয়, একজন বৈষ্ণব প্রতিমার হাতে এক গাছা ফুলের মালা ঝুলাইয়া দেয়, ইহাই হইল তাহার পূজাবিধি।

ইহাদের মধ্যে আর এক প্রকার অনুষ্ঠান আছে, তাহাকে বন-দেবতা পূজা বলিতে পারা যায়। এই বনদেবতার উদ্দেশে কিন্তু মানত থাকে, প্রায় শিশুর মঙ্গল এই মানতের উদ্দেশ্য, সেই মানত রক্ষা করিতে গৃহস্থ একদিন প্রত্যূষে একটি মুর্গি লইয়া গ্রামের বাহিরে যায়, সেই স্থানে বনদেবতাকে আহ্বান করিয়া সেই মুর্গি মারে, এই ভাবে তাহারা মানত পরিপূর্ণ করে।

ইহাদের আর একটি পূজার কথা বলা প্রয়োজন, ইহার নাম ধর্ম্ম পূজা। মনসাপূজা আর কালীপূজার উৎসবের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, ধর্ম্মপূজার তাহা নাই, এস্থানে শেষ যে ধর্ম্মপূজা হয় তাহা সতর বৎসর পরে হইয়াছিল; ইহার বৎসর, মাস বা তিথি নাই, তবে রবিবার দিন এই পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ, উহাদের মধ্যে একজন শিক্ষিত মাহাতো বলিল, উহা সৌর উপাসনা। পূজার বিধি বা নিয়ম কিছুই নাই, যাহা আছে তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। এ স্থানের মাহাতোদিগের মধ্যে অনেক বিভাগ আছে, তাহাদিগকে ইহারা 'গোত' (গোত্র) বলে। কশ্যপ, হিন্দুআড়, কাঠোআড় প্রভৃতি এই সকল গোত্রের নাম, ইহাদের মধ্যে হিন্দুআড় গোত সর্ব্বপ্রধান, যদিও এই শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত নয়। হিন্দুআড় গোত্রের মধ্যে

একটি বংশে এই ধর্ম্মপূজার যাজকত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, এ জেলার অপরাপর অংশে ভিন্ন গোত্রীয় লোকেরা এই কাজ করে। পূজার প্রণালী অতি সামান্য, একটি বেদী প্রস্তুত করিতে হয় তাহার উপর একটি তুলসী গাছ রাখা হয়, ইহাকে বলে নারায়ণস্থাপন; যেদিন পূজা হইবে তাহার পূর্ব্বরাত্রে 'ধর্ম্মপুস্তক' পাঠ হয়; কোন বিশেষ 'ধর্ম্মপুস্তক' নির্দ্দিষ্ট নাই। নিকটস্থ গ্রামে শেষ বারে যে ধর্ম্মপূজা হইয়াছিল তাহাতে রাত্রিকালে ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল পাঠ হয়, গ্রামের নরনারী তাহাই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শুনিয়াছিল। পরদিন প্রাতে সকলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসে ও প্রত্যেকে বেদীর সম্মুখে যথাসাধ্য উপঢৌকন নিবেদন করে;—এই হইল পূজা। উপঢৌকনের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য হয় না, পঞ্চাশ ষাট মন চাউল, ষাট সত্তর পাঁঠা অন্ততঃপক্ষে জমে। কেবল মাহাতোরা নয় অপর বিভাগস্থ লোকেরা এমন কি গ্রামবাসী মুসলমান জোলারা পর্য্যন্ত উপঢৌকনের অংশ পায়, মাহাতো ভিন্ন সকলে আপনা আপনি রাঁধিয়া খায়।

উপরে যে কয়প্রকার পূজা ও উৎসবের উল্লেখ হইল, তাহাতে মাহাতোদিগের ধর্ম্মের মিশ্রিত ভাব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে বনদেবতার পূজা আছে, আদিমনিবাসীদিগের সাপ-পূজা, পৌরাণিক কড়ায় পাক-করা মনসাদেবী আছে; চণ্ডাল (অবৈদিক) মাতঙ্গমুনির ধর্ম্মপৃষ্ঠ আশ্রমে পূজিত ধর্ম্মপূজা আছে, বিকৃত বৌদ্ধ-বিকৃত হিন্দুধর্ম্ম-সমুদ্ভবা চণ্ডীরূপিণী কালী আছেন, আর চৈতন্যদেবসংকীর্ত্তিত হরিনাম আছে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে আর কিছু কথার

প্রয়োজন, যাহাতোরা বাঙ্গালা ভাষা বলে, গলার স্বরের ও উচ্চারণ-সম্বন্ধে প্রভেদ থাকিলেও ইহারা বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাই বলে। একটু মনোযোগ করিয়া শুনিলে ইহাদের সাধারণ কথায় এক অদ্ভুত বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। চাষবাস ও বাগানের কাজে আমি প্রধানতঃ তাহাদের সংঘর্ষে আসি। একটা গাছের সম্বন্ধে তাহারা বলিবে 'এ গাছটা রাগ দিচ্ছে না', নিম্ন বাঙ্গালায় সে স্থলে বলে, 'গাছটার তেমন তেজ নাই', জমিতে হাল বসিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে 'বাহা জমিতে বসিবে খিল জমিতে বসিবে না,' ভিজা মাটিকে বলে অদা জমি (আর্দ্র কথার অপভ্রংশ), মাটিতে রস আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে মাটি সজীব আছে, বীজে কল বেরুলে বলে আঁকুর (অঙ্কুর) দিবে, গর্ত্ত বুজানকে বলে মুদে দেওয়া (মুদিত), অল্পবয়স্ক ষাঁড় হালের জন্যে 'ব্রেক' করাকে বলে দামান, সংস্কৃতভাষায় এরূপ ষাঁড়কে বলে দম্য, তাহারা যে ঢোল বাজায় তাহাকে বলে মাদোল, সংস্কৃত শব্দ মর্দ্দল ; ধনুককে বলে কাঁড়, সংস্কৃত কাণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। এরূপ উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে, উপরে রাগ কথাটি অতি সুন্দর, ইহার পরিবর্ত্তিত রূপ আমরা 'অনুরাগে' দেখিতে পাই, খিল শব্দ অমরকোষে আছে, যে জমিতে হাল দেওয়া হয় নাই তাহাকে খিল বলে।

ইহাদের ভাষা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একসময়ে এমন ভাষা বলিত যাহা সংস্কৃত ভাষা না হইলেও সংস্কৃত ভাষার সহিত সেই ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সচরাচর বাঙ্গালীদের চলিত ভাষায় যতদূর সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণ আছে

তদপেক্ষা অধিক ছিল, আর ইহারা অধিকতর শুদ্ধভাবে সেই কথাগুলি ব্যবহার করে; অথচ আমরা তাহাদিগকে সাঁওতাল, বর্ব্বর প্রভৃতি বলি। আর ইংরেজশাসনকর্ত্তৃগণ তাহাদিগকে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের হইতে পৃথক্ করেন, ও তাহাদিগকে অধঃ-পতিত জাতি, আদিমনিবাসী, ভূত-উপাসক (এনিমিষ্ট্) প্রভৃতি নাম দিয়াছেন।

কুর্ম্মী ভিন্ন এ অঞ্চলে আরও অনেক বিভাগ আছে, রাজোয়াড়, ভূমিজ, নাপিত, কুমার, লোহার, মুদী (মাটির কাজ করে), কলু, বাউরী, হাড়ী, প্রভৃতি নানা বিভাগ আছে, ইহাদের মধ্যে সামাজিক বিচারে কেহ বা উচ্চ, কেহ বা নীচ, রাজোয়াড়ের জল মাহাতো ছোঁয় না, রাজোয়াড়েরা হাড়ীর জল ছোঁয় না, কলুরা সাঙ্গা করে, নাপিতেরা তাহা করে না; এইরূপ কোনও না কোন বিশেষত্ব প্রতি বিভাগেই আছে। গত কয় বৎসর ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক বিভাগ আপন সম্প্রদায়কে সংস্কৃত ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছে, ও তাহার নিমিত্ত বিভাগীয় সভাসমিতি গঠন করিতেছে। এ বিষয়ে মাহাতোরা বিশেষ উদ্‌যোগী, ইহারা ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আপনাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচলনের চেষ্টা করিতেছে, সামাজিক সংস্কারের জন্য নিয়ম করিতেছে। তাহাদের মধ্যে গুটিকতক—এই সাঙ্গা পদ্ধতি উঠাইতে হইবে, স্ত্রী পুরুষের নাচ বন্ধ করিতে হইবে, স্ত্রীলোকেরা মাথায় ঘোম্‌টা দিবে, মুর্গী খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

উপরে নাপিত, কুমার, লোহারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছি ইহাদের সহিত নিম্নবাঙ্গালার নাপিত, কুমার, কর্ম্মকারদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, বাঙ্গালাদেশে তাহারা জলচল বলিয়া গণিত;

এদেশের নাপিত, কুমার, কর্ম্মকার প্রভৃতি লোকেরা বাঙ্গালার অপর স্থান হইতে আগত ব্রাহ্মণ অথবা অপর হিন্দু বাঙ্গালীদের চক্ষে অস্পৃশ্য। ইহারা সকলেই এখন নিম্নবাঙ্গালার আচারব্যবহার আপনাদের মধ্যে প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছে, লোহাররা এখন কর্ম্মকার বলিয়া পরিচয় দেয়, কুমার, নাপিতেরা নিম্ন বাঙ্গালার কুম্ভকার নাপিতদের সহিত একতা প্রতিপন্ন করে।

সাঁওতালদের কথার পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে, অনেকে মনে করেন যে এক সময়ে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমতল ভূমিতে বাস করিত, সমতল শব্দ হইতে সাঁওতাল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এ অঞ্চলে তিন প্রকার সাঁওতাল দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম, যাহারা সকলে মিলিয়া এক গ্রামে বাস করে, সে গ্রামে সাঁওতাল ব্যতীত অন্য কেহ বাস করে না, ইহারা সাঁওতালী ভাষা বলে, বাঙ্গালা বুঝে না, নিজেদের দেবদেবী পূজা করে, ইহারা গোখাদক, পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু-দিগের হইতে আচার ব্যবহারে পৃথক্ ও বিভিন্ন। দ্বিতীয় প্রকার সাঁওতাল, যাহাদের ছেলেরা বাঙ্গালা স্কুলে পড়ে, বাঙ্গালীদের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, তাহাদের সহিত বাঙ্গালী ছেলেদের কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ ঘরে গিয়া তাহারা সাঁওতালী ভাষা বলে, আর অপর অপর বিষয়ে সাঁওতালদের আচার অনুপালন করে। তৃতীয়তঃ আর একশ্রেণী সাঁওতাল আছে, যাহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়, এবং ব্রাহ্মণেরা বাস করে, ইহারা প্রায় অর্থশালী জমিদার, কেহ কেহ রায় উপাধি গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সহিত পার্শ্বস্থিত ভূমিজ (ক্ষত্রিয়) জমিদারদের কোন প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

মানভূম জেলায় এখন যাহা ঘটিতেছে, এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে, আর বোধ হয়, ভারতবর্ষের অপর অপর প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। যখন চীন পরিব্রাজক ফা হীয়েন পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে পাটলিপুত্র দেখিতে যান, তিনি দেখিলেন একটি বিশাল নগরী ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল—তাহারা নিজেদের পিতা পিতামহদের মুখে শুনিয়াছে যে এক সময়ে দানবেরা এস্থানে একটি বৃহৎ নগর স্থাপন করিয়াছিল, সময়ে সে নগর ধ্বংস পাইয়াছে, ইহার অধিক তাহারা আর কিছু জানে না। ইজিপ্ট, গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশে এখনও পূর্ব্বসভ্যতার অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এক সভ্যতা নয়, নানা প্রকার সভ্যতার উদয় হইয়াছিল, স্থিতি হইয়াছিল এবং নাশও হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ব্যতীত, বৈদিকসভ্যতার আর কোন চিহ্ন আছে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ব্রাহ্মণ্যযুগের সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে, কিন্তু বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্ন যথেষ্ট আছে। এখন যাহা কিছু পুরাতন মন্দির, স্তূপ, স্তম্ভ, ভাস্কর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় সকলই বৌদ্ধযুগে কৃত। তাহার পরের যুগে যাহা কিছু গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও অবিমিশ্রিত ব্রাহ্মণ্য বলা যায় কিনা সন্দেহ।

যাহাকে আমরা এখন বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ বলি, তাহারও ইতি-হাস ইহার অনুরূপ, মানভূম জেলায় যেমন নানাপ্রকার ধর্ম্মের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহাদের পরিবর্ত্তন, ধ্বংস, পুনর্গঠন দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে সেইরূপ ঘটিয়াছিল, এখনও ঘটিতেছে; প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গঠন, পরি-বর্ত্তন ও নাশ, বর্ত্তমান জাতিগঠনের মূল কারণ। চৈতন্যদেব বাঙ্গালা-

দেশকে একধর্ম্মে দীক্ষিত করেন কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশের অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় পৌরাণিক আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সময়ে মানভূমেও তাহাই ঘটিবে। এই পৌরাণিক ধর্ম্ম হইল বর্ত্তমানকালের হিন্দুধর্ম্ম, ব্রাহ্মণেরা এই ধর্ম্ম সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার রক্ষক ও অভিভাবক। এই পৌরাণিক ধর্ম্মের বন্ধনকে তাঁহারা বলেন বেদরক্ষা। বাঙ্গালাদেশের লোক এক সময়ে নানাপ্রকার বিকৃত বৌদ্ধ ও বিকৃত ব্রাহ্মণ্য এবং এই উভয়ের সংমিশ্রণে জাত অগণিত ধর্ম্মে ও সেই সকল ধর্ম্মহেতু অগণিত বিভাগে বিভক্ত ছিল। এই সকল লোকেরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে; এক সময়ে মনে হইয়াছিল একধর্ম্মের ফলে বাঙ্গালীদিগের মধ্য হইতে সামাজিক ভেদ ও বিভাগ উঠিয়া যাইবে, কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। বাঙ্গালীরা পুনরায় পৌরাণিক ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আসিল, এ ধর্ম্মের প্রভু হইলেন ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। পৌরাণিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতরদিগকে, তাহাদের পূর্ব্বে সামাজিক অবস্থার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই। বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান জাতিগঠনের বোধ হয় ইহাই ইতিহাস, ইহাতে অনৈসর্গিক অথবা অদ্ভুত কিছুই নাই।

অদ্ভুতের মধ্যে একটিমাত্র সামগ্রী আছে, ব্রাহ্মণদের প্রভাবের ন্যায় পৃথিবীতে কোন দেশে কোন সময়ে কোন শ্রেণী লোকদের প্রভাব হয় নাই। আজ প্রায় সাড়ে বার শত বৎসর এই প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বাড়িয়াছে ও এখনও বাড়িতেছে। ইহার একমাত্র কারণ দেশের লোকের অজ্ঞতা, যাহার অপর নাম মানসিক দুর্ব্বলতা।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

চৈতন্যদেব চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন—বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সৌর শাক্ত প্রভৃতি পন্থার ন্যায় বেদপ্রসূত ধর্ম্ম। পঞ্চ মহাকল্পাঃ সৌরশাক্তগাণেশশৈববৈষ্ণবাগমাস্তৎ-প্রতিপাদ্যাঃ (৪—৩৩৮ অঃ শান্তি টীকা) (সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ আগমপ্রতিপাদ্য, এই নিমিত্ত পঞ্চকল্প); তবে আমরা বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগকে দাস বলি কেন? দাস অর্থে 'শূদ্রধর্ম্মা' অর্থাৎ অবৈদিক।

জাতীয়তা-জ্ঞান।

আজ কয় বৎসরের কথা বলিতেছি, কাহার কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে যে, সেই সময়ে প্রতিবৎসর বসন্তকালে দক্ষিণ কলিকাতায় কালীঘাটে একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইত। দশ পনর দিন ধরিয়া প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তার পর বক্তা এই স্থানে বক্তৃতা দিতেন। এইরূপ সভায় তর্ক বা বিচার হইত না, বক্তারা নিজেদের মত প্রকাশ করিতেন মাত্র। এই রূপ এক সভায় এক অপরাহ্নে আমি আমাদের স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি যেরূপ আচরণ করি সে সম্বন্ধে কিছু বলি। আমার পরে একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত আমার কথার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ কিছু বলেন। বর্ত্তমান শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের মধ্যে পণ্ডিতটির বিশেষ প্রতিপত্তি আছে; তিনি নানা উপাধি দ্বারা বিভূষিত, কলিকাতায় তাঁহার একটি চতুষ্পাঠী আছে; অনেকের মতে তিনি এখন বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কয় বৎসর হইল সরকার বাহাদুর তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়া অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমার কথা

লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন যে, যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি তাহা-দিগকে আমরা (অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ ব্রাহ্মণেরা) ঘৃণা করি না, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তাহাদের মধ্যে এরূপ সঞ্চিত পাপরাশি আছে যে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সেই পাপ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। কেবল শাস্ত্রব্যবসায়ী ও ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিত নয়, সকল ব্রাহ্মণ ও 'উচ্চ' জাতিদিগের মনে এই প্রকার ধারণা আছে। এ পাপরাশি কি প্রকার, কি করিয়া কোটি কোটি হিন্দু বাঙ্গালী নরনারীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে সেই পাপরাশি কি প্রকারে সংক্রামিত হয় এবং সংক্রামিত হইলে কি ফল হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোনরূপ সংবাদ প্রদান করেন না। তবে তাঁহারা একথা চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন এবং দেশের লোকেরা সেই কথা মানিয়া আসিতেছে। আর যাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে তাহারাও নীরবে এই কথা শুনিতেছে। এই ভাব বাঙ্গালাদেশে প্রায় এক সহস্র বৎসর চলিতেছে।

বাঙ্গালাদেশে জাতিভেদের কারণ এখন কিছু কিছু বুঝিতে পারি। বৌদ্ধ ও অপরাপর অবৈদিকদিগের সহিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-অন্তর্গত ক্ষত্রিয়েরা, যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিল ; সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারতবর্ষমধ্যে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, বিশুদ্ধতা ও প্রভুত্ব রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণেরা স্মৃতিগুলি রচনা করেন। দেশ দুই প্রকার লোকের দ্বারা বিভক্ত হইল, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ; এই অব্রাহ্মণদের নাম হইল শূদ্র। বাঙ্গালাদেশে নানাপ্রকার অবৈদিক সম্প্রদায় ছিল, এখন আমরা যাহাদিগকে চণ্ডাল, বাগ্‌দী, রাজবংশী, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি

বলি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বৈদিকদিগের প্রতিকূল নয়নে পড়িয়াছিলেন, এখন ব্রাহ্মণেরা ভুলিয়া গিয়াছেন, কি কারণে এই সকল বিভাগ এক সময়ে পতিত হইয়াছিল, তবে সহস্র বৎসর পরেও পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি যে ভাব ছিল সেই ভাব একরূপ আছে।

কর্ম্মভেদে সামাজিক বিভাগ চিরকালই আছে ; মানভূম জেলায় এই প্রকার বিভাগ (জাতি)-গঠনের প্রণালী এখনও চখের সামনে চলিতেছে। এইভাবে কর্ম্ম-অনুসারে বাঙ্গালীদের মধ্যে নবশাখপ্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়। তবে ইহারা অব্রাহ্মণ ছিল, সুতরাং শূদ্রদিগের মধ্যে গণিত হইল। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই যাহা ঘটিয়াছিল বাঙ্গালা দেশেও তাহাই হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা প্রায় সকলেই এক সময়ে শূদ্রসমান হইয়াছিল ও শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল ; সেই কারণে শিল্পবাণিজ্য-উপজীবিগণ বাঙ্গালাদেশে শূদ্র ; তবে নবশাখেরা কেন শুদ্ধ, আর সূত্রধর ও স্বর্ণকারেরা শুদ্ধ নয়, এ প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারে না। কেন পশ্চিমবাঙ্গালায় মিত্র কুলীন, আর গুহ মৌলিক ; আর পূর্ব্ববাঙ্গালায় তাহার বিপরীত, কেহ বলিতে পারে না। সেইরূপ কেন বলেশ্বরীর পশ্চিমে কৈবর্ত্তেরা জল-চল ও ঐ নদীর পূর্ব্বে তাহারা অচল, এসকল প্রশ্নের উত্তর এখন কেহ দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙ্গালা যেরূপ ছিল, এখনও তাহাই আছে। বাঙ্গালা ম্লেচ্ছদেশ (যেদেশে দুই বর্ণ থাকে, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলে) বাঙ্গালায় দুই বর্ণ মাত্র আছে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ; ব্রাহ্মণব্যতীত সকলেই শূদ্র। তবে গত সহস্র বৎসরে কিছু যে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা সত্য নয়। সৎশূদ্র বলিয়া একটি শ্রেণী গঠিত হইয়াছে ; স্মৃতিতে সৎশূদ্র বলিয়া কোন শব্দ নাই। এ

সৎশূদ্র শ্রেণীর গঠন একটু ভাবিবার সামগ্রী, কে তাহাদিগকে সৎশূদ্র করিল, কবে তাহারা সৎশূদ্র হইল, এরূপ প্রশ্নের কেহ উত্তর দিতে পারে না। এখন বাঙ্গালীদের সকল বিভাগেই সামাজিক জাগরণের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা এরূপ চেষ্টাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং উপহাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন, তবে যাহাদিগের কথা হইতেছে তাহারা ইতর, পূর্ব্বেও যেমন দূরে থাকিত এখনও সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের হইতে দূরে ও পৃথক্ থাকে। তাহাদিগের নিকটে আসিবার শাস্ত্রব্যবসায়ী অথবা ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ কোন প্রয়োজন মনে করেন না।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে অবৈদিক অর্থাৎ শূদ্রদিগের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের মনের ভাব যেরূপ ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ আছে। ব্রাহ্মণ তখন নিজেদের সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রাহ্মণ দেবতারও দেবতা, গর্ভস্থ ব্রাহ্মণকে স্বয়ং ভগবান্‌ও প্রণাম করেন, স্বয়ং ভগবান্ ব্রাহ্মণের পদাঘাত-চিহ্ন নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, ব্রাহ্মণের কৃপায় স্বর্গে দেবতারা দেবত্ব করেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু ধনরত্ন আছে সে সকলই ব্রাহ্মণের নিজস্ব, ব্রাহ্মণ শতদোষে লিপ্ত হইলেও সকলের পূজনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ভাবিতেন, এখনও ধর্ম্ম ও শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ভাবেন, তখনও ব্রাহ্মণ স্বদেশ অথবা স্বজাতি বলিয়া কোন কথা বিশ্বাস করিতেন না, এখনও করেন না।

ইতিহাস-পাঠকদিগের পক্ষে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা-পরিবর্ত্তন অতিশয় কৌতূহলজনক ও শিক্ষার সামগ্রী। ব্রাহ্মণ্যযুগে অর্থাৎ, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা বেদ ধারণ ও বহন করিতেন,

বৌদ্ধযুগের শেষভাগে, বোধ হয় খৃষ্টীয় অব্দের আরম্ভে সমগ্র বেদ ভারতবর্ষ হইতে প্রায় লোপ পায়, কোথায় কোথায় বা দেখা যাইত, ব্রাহ্মণেরা ভিন্ন ভিন্ন বেদের শাখামাত্র ধারণ করিতেন; এই হইল ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পরাজয়। সে বেদ আর ব্রাহ্মণেরা পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবৈদিকদিগের সহিত বিরোধের ফলে জাতীয় জীবন হইতে বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রায় একরূপ লোপ পাইল। ব্রাহ্মণেরা যাহাদিগকে শূদ্র বলিত সেই শূদ্র সন্ন্যাসীরা শিক্ষক হইল; কর্ম্মপন্থা-পরিত্যাগী সন্ন্যাসিগণ তাহাদের শিক্ষা দেশ-মধ্যে প্রচার করিল, প্রকৃতপক্ষে দেশের যে শিক্ষা হইল তাহা নিবৃত্তি ও বৈরাগ্য-মূলক। এই শিক্ষা কেবল দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্ম হইল এমন নহে, এশিক্ষা ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করিল। এ বিষয়ে শূদ্র সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণদিগেরও গুরু হইল। প্রতিমাপূজা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণেরা পাইয়াছেন; যজ্ঞ লোপ হইয়া এই প্রতিমাপূজা ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মের মধ্যে প্রধান কর্ম্ম হইল।

ব্রাহ্মণদের বলবৃদ্ধির সহিত শূদ্রদিগের প্রতি তাহাদের কঠোর-তার বৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বে তাঁহারা শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ করাইতেন, এখন শূদ্রদিগকে কোন প্রকার শিক্ষা দেওয়া পাপ বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহাদিগের পক্ষে পৌরাণিক উপকথা, তীর্থদর্শন আর ব্রাহ্মণ-দিগকে দান হইল পরলোকের সদ্গতির উপায়। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যযুগে দেশ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল, বৌদ্ধযুগের পর অর্থাৎ নব ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণেরা চতুর্ব্বর্ণ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই; ইহাই হইল ব্রাহ্মণদের সর্ব্বাপেক্ষা পরাজয়।

তখন সে শক্তি তাঁহাদের ছিল না, অগত্যা নিজদিগকে দেশের অবৈদিক (শূদ্র) জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করিলেন। আপনাদের ভিন্ন অপর সকলের নাম দিলেন ইতর, পনর আনা দেশের লোক হইল পৃথক্। হিন্দুদিগের ভাগ্যলিপি এই স্থানে লিখিত হইল।

ব্রাহ্মণদিগের দুর্ব্বলতা ও পতনের এ শেষ কথা নয়, নিজদিগকে শুদ্ধ রাখিতে ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে বাস্তবিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে নিজেদের মধ্যে বেদ রক্ষিত হয় তাহার নিমিত্ত অনেক নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতেন যেমন চর্ম্মময় হস্তী, যেমন কাষ্ঠময় মৃগ, সেইরূপ বেদে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের হাতে যতটুকু ক্ষমতা ছিল নিজেদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা রাখিতে তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। শ্রৌত ব্রাহ্মণ দেশ হইতে লোপ পাইল, তাহার স্থানে রহিল অশিক্ষিত গ্রামযাজক, প্রতিমাপূজক, আর দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। সব গিয়া একটিমাত্র সামগ্রী অবশিষ্ট রহিল তাহা ব্রাহ্মণত্বের অভিমান; সময়ে যে অনুপাতে ব্রাহ্মণদের পতন হইল, সেই অনুপাতে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান বাড়িল।

বৌদ্ধদিগের সহিত বিরোধের শেষে ব্রাহ্মণদিগের জয় হইল, কিন্তু জয়লাভের ফলে তাঁহাদের শক্তির বৃদ্ধি হইল না, ইহার অনুরূপ উদাহরণ অপর স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। হলাণ্ডবাসীদিগের সহিত স্পেন্‌বাসীদিগের প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হয়, শেষে হলাণ্ডের জয় হইল। ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে এক সময়ে হলাণ্ডের অনেক বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান ছিল, তাহা আর রহিল না। বৌদ্ধদিগের সহিত সহস্রবর্ষব্যাপী সংগ্রামের ফলে দেশের লোকের—

ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের আর কোন বল রহিল না; না নৈতিক, না মানসিক, না দৈহিক। ব্রাহ্মণকে বেদের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা—কর্ম্ম প্রথমে পরিত্যাগ করিতে হইল, প্রবৃত্তিমূলক গৃহজীবন পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল। কর্ম্ম শিক্ষার স্থলে শিক্ষা হইল বৈরাগ্য। যাহা অবৈদিক ধর্ম্ম, যাহা কিছু উপধর্ম্ম, সে সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ করিতে হইল; কেবল গ্রহণ নয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। এস্থলে শূদ্রেরা অর্থাৎ অবৈদিকেরা তাহাদের প্রতিশোধ লইল, তবে ইহার ফলে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব রক্ষার সুযোগ হইল। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ছিল অবৈদিক-দিগের (শূদ্র) মধ্যে তাহা ছিল না। ব্রাহ্মণদের বশে আসিয়া বৌদ্ধদিগের হারীতি দেবী শীতলা হইলেন, জরৎকারু মনসা হইলেন, ছয়জন রাক্ষসী মাতৃকাগণ ষষ্ঠী হইলেন, ডাকিনী চণ্ডী আদ্যাশক্তি হইলেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে গঙ্গাজলে ধুইয়া রাঙ্গা চেলির শাড়ী পরাইলেন, তাহাদের স্তবের জন্য অনুষ্টুপ্ ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিলেন, আতপ তণ্ডুল ও কদলীর নৈবেদ্য বিধান করিলেন, আলিপনা ধূপ ধুনা শঙ্খ ঘণ্টার আয়োজন হইল। ব্রাহ্মণেরা এইসব করিলেন, আর শূদ্রেরা গললগ্নীকৃতবাস হইয়া পূজারী ব্রাহ্মণদের চরণ বন্দনা করিল। এরূপ ঘৃণিত আচরণ নাই যাহা ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগের প্রতি বিধান করেন নাই, এখন ব্রাহ্মণ হইলেন তাহাদের ধর্ম্মের শিক্ষক, স্বর্গ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যাহারা পূর্ব্বে অবৈদিক ছিল, যাহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা শূদ্র নাম দিয়াছিলেন তাহারা এখন নিজদিগকে দাস বলিয়া পরিচয় দিতে শ্লাঘা মনে করিল।

ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের মুখে চিরদিন এক কথা আছে,—

আমরা ধর্ম্মরক্ষা করিতেছি ; যদি কেহ তাঁহাদিগকে বলে যে বেদ-প্রবর্ত্তন-হেতু তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে, সে কথার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে—তাঁহারা যাহা করেন তাহাই বেদরক্ষা। শূদ্র-দিগের প্রতি আচরণের নিমিত্ত যদি কেহ কিছু বলে—তাহা হইলে তাঁহারা একই উত্তর দেন, যে, ঐরূপ আচরণ দ্বারা তাঁহারা বেদ রক্ষা করিতেছেন ও বেদরক্ষার নিমিত্ত ঐরূপ আচরণের বিশেষ প্রয়োজন। শূদ্রদিগের মধ্যে সঞ্চিত পাপরাশি আছে, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে তাঁহারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা সেই পাপস্পৃষ্ট হইবেন আর বেদরক্ষা করিতে পারিবেন না। তবে তাঁহারা কাহাকে বেদরক্ষা বলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ।

ভারতবাসীরা মরিল কবে? এপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, এ বিশাল দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা সকলে এক সময়ে মরে নাই তাহা নিশ্চয়। কিন্তু সময়ে সকল প্রদেশের লোকের একই অবস্থা হইল, ধীরে ধীরে ভারতবাসীদিগের ভাগ্যলিপি প্রস্তুত হইতে লাগিল। দেশমধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন তাঁহারা আপনাদিগকে দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন হইতে পৃথক্ রাখিলেন, তাহাদের নাম দিলেন শূদ্র ও ইতর, এই শূদ্রেরা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অথবা উপজীবিকা-ভেদে শত শত ভাগে বিভক্ত হইল। কোন বিভাগের সহিত অপর বিভাগের কোন সম্বন্ধ রহিল না ; পরস্পর মধ্যে রহিল কেবল ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ। মহাভারতের সময় অর্থাৎ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের মধ্যে কিছু জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ স্মৃতিযুগের আরম্ভে ভারতবর্ষ মৃত লোকের দেশ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তখন দেশের পনর আনার অধিক লোকের নাম হইয়াছে শূদ্র। তখনই শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান কুকুর শিয়ালদিগের অপেক্ষা হীনতর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। সময়ে ইহাই দেশের পনর আনা লোকের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল, তাহারাও বিনা প্রতিবাদে এই অবস্থা অঙ্গীকার করিল। আজ সহস্র বৎসরের অধিক শূদ্রদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের মনের ভাব একই প্রকারে আছে; তিলমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

চলেদ্ধি হিমবান্ শৈলো মেদিনী শতধা ফলেৎ।
দ্যৌঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা···

তথাপি শূদ্রদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—যদি দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পৈতৃক সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন। ইহার উত্তরে দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন,—

যাবদ্ধি সূচ্যাস্তীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥

১৮—৫৮ অঃ উদ্।

সুতীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগদ্বারা যাহা বিদ্ধ হইতে পারে, আমাদিগের তাবৎ পরিমিত ভূমিও পাণ্ডবদিগকে অর্পিত হইবে না। ব্রাহ্মণেরাও তদ্রূপ বলেন—তবে তাঁহাদের মুখে ইহা বলদৃপ্তের হুঙ্কার নহে, কাষ্ঠত্বপ্রাপ্ত জীবনহীন বিকৃতমস্তিষ্কের আর্ত্তনাদ।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

কি কারণে মুসলমানেরা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এত সহজে উত্তর ভারতবর্ষ, বিশেষ বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ উত্তর বোধ হয় কেহ দিতে পারিবে না। রাজা গণেশ মুসলমানদিগের অধীনে একজন ভূঞা রাজা ছিলেন। যখন তিনি হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপন করেন তখন মুসলমানেরা এদেশে দেড়শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। রাজা গণেশকে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিতে যে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহাও বোধ হয় না, তিনি সাত বৎসর কাল রাজত্ব করেন, পুনরায় মুসলমানদিগের রাজত্ব স্থাপিত হয়, তাহা যুদ্ধের ফলে নয়। কথাগুলি একত্র করিলে সেই সময়ের দেশের অবস্থার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে, যদি বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে কিছুমাত্র একতা থাকিত কিংবা দেশের লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে মুসলমানেরা কখন বাঙ্গালা জয় করিতে পারিত না, যুদ্ধে জয়ী হইলেও তাহাদের রাজত্ব কখন স্থায়ী হইত না। আর যদি স্বজাতি ও স্বদেশবাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কোনপ্রকার সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশে এত সংখ্যায় হিন্দু মুসলমান হইত না। আমরা সেকালের সাহিত্য হইতে হিন্দুদিগের যে চিত্র দেখি তাহা হইতে দেশে একতা থাকা দূরে থাকুক, একপ্রকার সেসময়ে ধারাবাহিক ও অবিরাম গৃহবিবাদ চলিতেছিল তাহাই মনে হয়। দেশ তখন পরস্পরবিরোধী অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তাহাদের সহিত একতা একথা ব্রাহ্মণেরা তখনও বুঝিতেন না এখনও বুঝেন না; ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের মনে একতা শব্দের অর্থ একাকার, ব্রাহ্মণ শূদ্রে একাকার একথা বলিলে তাঁহারা চিরদিন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়

হন, আর নীচ, হীন, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র, যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে পাপ সংক্রামিত হয় তাহাদের সহিত সহানুভূতি, একথার অর্থ ব্রাহ্মণেরা কোনদিনও বুঝিতে পারেন নাই। মুসলমানেরা যখন দেব-দেবীর মন্দির ভাঙ্গিত, তখন যে 'ইতর' বাঙ্গালীরা কেন হাসিত তাহা এখন বুঝা যায়। রাজা বল্লালসেন বাঙ্গালার বৈদিক ও অবৈদিক দিগের রাজা ছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তিনি অবৈদিকদিগের জন্য যে কিছু করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত কোথাও নাই; মুসলমান-বিজয়ের পর যতই সময় যাইতে লাগিল ততই ব্রাহ্মণদের শক্তি বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহারা অবৈদিক ছিল তাহাদের সন্ততিগণ ব্রাহ্মণদের কল্পিত পৌরাণিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণের শাসন ও শূদ্রদিগের প্রতি কঠোরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শূদ্রেরা পশু অপেক্ষা নিম্নে, সমাজের প্রান্তে স্থান অধিকার করিল, এই ভাব সময়ে বাঙ্গালাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা হইল।

বাঙ্গালাদেশে এখন ব্রাহ্মণদের যে প্রকার শক্তি, ভারতবর্ষে কোন প্রদেশে ব্রাহ্মণের সেরূপ শক্তি নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে শত-করা বিশজন হিন্দু অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণশাসিত বাঙ্গালাদেশে শতকরা হিন্দু-দিগের মধ্যে ষাটজন অস্পৃশ্য। জীবিকার নিমিত্ত ধর্ম্মব্যবসায়ী অথবা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে চিন্তা করিতে হয় না, এ প্রদেশে এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যত অধিক আছে, সেরূপ ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। ভারতবর্ষের সকল ভাগেই দেশের সাধারণ লোকে যে সব কাজ করে সেই সব দেশের ব্রাহ্মণেরা তাহা করেন। সে সব ভাগে ব্রাহ্মণেরা কৃষিকর্ম্ম করে, মোট বয়, শিল্প কর্ম্ম করে, পরিচর্য্যা করে; ইংরেজ-সেনা-বিভাগে প্রথমসংখ্যক পদাতি পল্টন গৌড় ব্রাহ্মণ দ্বারা গঠিত।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ এরূপ কর্ম্ম করেন না; এদেশে ব্রাহ্মণগণ যে পরিমাণে ব্রহ্মোত্তর ও অপরাপর বৃত্তি উপভোগ করেন সেরূপ বাঙ্গালার বাহিরে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা করেন না; বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে প্রতিমাপূজার প্রচলন আছে, যে পরিমাণে বার, তিথি, গ্রহ, নক্ষত্রপূজা, ব্রত, নিয়ম, নৈত্যিক, নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে, ভারতবর্ষের অন্যত্র তাহার দশমাংশের একাংশও কোথাও নাই। বাঙ্গালার নবপঞ্জিকা-সদৃশ কোন গ্রন্থ ভারতবর্ষে নাই, সকল প্রদেশেই অনেক হিন্দুর গৃহে নিত্য দেবপূজা হয়, প্রায় সব স্থলেই গৃহস্বামী পূজা করে; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে পুরোহিত আসিয়া পূজা করে; হিন্দু বাঙ্গালীর গৃহে গুরুর স্থান যে প্রকার উচ্চ, সে প্রকার বোধ হয় মান্দ্রাজব্যতীত ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; বাঙ্গালী ধর্ম্মব্যবসায়ী বা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের যেরূপ কঠোর শাসন, সেরূপ শাসন অন্য প্রদেশে ব্রাহ্মণের নাই। ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিতে হইলে বলিতে হয়, দণ্ডবৎ অর্থাৎ 'ভবতঃ অগ্রে দণ্ডবৎ প্রণমামি, নতু প্রাণিবৎ কা কথা মনুষ্যবৎ'; মনুষ্যত্বের অভিমান, মনুষ্যের আত্মসম্মানজ্ঞান এককালে নিষ্পেষিত ও বিলুপ্ত না হইলে কখন কেহ এ কথা বলে না। যখন পর্য্যন্ত ইংরেজেরা সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে নাই, তখন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে সর্ব্ব অধিক সংখ্যায় স্ত্রীলোক সতী হইত। বিধবাদিগের প্রতি কঠোরতায়, বিশেষ অসহায়া বালবিধবাদিগের প্রতি পৈশাচিক আচরণে সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে বাঙ্গালাদেশ অদ্বিতীয়, প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত, সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষমধ্যে সেই প্রদেশে কেবল বাপ-মায়ে ব্রাহ্মণের ভয়ে বালিকা বিধবা

কন্যাকে একাদশীর দিনে ঘরে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখে, পাছে সে লুকাইয়া জল খায়।

এস্থলে একটু নিবেদন আছে, বিধবাদিগের নিমিত্ত নিয়ম হইল যে তাহারা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিবে ও চিরজীবন ব্রহ্ম-চর্য্যা অবলম্বন করিবে, উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্যা-সম্বন্ধে তাঁহারা কিন্তু (সম্ভবতঃ বিধবা ভিন্ন সকলের জন্য) অন্য এক প্রকার নিয়ম করি-লেন। উপবাসসম্বন্ধে তাঁহারা বলিলেন—

অন্তরা সায়মাশং চ প্রাতরাশং চ যো নরঃ।
সদোপবাসী ভবতি যো ন ভুঙ্‌ক্তেঽন্তরা পুনঃ॥

১০—৯৩ অঃ অনু।

যে মানব প্রাতর্ভোজন ও সায়ংকালে ভোজনের মধ্যে আর পুনরায় ভোজন না করেন, তিনিই সদোপবাসী হন।

আর ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে তাঁহারা নিয়ম করিলেন—

ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি চৈব হ।

১১—৯৩ অঃ অনু।

তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে এ দুটি নিয়ম 'মানব' দিগের নিমিত্ত, বাঙ্গালী বিধবাদিগের নিমিত্ত নহে। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বিধবাদিগের প্রতি ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যবস্থা যে শাস্ত্র-সম্মত সে সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

যঃ কশ্চিন্ন্যায্য আচারঃ সর্ব্বং শাস্ত্রমিতি শ্রুতিঃ।
যদন্যায্যমশাস্ত্রং তদিত্যেষা শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥

৫৮—২৬৮ অঃ শান্তি।

ন্যায়ানুগত যে কোন ব্যবহার তাহাই শাস্ত্র এবং যাহা অন্যায়ানুগত তাহা অশাস্ত্র এইরূপ শ্রুতি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বিধবাদিগের প্রতি আচরণ যে বিশেষ ন্যায়ানুমোদিত সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না, আর নিজেদের সম্বন্ধে উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্যার বিধি যে তুল্যরূপ ন্যায়ানুমোদিত সে সম্বন্ধেও বা কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে? বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতভাষার যেরূপ আলোচনা, এমন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নাই। বাঙ্গালাদেশে টোল বা চতুষ্পাঠীর যেরূপ প্রাচুর্য্য, সেরূপ বাঙ্গালার বাহিরে সমগ্র ভারতবর্ষে নাই। ইংরেজ অধিকারের আরম্ভে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ উন্নত অবস্থা ছিল তাহার সদৃশ অবস্থা তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে তাহাদের কখন হয় নাই; গত দেড় শত বৎসর এ উন্নতির বৃদ্ধি হইয়াছে, হ্রাস হয় নাই। গত বৎসর নয় সহস্র ব্রাহ্মণযুবক সংস্কৃতভাষার উপাধির নিমিত্ত পরীক্ষা দিয়াছিল, ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও দর্শন প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যে পরীক্ষার সামগ্রী। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণদের যাহা পাঠ্য ছিল, বেদ বাদ দিয়া বারশত বৎসর পরে বাঙ্গালার শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ তাহাই একমাত্র আলোচনার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জ্ঞান ও মনের ভাব বারশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল এখনও সেই ভাবে আছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

পৃথিবীতে যে এই বারশত বৎসরে অনন্ত জ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে, সে সকলের প্রতি তাঁহারা অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, স্মৃতির বিধান হইল যে, অন্য শাস্ত্র পাঠ করিলে সবংশে শূদ্রতাপ্রাপ্তি হয়। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে, দেশের

লোকের চক্ষে ইঁহারাই বাঙ্গালাদেশে ধর্ম্ম রক্ষা করেন ও হিন্দুসমাজ শাসন করেন। ইঁহারাই "ব্রাহ্মণো নাম ভগবান্" ইঁহাদের প্রতি অসম্মান ভগবানের প্রতি বিরোধাচরণ, এই কথা দেশের লোকে বিশ্বাস করে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পড়িলে অপর দেশের লোক ভাবিবে যে, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ, বিশেষ বাঙ্গালী শাস্ত্র ও ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ, কি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন প্রাণী, তাহাদের কি প্রভাব, কি তেজ, তাহাদের কি অমানুষিক ক্ষমতা! সহস্র বৎসরের অধিক হইল তাঁহাদের অপ্রতিহত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অচল, অটল, অক্ষুণ্ণ শাসন চলিতেছে। কোটি কোটি নরনারী সহস্র বৎসরেরও অধিক পৃথ্বীন্যস্তমুণ্ডে যুক্তকরে, সেই ভূদেবতার আরাধনা করিতেছে ও তাঁহার অনুশাসন প্রতিপালন করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। ব্রাহ্মণের উচ্ছ্রিত তর্জ্জনীর নিকট ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড ছিন্নতৃণ-খণ্ড মাত্র!

এ কথাগুলির মধ্যে এক বর্ণও সত্য নাই, দেশে ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের কারণ দেশের লোকের অজ্ঞতা। বাঙ্গালীদের মানসিক ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই। কি করিয়া বাঙ্গালীদের ভিতর হইতে মনুষ্যের সহজাত বৃত্তিসকল, আত্মসম্মানজ্ঞান, মনুষ্যত্বের অভিমান নিষ্পেষিত, বিধ্বস্ত, বিলুপ্ত হইয়াছে সে বিষয় আজও কেহ চিন্তা করে নাই। যেরূপ আচরণ অপর দেশের লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, সেইরূপ আচরণ বাঙ্গালীরা নীরবে সহ্য করে। চক্ষের সামনে ভগ্নী, কন্যার সতীত্ব নাশ দেখে, যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয় তাহা দেখে; এমন নির্য্যাতন নাই, পশুতেও যাহা সহ্য করিতে পারে না,

তাহা সহ্য করে। কি কারণে এরূপ মানসিক অবনতি হইয়াছে তাহার বিচার করিবার এ স্থান নয়; তবে এ সকলের জন্য ব্রাহ্মণ দায়ী তাহা সত্য নয়, দেশের লোক মৃত, ব্রাহ্মণও মৃত। শাস্ত্রে অজ্ঞানতাকে মৃত্যু বলে, সেই অজ্ঞানতাই আমাদের মৃত্যুর কারণ।

সকল দেশের লোকে নিজদেশের স্বাধীনতা পরাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তা করে; স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করে, ত্যাগ স্বীকার করে, সকলে একত্রিত হয়, পরস্পরকে উৎসাহিত করে, পরস্পরকে সাহায্য করে। মুসলমানগণ যখন বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিয়াছিল কিংবা যখন হিন্দুদিগকে শাসন করিতেছিল, তখন বাঙ্গালার শাস্ত্র-ব্যবসায়ী অথবা ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ স্বাধীনতা পরাধীনতা সম্বন্ধে যে বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য। অপর পক্ষে তাঁহাদের উদ্বিগ্ন না হইবার যথেষ্ট কারণ তাঁহারা প্রণয়ন অথবা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাণে লিখিত আছে যে, ম্লেচ্ছগণ এদেশ ত্রিশ সহস্র বৎসর শাসন করিবে, পাঁচ সাত শত বৎসর পরাধীনতা মক্ষিকাদংশন মাত্র, উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

রোমের শেষ অবস্থায় সে দেশের দৈবজ্ঞেরা পরস্পরে মিলিত হইলে হাসিত; সেই হাসির মর্ম্ম এই যে "কেমন আমরা দেশের লোকদিগকে ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি"। বাঙ্গলাদেশের বা ভারতবর্ষের অপর অংশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এভাব কখন হয় নাই; তাঁহারা যাহা বলেন তাহা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতার দেবতা, স্বয়ং ভগবানের বক্ষে তাঁহাদের পদাঘাত-চিহ্ন আছে, তাঁহারা বেদ ধারণ করেন; এসকল কথা তাঁহারা প্রকৃত, সত্য ও যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। যে

পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি যিনি বিশ্বাস করেন যে অস্পৃশ্য শূদ্র-দিগের ভিতর এরূপ পাপরাশি সঞ্চিত আছে যে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে সেই পাপ, স্পর্শকারীদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইবে, খুব সম্ভব সেই পণ্ডিতটি এই নারকীয় মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। বোধ হয় তাঁহার সদৃশ সকল পণ্ডিতেই তাহা করে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ব্রাহ্মণ ও স্মৃতি ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আছে, তবে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ করিয়া এমন দুর্গতি কেন হইল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, অনেকগুলি কারণের কথা মনে হয়। বাঙ্গালার দক্ষিণে উড়িষ্যা ও উত্তরপূর্ব্বে আসাম প্রদেশ; মুসলমানেরা কখন উড়িষ্যা জয় করিতে পারে নাই, আসামের পক্ষেও ঐ কথা খাটে। বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে বাঙ্গালাদেশ জয় করিতে বিশেষ আয়াস করিতে হয় নাই, কিন্তু আসাম জয় করিতে গিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে বিফল হন; এবং সেই চেষ্টার ফলে তাঁহার জীবননাশ হয়। যে মুসলমান সেনাপতি আসাম জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার একই পরিণাম হইয়াছিল; উড়িষ্যা ও আসামের নিবিড় বন প্রধানতঃ এই দুইটি দেশকে রক্ষা করিয়াছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালা নদীপ্রধান দেশ; নৌকা করিয়া দেশের সকল অংশে প্রবেশ করা কঠিন ছিল না, আর যে নৌকায় চড়িয়া মুসলমান সৈনিকেরা হিন্দু-দিগকে জয় করিতে যাইত সেই সকল নৌকায় মাঝি মাল্লারা থাকিত অস্পৃশ্য ইতর হিন্দু। মুসলমানেরা বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে জয় করিয়াছিল একথার অর্থ নাই; শাস্ত্রব্যবসায়ী অথবা ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ কখন একথা স্বীকার করিবেন না। প্রাচ্যা দাসাঃ অর্থাৎ শূদ্রধর্ম্মা।" এই দাস ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদের স্বধর্ম্মী একথা বলিলে তাঁহারা ভীষণ

প্রতিবাদ করিবেন। এই হইল প্রাকৃতিক কারণ, অপর কারণের কথাও মনে হয়।

বাঙ্গালার একটু বিশেষত্ব আছে, বৌদ্ধ অথবা বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশে যে ভাবে ও যতদিন পর্য্যন্ত প্রবল ছিল, ভারতবর্ষের অপরস্থানে সেই ভাবে ছিল কিনা সন্দেহ। কেবল বাঙ্গালাদেশে আর কাশ্মীরে এখনও বৌদ্ধ আছে; আর উভয় প্রদেশেই হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের সংখ্যা অনেক অধিক। মহাভারতে আমরা অঙ্গ, মগধ, এমন কি পঞ্চনদেও বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ গ্রহণের ইঙ্গিত পাই, কিন্তু বঙ্গসম্বন্ধে এরূপ কোন উল্লেখ দেখি না। কালে বাঙ্গালাদেশে অবৈদিকগণ একপ্রকার অসংস্কৃত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহা সত্য, কিন্তু তাহারা অশিক্ষিত ছিল এবং তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে কেহ ছিল না। একজন উন্মাদগ্রস্ত রোগী কখন নিজ চেষ্টায় প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না, সেই অবস্থা বাঙ্গালার শূদ্রদিগের ঘটিয়াছিল। চৈতন্যদেব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রথম ও একমাত্র ধর্ম্মশিক্ষক।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি বর্ত্তমান হিন্দুরা একটি মৃত জাতি, আর বারশত বৎসর আমাদের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। দেশের শিক্ষক, দেশের গুরু হইলেন ব্রাহ্মণ, তাঁহারাও মৃত, বোধ হয় সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহাদের জীবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত হীন। বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলকে দাস উপাধি দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সদৃশ অজ্ঞানতার দাস পৃথিবীতে কখন কোন ধর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেখা দেয় নাই। একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী ও ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কেবল জ্ঞানহীন তাহা নহে, অজ্ঞতাই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা, অজ্ঞতাই তাঁহার

শক্তি, অজ্ঞতাই তাঁহার গৌরব, অজ্ঞতাই তাঁহার দেবত্ব। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত কাব্য, স্মৃতি, পুরাণ এই হইল প্রধানতঃ তাঁহার জ্ঞানের সীমা; তাঁহার চক্ষে ইহাদের ঊর্দ্ধে, ইহাদের ব্যতীত আর অন্য জ্ঞান নাই। তবে তাঁহাদের মতে এই সকলের অপেক্ষা বিশিষ্টতর আর একটিমাত্র সামগ্রী আছে, তাহার নাম দেশাচার। বেদরক্ষা যেমন ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য দেশাচার-রক্ষা সেই ভাবে অথবা ততোধিক তাঁহার কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা কতদূর বেদরক্ষা করেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কারণ অনেকদিন দেশ হইতে বেদ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু দেশাচার-রক্ষা ব্রাহ্মণের অধিকার একথায় কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিবে না—নিশ্চলতা পঙ্গুর স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট অবস্থা।

ইহা নূতন কথা নয়, মহাভারতের সময়েও যুদ্ধ চলিতেছিল, যুদ্ধ করিতে হইলে জড়তা চলে না। তখনও শূদ্রদিগের সহিত সামাজিক, নৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আদানপ্রদান চলিতেছিল, কোথাও বা ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজাকে শূদ্রদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে প্ররোচনা দিতেছেন, আর কোথাও বা ম্লেচ্ছাচার্য্য ও মহর্ষি যবনকে দেখিতে পাই। তখনও শূদ্রকে (অবৈদিককে) বেদ শুনাইবে, শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করিবে, এসকল কথা দেখিতে পাই। কিন্তু দুই তিন শত বৎসর পরে, অর্থাৎ স্মৃতিযুগে এ সকলের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শ্রান্তি, অবসাদ, মানসিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা ও মৃত্যুর পূর্ব্বভাব ইহাই কেবল দেখিতে পাই। জীবনের লক্ষণ গতি, মৃত্যুর লক্ষণ নিশ্চলতা, স্মৃতিযুগে নবগঠিত ব্রাহ্মণ্যসমাজ ইজিপ্ট দেশস্থ শুষ্কশবের দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সকল প্রকার চেষ্টায় অনিচ্ছুক

কারণ অশক্ত। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যসমাজ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, জমিয়া গিয়াছিল, প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল, জীবনের যাহা সাধারণ লক্ষণ নড়ন, চড়ন, এমন কি স্পন্দন পর্য্যন্ত বিরহিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় আচাররক্ষা অর্থাৎ যাহা আছে তাহাই রক্ষা পরম ধর্ম্ম, একমাত্র ধর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ হইবে তাহা অনিবার্য্য। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে হিন্দুসমাজ এইভাবে পড়িয়া আছে ; হিন্দুদিগের এই অবস্থা দেড় সহস্র বৎসরব্যাপী গৃহ-যুদ্ধের ফল। চৈতন্য নাই, সাড় নাই, স্পন্দন নাই ; নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড যেমন সময়ে জলে পচে, রৌদ্রে পোড়ে, আর উভয়ের ফলে ক্ষয় হইয়া যায়, সেইরূপ বাঙ্গালার হিন্দুজাতি অপর জাতির সঙ্ঘর্ষে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা চারিলক্ষ অধিক ছিল, এখন মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদিগের অপেক্ষা পঞ্চাশ লক্ষের অধিক। শব্দ কোরো না, নোড়ো না, স্থির ভাবে থাক ; যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই প্রতি-পালন কর, শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের মুখে ইহাই একমাত্র কথা।

গত সাত আট শত বৎসরে দেশে কত কাণ্ড হইয়া গেল। পাঠান, মোগল, ইংরেজ এদেশে আসিল, দেশ অধিকার করিল, শাসন করিল, এই সকল কাণ্ডে ধর্ম্মব্যবসায়ী বা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ তিলমাত্র বিচলিত হন নাই, তাহার প্রধান কারণ বিচলিত হইবার শক্তির অভাব। অর্দ্ধস্তিমিতজ্ঞানে একটা মিথ্যা কথা লইয়া অনুষ্টুপ ছন্দে শ্লোক রচনা করিলেন যে, শাস্ত্রে আছে ত্রিশ সহস্র বৎসর এ দেশ ম্লেচ্ছাধিকারে থাকিবে। হিন্দুরা যেরূপ নির্য্যাতন লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে তাহার শতাংশের একাংশও রুষিয়াতে ইহুদিরা, কি টুর্কীতে

আরমেনিয়ানরা কখন ভোগ করে না। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ সে সব প্রাক্তন কর্ম্মের ফল বলিয়া ব্যবস্থা দিলেন।

অনেকে বলেন যে, আমাদের বিগত আটশত বৎসরে দুর্গতির জন্য ব্রাহ্মণ দায়ী, যে, ব্রাহ্মণদের জন্যই আমাদের এই দশা, আর ব্রাহ্মণদের জন্যই বাঙ্গালী হিন্দুজাতি অবমানিত, লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়া পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ভুল বলেন ; দেশে সকল লোকের ন্যায় ব্রাহ্মণ মৃত, ভালমন্দ করিতে মৃতের কোন শক্তি থাকে না। ধর্ম্মব্যবসায়ী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ যে এককালে নিঃশেষে মৃত এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে ; "আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছি, আমরাই বেদ, আমরাই ধর্ম্ম, আমরাই ভগবান্ ; স্থির হয়ে আমাদের অনুশাসন পালন কর, আচাররক্ষাই একমাত্র ধর্ম্ম ; আমরা দেবতার দেবতা, ব্রাহ্মণের পদাঘাতচিহ্ন স্বয়ং ভগবান্ নিজবক্ষে ধারণ করেন, আর ঐ যে ইতর অস্পৃশ্য শূদ্রগুলাকে দেখিতেছ, উহাদের মধ্যে এমন সঞ্চিত পাপরাশি আছে যে উহাদিগকে স্পর্শ করিলে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সেই পাপ আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইবে।" ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের জীবনী-শক্তি এইমাত্র অবশিষ্ট আছে।

আঠার শ তিরাশী খৃষ্টাব্দে জাতীয় সমিতির প্রথম সূচনা হয়,—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে ইংরেজ শাসনকর্ত্তার আদেশে 'দিল্লী এসেম্‌ব্লেজে' আহূত হয়, সেই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ; তিনি এক সময়ে লেখককে বলিয়াছিলেন যে, "আমি দেখিলাম ভারতবর্ষের সকল ভাগ হইতে রাজগণ উপস্থিত হইয়াছেন, আমার মনে হইল যে

ভারতবর্ষের জনসাধারণও তাহাদের প্রতিনিধিদ্বারা একস্থানে সমবেত হইতে পারে।" জাতীয় মহাসমিতির গঠন এই সময় হইতে তাঁহার চেষ্টার সামগ্রী হয়।

যে চিন্তার ফলে মহাসমিতি গঠিত হয় তদনুরূপ মনের ভাব ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখন দেখা দেয় নাই। এক সময়ে বাল্মীকি বলিয়াছিলেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। তাহার দুই সহস্র বৎসর পরে বঙ্কিম লিখিলেন "বন্দেমাতরম্", এই দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ বার শত বৎসর দেশের লোক মৃতসদৃশ হইয়া রহিয়াছিল। বঙ্কিমের কথা কোন শাস্ত্রব্যবসায়ী অথবা ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, শুনিলেও তাঁহার উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ ছিল না। শাস্ত্রে দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ আছে। বাল্মীকি দেশকে একটা উচ্চস্থান দিয়াছিলেন, তেত্রিশ কোটি দেবতাদের মধ্যে দেশকে যেরূপে হউক একটা দেবতার স্থান দেওয়া কঠিন নয়, বঙ্কিমও তদূর্দ্ধ কিছু বলিতে সাহস করেন নাই।

সকল দেশেই মাতৃভূমির স্তোত্র আছে; আমেরিকাতে সেই স্তোত্রের নাম "হেল্ কলম্বিয়া", জার্ম্মানীতে তাহার নাম "ডের্-ফাটারলণ্ডে" (আমাদের পিতৃ ভূমি), ইংরেজেরা "রূল্ বৃটানীয়া" বলে। এই সকল জাতিরা দেশকে সম্বোধন করে, কিন্তু তাহাদের চক্ষে দেশ ও দেশের লোক একই কথা। এভাব ফরাসীদিগের জাতীয় স্তোত্রে পরিষ্কার করিয়া প্রকাশিত আছে। "দেশের সন্তানগণ এস সবে মিলে" এই বলিয়া তাহাদের জাতীয় স্তোত্র আরম্ভ হয়। বঙ্কিম "বন্দে মাতরম্" বলিলেন, কল্পনার সাহায্যে সন্তানদিগের দল গঠিত করিলেন, কিন্তু দেশের সন্তানদিগকে আহ্বান করিতে তাঁহার সাহস হইল

না। ইহা তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় নয়; তিনি অমানুষিক প্রতিভার ফলে, অতুলনীয় দেশ-অনুরাগের ফলে, কোন অদৃষ্ট দেবতার আদেশের প্ররোচনায় "বন্দে মাতরম্" বলিয়াছিলেন। ইহা দৈববাণী, বঙ্কিমের চিন্তাপ্রসূত উক্তি নয়।

আনন্দমঠ লেখার প্রায় দশ বৎসর পরে জাতীয় সমিতি গঠিত হয়, উভয়ের পূর্ব্বে দীর্ঘ সূচনা ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ইংরেজ শাসনপ্রণালীর আঘাতের ফলে প্রতিঘাতস্বরূপ রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হয়। যে বীজ দেড় সহস্র বৎসর মৃত্তিকাতলে সুষুপ্ত ছিল, যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, সে বীজ মরে নাই, নিস্পন্দ ও স্তিমিতজীবন ছিল, সে বীজ যে অঙ্কুরিত হইবে, পরিপুষ্ট হইবে, সবল সতেজ হইবে, রামমোহন রায় তাহার আশাবাণী। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত প্রথম আঘাতের ফলে বিকট, বিরূপ, বীভৎস প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রতিঘাতের জন্ম হইয়াছিল। "যুবক বাঙ্গালী" দল তাহাদের মধ্যে অন্যতম জারজ ভ্রূণ। তথাপি তাহাদের দোষ তত ছিল না, তাহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের চক্ষে দেখিল দেশমধ্যে যাহা কিছু আছে সকলই বিকৃত ও অসত্য, হিন্দুধর্ম্ম যে প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহাতে শিশুরও লজ্জা বোধ হয়। যাহা অসত্য, যাহা দুর্নীতিমূলক, যাহা পাশবিক, তাহাই দেশের আচার, আর দেশ সেই আচার দ্বারা শাসিত, ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা সেই আচারের রক্ষক। পাশ্চাত্য দেশের—সাম্য ভাব, ন্যায়বিচার, মনুষ্যত্বের অধিকার, জ্ঞান, কর্ম্মনিষ্ঠা, দেশভক্তি, পরসেবা, আত্ম-উৎসর্গ এসকলের কিছু-মাত্র দেশমধ্যে নাই। এসকলের কথা বলিলে এদেশে পাপ হয়, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়, অপর ধর্ম্ম ও অপর সমাজে

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। "যুবক বাঙ্গালী" দলের চিন্তা করিবার ক্ষমতা ছিল না, ইংরেজদিগের বাহ্য চাকৃচিক্যে তাহারা মোহিত হইয়াছিল, অনুকরণ ধর্ম্ম তাহাদের চক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইল। ইংরেজেরা এদেশের নরনারী হইতে যাহা কিছু আছে সকলই ঘৃণার চক্ষে দেখিত; "যুবক বাঙ্গালী" দল প্রধানতঃ এই বিষয়ে ইংরেজদিগকে অনুকরণ করিল; দেশের প্রতি ঘৃণা হইল প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ফল। প্রতিভাবিকাশ-যুগে যাঁহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাঁহারা ভিন্নপ্রকৃতির লোক ছিলেন, দেশের প্রতি অসীম ও অনন্ত ভালবাসা ইঁহাদের লক্ষণ ছিল। দেশপ্রেম একটা বিলাতি আমদানি সামগ্রী সে কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না, ঈশ্বর গুপ্ত একবর্ণও ইংরেজী জানিতেন না। তিনি স্নেহাপ্লুত হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন —

কতই যতন করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

বাঙ্গালাদেশে দেশপ্রেমের বীজ এককালে বিনষ্ট হয় নাই, তথাপি গভীর মর্ম্মবেদনা, আত্মগ্লানি ও আক্ষেপ, প্রতিভাবিকাশ-যুগের লক্ষণ, ইহার উর্দ্ধে সে সময়ে বাঙ্গালীরা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। দেশের যাহা বাস্তবিক অবস্থা ছিল তাহা দেখিয়া কল্পনারও অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। প্রথমে প্রথমে সমাজের শাসনকর্ত্তা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল, বঙ্কিম আশা ও আবেগের ভরে, কল্পনার চক্ষে মাধবাচার্য্য, চন্দ্রচূড় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দেখিলেন। তাহারা মরুভূমির মরীচিকা মাত্র; তাহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাশ্চাত্যজ্ঞানের বিস্তার প্রথমে

প্রয়োজন, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, বাঙ্গালার ইতিহাস এখন যেগুলি বালকদিগের পাঠ্য, তিনি সেই সকল পুস্তক 'পণ্ডিত'-দিগের শিক্ষার নিমিত্ত রচনা করেন। পণ্ডিতেরা এসকল পুস্তক সরকারী চাকরীর নিমিত্ত পড়িল, কিন্তু পড়িয়া 'পণ্ডিত'দিগের মনের গঠনের যে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণদের শিক্ষার নিমিত্ত দান করিয়া যান, কিন্তু শাস্ত্রব্যবসায়ী ও ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের হিমালয়সদৃশ অজ্ঞতা হ্রাস হইবার নয়, বিধাতা তাহাদের প্রতি প্রতিকূল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ইংরেজ সরকার বাহাদুর ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত সংস্কৃত উপাধির আয়োজন করেন; ১৮২৩ সালের পর ব্রাহ্মণদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ইংরেজদের এই দ্বিতীয় চেষ্টা। দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ বাদ দিয়া ব্রাহ্মণেরা যে সকল বিদ্যা শিখিত, সেই সকল বিষয় উপাধিলাভের নিমিত্ত পাঠ্য সামগ্রী নির্দ্দিষ্ট হইল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এসকলের সহিত সামান্য পাশ্চাত্য জ্ঞান মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

রোদন ও আত্মগ্লানি অবসাদে শেষ হইল, কিন্তু যে নষ্টপ্রায় বীজ অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল সে বীজ ধ্বংস হইল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় জাতীয় সমিতি স্থাপিত হয়; ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক। সকলেই বিশ্বাস করেন যে, তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজী শিক্ষার ফল। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ মাত্র বলিলে সব কথা বলা হইবে

না। তাঁহার মন ইংরেজী শিক্ষায় পরিপুষ্ট ছিল; এই শিক্ষার ফলে তাঁহার মনে যে চঞ্চলতা জন্মে রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয় সমিতি স্থাপন সেই চঞ্চলতার ফল। মনের চঞ্চলতার ফলে হেমচন্দ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন, মনের আকুলতায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, আর মনের চঞ্চলতার ফলে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় মহাসমিতি গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটি কথা আছে যে "ভাবনা উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" কিন্তু এ চিন্তার জন্য চিন্তার উপাদান সংগ্রহ প্রয়োজন, যাহা তথ্য, যাহা প্রকৃত, যাহা সত্য, তাহাই কেবল ভবিষ্যৎ-কর্ম্মোপযোগী চিন্তার উপাদান হইতে পারে। ধীর সংযত নিরপেক্ষ ভাবে সত্যের অনুসন্ধান না করিলে ও সেই সত্যকে অবলম্বন না করিলে প্রকৃত কর্ম্মপন্থা নিরূপিত হওয়া কখন সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টারও সেই ফল হইল, তিনি রাম না হইতে রামায়ণ রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি জাতি না গড়িয়া জাতীর সমিতি গড়িতে গিয়াছিলেন। তিনি ঘোড়ার আগে গাড়ী জুতিলেন, ফল হইল নির্ম্মস্তকস্য শিরঃপীড়া। দেশের ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়, বিশেষ যুবকশ্রেণী, সুরেন্দ্রনাথের কথায় প্রথমে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ যে কথা প্রচার করিতেছিলেন সে সব কথা ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ভিতর এতদিন অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় ছিল, সুরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত প্রতিভা, অদ্ভুত চেষ্টা ও অদ্ভুত বাগ্মিতার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার কথায় নিজেদের মনের ভাবের প্রতিধ্বনি শুনিয়া অধীর হইল। এ অবস্থা অধিক দিন রহিল না, বিশ বৎসরের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের কথা আর কেহ শুনিল না। সুরেন্দ্রনাথ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী দেশের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

শিথিলতা বা বিরাম কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না, তাঁহার মত দৃঢ়ব্রত, একনিষ্ঠ, অক্লান্তপরিশ্রমী পুরুষ বাঙ্গালাদেশে কখন জন্মে নাই। দেশের লোকদিগকে জাগরিত করিতে তিনি যেরূপ অমানুষিক চেষ্টা করিয়াছিলেন সেরূপ পূর্ব্বে কেহ কখন করে নাই। এ সব কথা সত্য হইলেও তিনি একটি ভুল ভিত্তির উপরে তাঁহার সমস্ত জীবনের পরিশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দেশের দুর্গতি দেখিয়া তাহা দূর করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য, সত্যের নামে, ন্যায়ের নামে, সুনীতির নামে মনুষ্যের নৈসর্গিক অধিকারের নামে তিনি চিরদিন দেশের লোকের দুরবস্থার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজ জাতি এই দুরবস্থা দূর করিবে ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা ও উদ্দেশ্য। সুরেন্দ্রনাথ জাতি, জাতীয় ও জাতীয়তা অর্দ্ধ শতাব্দী লইয়া এই সকল কথা বলিলেন, কিন্তু কাহাদের লইয়া জাতি তাহা তিনি জানিতেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন নাই, বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই। দেশের দুর্গতি দূর করিবার নিমিত্ত ইংরেজ-রাজদ্বারে অভিযোগ ও আবেদন এই ছিল তাঁহার একমাত্র আশা ও চেষ্টা।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের ইতিহাসের সহিত পরিচয় হইল, সেই পরিচয়ের ফলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্মসম্মান ও জাতীয় সম্মান কাহাকে বলে তাহার কিছু জ্ঞান জন্মিল। সুরেন্দ্রনাথের ওজস্বিনী বক্তৃতায় শিক্ষিত যুবকদল প্রথমে ভাবিয়াছিল, যেমন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আন্দোলন দ্বারা ন্যায় ব্যবস্থিত হয়, দেশের অধিবাসীদিগের স্বত্ব রক্ষিত হয়, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ নিরূপিত হয়, সেইরূপ আন্দোলনের ফলে

রাজদ্বারে আবেদন ও অভিযোগের ফলে আমাদেরও তাহাই হইবে। যা হইল তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত, ইংরেজ রাজনীতি এ সকল চেষ্টা অন্য নয়নে দেখিল।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছিল যে, সুরেন্দ্রনাথ যে পথে লইয়া যাইতেছেন, সে পথে যাইলে তাহারা যাহা অনুসন্ধান করিতেছিল তাহা পাওয়া যাইবে না। দেশমধ্যে আন্দোলন ও ইংরেজ রাজদ্বারে আবেদন এই দুই উপায় দ্বারা ভারত-বাসীরা একটি মহাজাতি হইবে ও পৃথিবীর অপরাপর মহাজাতি-সমূহের তুল্য হইবে, ইহাই ছিল সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টার মূল মন্ত্র। বিশ বৎসর এই প্রকার চেষ্টার ফলে দেশের লোক দেখিল যে, কোন প্রকার সুফল হওয়া দূরে থাক্, অনিষ্ট হইল। হিন্দু বাঙ্গালীদিগের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল অনেক বিষয়ে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা হীনতর হইল। নিজেদের উন্নতির জন্য আবেদন ও অভিযোগ একমাত্র উপায় একথা শিক্ষিত যুবকদল আর কোন মতে স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। তাহাদের জাগরিত আত্মসম্মান-জ্ঞানের নিকট এ পথ অতি ঘৃণিত বলিয়া মনে হইল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুরেন্দ্রনাথের উপর যে শ্রদ্ধা ছিল সে শ্রদ্ধা কমিল, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এই বিরাগ বাড়িতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথের আর নেতৃত্ব রহিল না। নিজে-দের উন্নতির জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে শিক্ষিত যুবকের দল অধীর হইল। এই অধীরতার ফল চিত্তরঞ্জন দাশের অভ্যুদয়। চিত্ত-রঞ্জন দাশকে বিশেষ কিছুই চেষ্টা করিতে হয় নাই, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদর্শিত পথ ও তাহার উপর শিক্ষিত যুবকশ্রেণীর যে অবিশ্বাস ও বিরাগ বহু বৎসর হইতে জমিতেছিল সেই সকল ভাব

প্রকাশ করিতে চিত্তরঞ্জন মুখপাত্র হইলেন। দেশের লোক নূতন নেতা পাইয়া আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অভিনন্দন করিল; ক্রন্দন ও ভিক্ষা ছিল সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র অবলম্বন, চিত্তরঞ্জন এ পথের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গেলেন। ইংরেজদ্বারে আবেদন ও অনুগ্রহ যাচ্ঞার পরিবর্ত্তে তিনি স্বদেশের উন্নতির জন্য ইংরেজের সহিত সহযোগিতা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিলেন, দেশের যুবকদলের মনেও এই চিন্তা বহুদিন হইতে জন্মিতেছিল এখন তাহারা এক জন নেতা পাইয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইল এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে পথ বিশেষ সুখের ছিল না; লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন, কারাগার—সে পথের যাত্রীদিগের পুরস্কার ছিল, সহস্র সহস্র যুবক আনন্দের সহিত সে সকলই সহ্য করিল।

যত দিন যাইতে লাগিল এই নূতন ভাব দেশমধ্যে দৃঢ়তর হইল; শিক্ষিতসম্প্রদায় চিত্তরঞ্জন দাশের কথা মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিল। তিনি যাহা বলিতেন নিজে তাহা অনুপালন করিতেন, তাহার ফলে তাঁহাকে দীর্ঘকালস্থায়ী কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। প্রধানতঃ সেই কারণে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে। ১৯১৮ সালে তিনি প্রথমে নূতন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহার কথার ফলে দেশমধ্যে যে চঞ্চলতার ভাব লক্ষিত হয় তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে; এই আশা তাঁহার ফলবতী হয় নাই। সহস্র সহস্র যুবক জেল খাটিল, সহস্র সহস্র লোক নির্য্যাতন ভোগ করিল, কিন্তু সমগ্র দেশ বিশেষ বিচলিত হইল না। তিনি প্রথম আবেগের ফলে ভাবিয়াছিলেন সমস্ত দেশ চঞ্চল হইবে,

শিক্ষিত যুবকদলের ন্যায় সকলেই ক্ষিপ্ত হইবে, প্রয়োজন হইলে সকলেই আত্মোৎসর্গ করিবে, ফলে তাহা হইল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার যেরূপ মনের অবস্থা দেশের সকলের সেইরূপ। দেশের জনসাধারণ কিন্তু পূর্ব্বেও যেরূপ জড় ছিল তখনও সেইরূপ রহিল। আবেগের ফলে প্রথমে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, পরে তাহা বুঝিলেন। নৈরাশ্য ও বিষাদে তাঁহার মনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি লেখককে বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ করিবেন, অনেকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অবশিষ্ট জীবন গ্রামমধ্যে গিয়া গ্রামবাসী-দিগের সহিত যাপন করিবেন।

বিফল প্রয়াস।

আমরা এখন কিছু বৎসর ফিরিয়া যাইব। বঙ্কিমের বন্দে-মাতরম্ কোন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কখন শুনিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই, শুনিলেও তিনি যে বিশেষ চঞ্চল হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন দেশমধ্যে একটু সাড়া পড়ে, আন্দোলন বলিলে নড়া চড়ার কথা আসে, আড়ষ্ট, জমাট বদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য সমাজে কোনপ্রকার নড়ন-চড়নের কথা বলিলে স্বভাবতঃই মনে ক্রোধের উদয় হয়; যাহার জানুর সন্ধি অচল হইয়াছে তাহাকে পা ছড়াইতে বা দুমড়াইতে বলিলে তাহার যেরূপ মনের ভাব হয়, কাষ্ঠত্বপ্রাপ্ত শক্তিহীন ব্রাহ্মণ্যসমাজের সেই অবস্থা হইল। রাজ-নৈতিক আন্দোলন যে কি সামগ্রী ইহার উদ্দেশ্যই বা কি তাহা

কোন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। তবে হিন্দুদিগের মধ্যে ইহা এক অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব কাণ্ড, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরক্তও হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে কেবল ব্রাহ্মণেরা মৃত নহে, সকলেই মৃত, শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা ঈষৎ অধিক নির্জীব। সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনব্যাপার পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অপ্রিয় বোধ হইল। কেহ কেহ বিশেষ উষ্ণ হইলেন এবং যাহাতে এরূপ অমঙ্গলচেষ্টা দেশ হইতে দূর হয় তাহার জন্য তাঁহারা হস্তে খড়্গ ধারণ করিলেন! প্রধানতঃ গালিবর্ষণ ও উপহাস ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র। "দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার" এ কবিতা শুনিয়া তাঁহাদের বন্ধুগণ হাসিয়া অস্থির হইলেন। কিন্তু ইহার সহিত আর এক কাণ্ড হইল, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ স্মার্ত্ত হিন্দুধর্ম্ম, দেশমধ্যে প্রচলনের নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ চেষ্টা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল; পূর্ব্বে তাঁহারা নীরবে আপনাদের কাজ করিতেন, এখন সংবাদপত্রে লিখিয়া সভা-সমিতি করিয়া সনাতন শাস্ত্রমর্য্যাদা (অর্থাৎ পুরাণের গল্প, স্মৃতির শাসন ও দেশাচার পালন) লঙ্ঘনের জন্য ভৎর্সনা ও তিরস্কার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। উপহাসকারীর দল ইহাদের সহিত যোগ দিলেন।

কয় বৎসর ধরিয়া এই ভাব চলিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই এভাবের অবসান হয়। যে চঞ্চলতা ধীরে ধীরে দেশমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল তাহা চতুষ্পাঠী-পণ্ডিতদিগের অভিশাপে অথবা তাহাদের বন্ধুদিগের সুলভ রসিকতায় লোপ পাইবার সামগ্রী ছিল না। পণ্ডিতেরা

পুনরায় আর এ প্রকার চেষ্টা করেন নাই ; তাঁহারা নীরব অভিশাপ প্রদান করা প্রশস্ততর পন্থা বলিয়া স্থির করিলেন। কয় বৎসর ধরিয়া এই যে ব্যাপার চলিয়াছিল তাহা বিশেষ গুরুতর সামগ্রী নয়, হিন্দু-দিগের জাতীয় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিনা তাহাও সন্দেহ। তথাপি ঘটনাটি সামান্য হইলেও ইহা হইতে একটু শিক্ষা পাওয়া যায়, হিন্দু-দিগের নড়নচড়নের চেষ্টার প্রতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও তাঁহাদিগের বন্ধুদিগের এই প্রথম প্রতিবাদ।

মহাসমিতি শব্দের অর্থ পণ্ডিতেরা সহজে বুঝিতে পারিতেন, একটি জাঁকাল শ্রাদ্ধবাড়ীর সভাকে মহাসমিতি বলিতে পারা যায়, সেইজন্য মহাসমিতি শব্দ দোষের কথা নহে ; কিন্তু 'জাতীয়' শব্দ একটা নূতন কথা, ইহার মর্ম্ম তাঁহারা ভাল বুঝিলেন না। বোধহয় তাঁহারা একটা নূতন রকমের জীব দর্শনে এক প্রকার অস্ফুট আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে আরও এক কাণ্ড ঘটিতেছিল, শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা যেমন পুরাণ, স্মৃতি, ও দেশাচার-রক্ষাকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রতি শিক্ষিত হিন্দু গীতা ও উপনিষদ্ পড়িতে শিখিল, বিবেকানন্দ এই সময়ে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। বলা বাহুল্য শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ, এ সব চেষ্টা অতিশয় ঘৃণার সহিত দেখিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আর একটি কাণ্ড হয়, যাহার সহিত হিন্দু বাঙ্গালীদের জাতীয় ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। ১৮৮০ সাল হইতে ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের, বিশেষ বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থার অদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তন হয়, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সমাজ-

সংস্কার, নিজেদের মধ্যে একতাবন্ধন, আত্মসম্মান-জ্ঞান, সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাদের উন্নতি হয়। ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রধানতঃ হিন্দুদিগের চেষ্টায় এই সমিতির জন্ম হয়, ভারতবর্ষের মুসলমানেরা ইহা হইতে পৃথক্ রহিলেন। পরবৎসর নিখিল ভারতবর্ষীয় মুসলমান শিক্ষাসমিতি গঠিত হয় ; জাতীয় মহাসমিতির সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্বন্ধ রহিল না। নূতন জাগরণের ফলে মুসলমানদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক একতা ভাব অতিশয় দৃঢ় হয়, এবং তাহাদের সম্প্রদায়িক শক্তি পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার শতগুণ বৃদ্ধি হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এইরূপ ঘটে। শীঘ্রই হিন্দু বাঙ্গালীরা বিশেষ করিয়া এই শক্তির পরিচয় পাইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ১৮৭২ সালে, যে বৎসর প্রথমে মানুষগণনা হয় সেই বৎসর, বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের সংখ্যা চার লক্ষ অধিক ছিল, তাহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তরে মানুষগণনা হয়, প্রতিবারেই দেখা গেল যে মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। পরে শেষ মানুষগণনাকালে প্রকাশ পাইল যে সরকারী বাঙ্গালাদেশে হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানগণ সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ অধিক হইয়াছে এবং যে ভাবে হিন্দুরা কমিতেছে তাহাদের ধ্বংস সময়সাপেক্ষ মাত্র।

বাঙ্গালাদেশে আরও অনেক কাণ্ড ঘটিল। ১৯০৪ সালে ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণ বাঙ্গালাদেশ দুইভাগে বিভক্ত করেন, মুসলমানপ্রধান উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা আসামের সহিত যোজিত করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। সেই বৎসরে একজন ইংরেজ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ঘোষণা করেন যে, মুসলমানেরা তাঁহার প্রিয়তরা মহিষী। এখন

বাঙ্গালার মুসলমানপ্রধান অংশে, যে স্থলে হিন্দুদিগের সংখ্যা সামান্য, মুসলমানগণকর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীলোকের ধর্ষণ একপ্রকার নৈত্যিক কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জামালপুরনামক স্থানে ১৯০৫ সালে এই কাণ্ড আরম্ভ হয়। ১৯১৩ সালে বাঙ্গালা প্রদেশের পুনরায় নূতন আকার হয়, দ্বিখণ্ডিত বাঙ্গালা পুনরায় এক হয়, তবে বাঙ্গালাদেশ হইতে হিন্দুপ্রধান মানভূম, সাঁওতালপরগণা, সিংহভূম এই সকল জেলা ও পুর্ণিয়ার বাঙ্গালীপ্রধান অংশ পৃথক্ করিয়া বিহারের সহিত যোগ করা হয়। নব আকারের বাঙ্গালাদেশে হিন্দু বাঙ্গালী এখন শতকরা ৪৩ জন।

হিন্দু বাঙ্গালী লোপ পাইতেছে কেন? এ প্রশ্নের অনেকে অনেক প্রকার উত্তর দিবেন। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে আমাদের প্রকৃত অবস্থার আর একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হয়, মনে হয় যেন কোন এক অব্যক্ত অস্ফুট ভাব এতদিন হিন্দু-দিগের মধ্যে সুষুপ্ত ছিল, কোন অজ্ঞাত কারণে সেই ভাব বহুকাল পরে জাগরিত ও প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, রামমোহন রায় এই চেষ্টার প্রথম ফল। সহস্রবৎসরব্যাপী প্রণষ্ট-মনুষ্যত্ব জাতিকে জাতীয়তাজ্ঞান প্রদান করা এক ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য। রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় মৃতকল্প হিন্দুদিগের পক্ষে প্রথম আশাবাণী। বিকট ও বিরূপ "যুবক বঙ্গের" বাঙ্গালীদিগের জাতীয় ইতিহাসে যে স্থান নাই তাহা বলা যায় না। পুরাতন গ্রীস দেশবাসীরা মদ্যপানের কি ফল তাহা নিজ সন্তানদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত আপনাদের ক্রীতদাস দিগকে মদ খাওয়াইত এবং তাহাদের পাশবিক অবস্থা দেখিয়া

নিজেদের বালকদিগের মদ্যপানের ফলসম্বন্ধে শিক্ষা হইত; অজীর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে ফল হয়, যুবক বাঙ্গালী দল দেশের লোকদিগকে কতকটা তদনুরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আত্মসম্মান-জ্ঞান, ও দেশ-প্রেম, প্রতিভাবিকাশ যুগের মূলমন্ত্র। হেমচন্দ্র লিখিলেন "আত্মঅভিমান ডুবায়ে সলিলে, হ্যাদে দেখ ধায় যত কুলাঙ্গার"। যে ভাব দেশমধ্যে প্রস্ফুটিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহার নাম আত্মসম্মান-জ্ঞান অথবা দেশভক্তি; এ আত্মসম্মান তখনও পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ছিল, জাতিগত হয় নাই। বঙ্কিমের মাতা হইল দেশ, দেশের লোক পর্য্যন্ত বঙ্কিম পৌঁছিতে পারেন নাই, রামচরণ ও মেনাহাতী তাঁহার পৌঁছিবার সীমা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ জাতি কথা দেশমধ্যে প্রচার করেন, কিন্তু সে জাতি তাঁহার কণ্ঠের জাতি, কাগজকলমের জাতি, ইংরেজ-অনুকরণে কল্পিত "জাতি", যাহাদের সমষ্টিকে জাতি বলে,—রক্তমাংস-গঠিত প্রকৃত বাঙ্গালী জাতি, ক্ষুধিত, ব্যাধিগ্রস্ত, অশিক্ষিত, নির্য্যাতিত বাঙ্গালী, তাহাদের সহিত সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগপর্য্যন্ত এই কয় ধাপ পর্য্যন্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় উঠিয়াছিল, ইহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই; বঙ্কিম বন্দনা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, সুরেন্দ্রনাথ জাতির মঙ্গলের ভার ইংরেজের পদযুগলে সমর্পণ করিলেন। 'কর্ম্মই ধর্ম্ম' ইহা গীতার শিক্ষা, বিবেকানন্দ এই শিক্ষা দেশে পুনরায় প্রচার করিলেন। বঙ্কিম শিখাইয়াছিলেন দেশই দেবতা, এখন শিক্ষিত-সম্প্রদায় শিখিল দেশ, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম এই তিন পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত ও একই কথা; কিন্তু বিবেকানন্দের এ শিক্ষায় বিশেষ ফল হইল না। দেশ অর্থে দেশের লোক, তাহাদের লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্র,

সে দেশের লোক কোথায় ? চিত্তরঞ্জন আবেগের নেত্রে, কল্পনার নেত্রে দেশের লোক দেখিয়াছিলেন, কেবল তাহা নয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ দেশের লোকদিগের মনের অবস্থাও সেইরূপ। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীদের এক অদ্ভুত অবস্থা ঘটিয়াছে, আত্ম-সম্মান-জ্ঞান জন্মিয়াছে, স্বদেশপ্রেম জন্মিয়াছে, কর্ম্ম করিতে মন চঞ্চল হইয়াছে কিন্তু দেশের লোক হইল কর্ম্মক্ষেত্র, সেই দেশের লোকের সহিত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের এখনও পরিচয় হয় নাই।

পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলেই হউক, ইংরেজশাসন-নীতির ফলেই হউক অথবা কালধর্ম্মেই হউক, দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল যে বীজ মৃতকল্প হইয়াছিল সেই বীজের জীবনী শক্তি পুনরায় দেখা দিল ; কিন্তু এ শক্তি বিকাশের অবকাশ পাইল না। বার শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের পনর আনা লোকের নাম হইয়াছিল ইতর, এখনও তাহারা ইতর অর্থাৎ পৃথক্ রহিল।

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এখন তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম পাশ্চাত্য-জ্ঞানে শিক্ষিত দল, দেশসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত লোক-দিগের যেপ্রকার মনের ভাব, তাহাদেরও মনের গঠন সেইরূপ, কিন্তু মনের গঠন যেরূপই হউক না কেন, দেশের সেবা করিতে অর্থাৎ দেশের লোকের সেবা করিতে ইচ্ছা যতই প্রবল হউক না কেন, তাঁহারা এক পদ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। আত্মবলিদান এখন তাঁহাদের ধর্ম্ম ও চেষ্টার সীমা। দ্বিতীয়, শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-গণ, দেশ বলিয়া ইঁহারা কোন পদার্থ জানেন না ; দেশের অস্তিত্ব-

সম্বন্ধে ইঁহাদের মনে বিষম সন্দেহ আছে। বার শত বৎসর হইতে ব্রাহ্মণভিন্ন দেশের অপর হিন্দুদিগের নাম দিয়াছেন ইতর, এই ইতর দিগের মধ্যে বার আনা লোক অস্পৃশ্য, তাহাদের স্পর্শ করিলে পাপ হয়। দেশের সেবার অর্থ দেশের এইরূপ লোকের সেবা, তাঁহাদের নিকট ইহা নিরর্থক শব্দ, অতি অশ্রদ্ধেয়, অতি হেয়, বিষতুল্য। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেতর অর্থাৎ শূদ্রদিগের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যেরূপ মনের ভাব ছিল, বার শত বৎসর পরেও সেইরূপ আছে। পূর্ব্বে শূদ্রদিগের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিহিংসা এই ছিল ব্রাহ্মণদের মনের ভাব; বার শত বৎসর অনুশীলনের ফলে সেই সকল ভাব এখন ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ ও জাতি, দেশের লোকদিগের সুখদুঃখ, জীবনমরণ, এসকল কথা লইয়া ব্রাহ্মণেরা কখনও নিজেদের মস্তিষ্ক সঞ্চালন করেন নাই, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে যাহা ছিল তাহাই রক্ষা করা তখন একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই ভাব বার শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফল হইয়াছে যে, দেশ অথবা দেশের লোকদিগের সম্বন্ধে কোন বিষয় চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি অথবা শক্তি তাহাদের মধ্য হইতে লোপ পাইয়াছে। পুরাণের গল্পে বিশ্বাস, স্মৃতির আজ্ঞা পালন, ও দেশাচার রক্ষা তাঁহাদের চক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম ও একমাত্র কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাদের ব্যতীত হিন্দুদিগের কর্ম্মও নাই ধর্ম্মও নাই। এইরূপ মনের ভাব ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে বিচারে প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রব্যবসায়ী ও ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন তাঁহা তাঁহারা বাস্তবিক বিশ্বাস করেন। সত্য বটে তাঁহাদের চক্ষে হিন্দু-

সমাজে অনেক বিপ্লব ঘটিয়াছে, রাজপুতেরা ক্ষত্রিয় হইয়াছে, শূদ্র জাঠেরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যের বৃষল (শূদ্র) মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল, হিন্দু গুরুগোবিন্দের শিষ্যেরা পাঞ্জাব জয় করিয়াছে, নেপালের ছোট 'জাতেরা' ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক হইয়াছে, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইয়াছে, এমনকি বাঙ্গালাদেশে এক শ্রেণী শূদ্রেরা সৎশূদ্র নাম গ্রহণ করিয়াছে, এসকল বিদ্রোহ ব্রাহ্মণেরা উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপায় নাই, যাহা আছে তাহা লইয়া সমাজ রাখিতে হইবে। মুসলমানেরা কোটি কোটি হিন্দু নরনারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে, যদি কেহ তাহাদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজে রাখিবার প্রস্তাব করে, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ শিহরিয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন,—এমন কাজ করিও না, সর্পদষ্ট অঙ্গুলি যেমন লোকে ছেদন করে, সেইরূপ অসঙ্কুচিত চিত্তে অক্ষুন্ন-অন্তঃকরণে উহাদিগকে পরিত্যাগ কর, প্রাক্তন কর্ম্মফলে উহাদের এরূপ দশা ঘটিয়াছে, বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফলে হস্তক্ষেপ করিও না, যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে। যাহা গিয়াছে তাহা গিয়াছে, সে সকলই দৈবাধীন ; কিন্তু যাহা আছে তাহা রক্ষা কর, স্মৃতির অনুশাসন ও দেশাচার পালন কর, তাহা হইলেই সব হইবে। স্বজাতি, স্বদেশী, স্বধর্ম্মী, এসকল কথার অর্থ পণ্ডিতেরা বুঝেন না—দেশ-ভক্তি, দেশপ্রেম, দেশসেবা তাঁহাদের চক্ষে সবই নিরর্থক শব্দ। জাতীয় উন্নতি, জাতীয় সম্মান, জাতীয় গৌরব, এসকল শব্দের যে অর্থ আছে, তাঁহারা স্বীকার করেন না। দেশের লোকের সহিত সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহকারিতা, এসব কথা শুনিলে তাঁহারা

শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করেন, অপর দেশ আছে, অপর জাতি আছে, অপর শাস্ত্র আছে, এসব কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না; পরিবর্ত্তন, বিকাশ, উন্নতি, তাঁহাদের নিকট অলীক প্রলাপ। মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্বের, অধিকার, আত্মসম্মান, এসব পাপময় কথা; সত্য, ন্যায় ও সুনীতি, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষের এলেকার অন্তর্গত, এই সকল কথা পণ্ডিতেরা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে তিলমাত্র সন্দেহ নাই; এই হইল দেশের দ্বিতীয় শ্রেণী ধর্ম্মব্যবসায়ী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, ইঁহাদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইবে।

তৃতীয়, দেশের জনসাধারণ, যাহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা ইতর অথবা শূদ্র নাম দিয়াছেন; বাঙ্গালাদেশে শতকরা ছয়জন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে, বাকি শতকরা চুরানব্বই জন হইল শূদ্র বা ইতর। ইহাদের মধ্যে বার আনা ভাগ অর্থাৎ প্রায় একশত পঞ্চাশ লক্ষের অধিক হিন্দু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অনুশাসন-অনুসারে অস্পৃশ্য, ইহারা হিন্দু কিনা সে সম্বন্ধে শাস্ত্র ব্যবসায়িগণ কখন মত প্রকাশ করেন নাই, তাহার প্রধান কারণ 'হিন্দু' শব্দ অশাস্ত্রীয়, শাস্ত্রে এ শব্দের উল্লেখ নাই। অহিন্দু শব্দ ব্যবহার না করিলেও ব্রাহ্মণদের চক্ষে সকল শূদ্র হইল ইতর অথবা পৃথক্, এই ইতরদিগের খুসনামের অন্ত নাই, শূদ্দুর, দাস, ছোটলোক, অন্ত্যজ তাহাদের নমুনা। ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পাপ, ইহাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে সাহায্য করিলে সাহায্যকারী ব্রাহ্মণের, শূদ্র অপেক্ষা অধোগতি হয়। বারশত বৎসরের উপেক্ষা, ঘৃণা, লাঞ্ছনা নির্য্যাতনের ফলে যাহা কিছু মনুষ্যত্বের লক্ষণ, এই একশত পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দুদিগের মধ্য হইতে সমস্ত নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে, কাহাকে আত্ম-সম্মান বলে, তাহারা যে

মানুষ, মনুষ্যত্বের যে কিছু অধিকার আছে, ন্যায় ও নীতি বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, মনুষ্যের যে স্বাভাবিক ঈশ্বরদত্ত কতকগুলি গুণ আছে তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে ও বিশ্বাস করে যে জল ছুঁইলে সে জল অশুদ্ধ হয়, তাহারা জানে তাহাদের মুখ দেখিলে অমঙ্গল হয়, তাহারা জানে তাহাদের ছায়া কাহারও গায়ে পড়িলে সে অপবিত্র হয়, তাহারা জানে যে তাহারা যেস্থানে বাস করে, সেস্থান অশুচি হয়, তাহারা নিকটে গেলে দেবপ্রতিমা অপবিত্র হয়, তাহারা দেবদেবী পূজা করিলে সেই দেবদেবী চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়; এসব কথা তাহারা জানে ও বিশ্বাস করে, আপনা-দিগকে দাস বলিয়া পরিচয় দিতে সম্মান বোধ করে, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খাইতে, ব্রাহ্মণের পদস্পৃষ্ট জল পান করিতে কৃতার্থ হয়, ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলে মনে করে পরলোকে সদ্গতি হইবে। নরপশু হইয়া থাকিতে পৃথিবীর কোন জাতি কখন এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, এবং এরূপ সুখও উপভোগ করে নাই; বিধাতাও সেই সাধ পূরণ করিয়াছেন।

ইহার কতকটা অনুরূপ একবার আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেদেশে কাফ্রী ক্রীতদাস-দিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ঘোর আন্দোলন হয়। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান্‌গণ ধান ও তূলা-ক্ষেত্রে কাজ করিবার নিমিত্ত বল এবং ছল-পূর্ব্বক আফ্রিকাবাসী কাফ্রী নরনারীদিগকে ধরিয়া আনিত ও তাহাদিগকে ধান ও তুলাক্ষেত্র-স্বামীদিগের নিকট বিক্রয় করিত। এরূপে, লক্ষ লক্ষ কাফ্রী স্ত্রীপুরুষ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরূপে আমেরিকা দেশে বাস করে। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ

অভেদে ভগবানের সৃষ্ট মনুষ্যদিগকে এরূপভাবে থাকিতে দেখিয়া আমেরিকার নরনারীদিগের মনে লজ্জা ও কষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে এই ভাবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল; দেশমধ্যে ইহা লইয়া ঘোর আন্দোলন দেখা দিল; যাহারা কাফ্রী ক্রীতদাসদিগকে দাসত্ব হইতে মোচন করিবার পক্ষে ছিলেন তাঁহারা বলিলেন,—মনুষ্যকে এরূপ পশুভাবে রাখা ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ। ধর্ম্মের ও নীতির নামে এপ্রথা উঠিয়া যাওয়া উচিত, দাসত্ব হইতে কাফ্রীগণকে মোচন করিতে হইবে। অপর পক্ষে যাহারা ক্ষেত্রস্বামী ছিল, যাহারা কাফ্রীদিগকে ক্রীতদাস-স্বরূপ রাখিত, তাহারা ঘোর প্রতিবাদ করিল। দেশে শীঘ্রই দুই দল বাঁধিল, একদল কাফ্রীদিগকে দাস করিয়া রাখিতে, অপর দল তাহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই মতভেদ লইয়া দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল, দাসত্ব অথবা মুক্তি। কোন পক্ষই নিজ মত পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না; পরিশেষে দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। এইরূপ ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ ইউরোপ বা আমেরিকাতে পূর্ব্বে কখন হয় নাই। তখন যুক্তপ্রদেশে স্ত্রীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ লইয়া তিনশত বিশ লক্ষ লোকের বাস ছিল, ইহাদের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ শ্বেতকায় যুবক ও মধ্যবর্ষীয় পুরুষ এই যুদ্ধে যোগদান করে। তাহাদের মধ্যে উভয় দলে তিন লক্ষের উপর শ্বেতকায় আমেরিকাবাসী হত ও আহত হয়। ধর্ম্ম ও সত্যের জয় হইল। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস কাফ্রীরা মুক্তি পাইল; কেবল তাহা হইল এমন নহে, দেশে শ্বেতকায় আমেরিকানগণ যে সকল অধিকার নিজেরা উপভোগ করিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় সেই সমস্ত অধিকার দাসত্ব হইতে বিমুক্ত কাফ্রীদিগকে প্রদান করিলেন।

কোন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে এসব কথা বলিলে প্রথমতঃ তিনি বুঝিতে পারিবেন না, জম্বুদ্বীপের কোন অংশকে আমেরিকা বলে তিনি তাহা সম্যক্ অবগত নহেন। যদিও কেহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তিনি সে কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তিনি বলিবেন, যে জনকতক কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী ক্রীতদাসদিগকে—যাহাদিগকে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে সেই অবস্থা হইতে মোচন করিবার নিমিত্ত কোন দেশে নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অসম্ভব। যদি কেহ তাহার প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বলিবেন, যে শুক্লবর্ণ আমেরিকানগণ কি মূর্খের জাতি, কৃষ্ণকায় দাসদিগের জন্য পরস্পরের জীবনহত্যা ও শোণিতপাত পর্য্যন্ত করিল, এবং তাহার সহিত চিরন্তন দেশাচার পর্য্যন্ত নষ্ট করিল। ইহার মধ্যে আর একটু কথা আছে, যখন দেশমধ্যে কাফ্রীদিগকে মুক্তিদানসম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছিল, তখন দু'এক ক্ষেত্রের ক্রীতদাস কাফ্রীগণ শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট আবেদন করিয়া পাঠায় যে তাহারা পরম সুখে আছে, দাসত্ব হইতে মুক্তি কামনা করে না। আমাদের দেশে শূদ্রদিগের সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

একটা প্রশ্ন মনে পড়ে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র লইয়া যে কথা হইতেছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণই বা কে আর শূদ্রই বা কে? যে বেদ ধারণ করে, যে বেদরক্ষা করে, যে বেদবিস্তার করে, সেই যদি ব্রাহ্মণ হয় তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশে কয়জন ব্রাহ্মণ আছে? বার শত বৎসর পূর্ব্বে যে কেহ কোন প্রকার অবৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে শূদ্র নাম দিয়াছিল, বেদলোপ হইবার ফলে

হিন্দুরা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি পঞ্চদেবতার উপাসক হইল। ব্রাহ্মণেরাও বেদ ছাড়িয়া দেশের অপরাপর লোকের ন্যায় পঞ্চ দেবতার উপাসক হইলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের শিক্ষার ফলে বাঙ্গালায় সকল বিভাগের হিন্দুরা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, তবে তাহাদিগকে আমরা শূদ্র বলি কেন? দাস অর্থে শূদ্রধর্ম্মা; তাহাদিগকে দাস নাম দিয়াছি কেন? ইহার অনুরূপ অবস্থা ইউরোপে ঘটে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হয়। নবম শতাব্দীতে ডেনমার্কবাসীরা ইংলণ্ড জয় করে, সে সময় ডেনগণ খৃষ্টান ছিল না, পরে তাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। নর্ম্মান উইলিয়মের পিতামহ সে সময়ে অপরাপর নর্ম্মানদিগের ন্যায় খৃষ্টান ছিলেন না। সে হইল একাদশ শতাব্দীর কথা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্ম্মণীর অন্তর্গত সেক্সেনিবাসীরা প্রথমে খৃষ্টান হয়, এখন যদি ইংলণ্ডের কোন লোক কোন ডেনমার্কবাসীকে কিংবা কোন সেক্সেনিবাসীকে বলে যে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক পরে খৃষ্টান হইয়াছিল, অতএব তোমরা জল-অচল ও অস্পৃশ্য, তাহা হইলে এইরূপ ইংরেজকে বাতুল আশ্রমে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। তবে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত বাঙ্গালীকে শূদ্রই বা বলি কেন, আর তাহাকে দাসই বা উপাধি দিয়াছি কেন?

উপরে লিখিত তিন শ্রেণী এখন দেশমধ্যে আছে,—প্রথম :—পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী—দেশ, জাতি, মনুষ্যত্বের অধিকার, আত্মসম্মান জাতীয় সম্মান, জাতীয় গৌরব, জাতীয় উন্নতি, পৃথিবীর যাবতীয় জাতিদিগের সহিত সমকক্ষতা, তাহাদিগের হইতে উৎকর্ষতা, জ্ঞানে, ধনে, চরিত্রে, দেহের বলে, মনের বলে, নৈতিক বলে স্বজাতির

শ্রেষ্ঠতা, এইসকল হইল তাহাদের চিন্তা, আশা ও স্বপ্ন। দ্বিতীয়ঃ—ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ। বার শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত স্মৃতির অনুশাসনপালন দেশাচাররক্ষা ও পৌরাণিক উপকথায় বিশ্বাস, তাঁহাদের মতে এই সকল হইল ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্ম রক্ষা করা তাঁহারা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেশের লোকদিগকে নাম দিয়াছিলেন শূদ্র, দাস, চণ্ডাল, হীন, ইতর, অন্ত্যজ, পাষণ্ড, দস্যু, তস্কর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পিশাচ। পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী যে সকল কথা বলে, তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ী অথবা ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা বুঝেন না, বুঝিলেও সেসব কথা স্বীকার করেন না; মনে মনে স্বীকার করিলেও তাহা প্রকাশ করেন না। প্রায় দুই শত চল্লিশ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন-দিগের সংখ্যা বোধ হয় দুই লক্ষ হইতে পারে। ধর্ম্মব্যবসায়ী ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইবে, বলা বাহুল্য এই উভয় সংখ্যাই আনুমানিক। তাহার পর দেশের লোক। ১৯৩১ সালে মানুষগণনার তালিকা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ও তাহাদের সংখ্যা দেখা যাইবে। ইংরেজদিগের কর্ত্তৃক খণ্ডীকৃত বাঙ্গালাদেশে মুসল-মানের সংখ্যা শতকরা চুয়ান্ন জন; হিন্দুর সংখ্যা তেতাল্লিশ জন ও অপরাপরের সংখ্যা ৩ জন। এই খণ্ডীকৃত বাঙ্গালাদেশের মোট জন-সংখ্যা ৫১০২৭৩৩৫ জন, তাহার মধ্যে মুসলমান ২৭৮১০১০০, আর হিন্দুর সংখ্যা ২২২১২০৬৯ জন। মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা লিখিতে পড়িতে পারে তাহাদের সংখ্যা :—পুরুষ ১৪০২৩০৫, স্ত্রী ১৯৪১১২; হিন্দুদিগের মধ্যে পুরুষ ২৬২২৭৮১, স্ত্রী ৪৪৬৯১৬ জন।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের বিভাগ ও প্রতি-বিভাগের লোকসংখ্যা বুঝা যাইবে।

বিভাগ		সংখ্যা
আদি কৈবর্ত্ত	...	৩৫২০৭২
বাগ্‌তি	...	৯৮৭৫৭০
বৈদ্য	...	১১০৭৩৯
বৈষ্ণব	...	৩৩৭৭৭১
বারুই	...	১৯৫১৩৯
বাউরী	...	৩৩১২৬৮
ভুঁইমালী	...	৭২৮০৪
ব্রাহ্মণ	..	১৪৪৭০৯১
চামার	...	১৫০৪৫৮
ধোবী	...	২২৯৬৭২
ডোম	...	১৪০০৬৭
গোয়ালা	...	৫৯৯২৮৩
যোগী	...	৩৮৪৬৩৪
কলু ও তেলি	...	২৯৫৩০৬
কামার	...	২৬৫৫৩১
কায়স্থ	...	১৫৫৮৪৭৫
কুমার	...	২৮৯৮১০
মাহিষ্য	...	২৩৮১২৬৬
মুচি	...	৪১৪২২১০
নমঃশূদ্র	...	২০৯৪৯৫৭

বিভাগ		সংখ্যা
নাপিত	...	৪৫১০৬৩
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	...	৬৬৭৭৩১
রাজবংশী	...	১৮০৬৩৯৯
রাজপুত	...	১৫৬৯৭৮
সদ্‌গোপ	...	৫৭১৭৭২
সাঁওতাল	...	৪৩৭৫০২
সাহা	...	৪২০১৯৯
তাঁতী	...	৩৩০৫১৮
তিলি	...	২০৭৮৮৩

এই হইল বাঙ্গালী হিন্দুজাতি। সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ ব্রাহ্মণ বাদ দিলে, সকলেই শূদ্র; তাহাদের মধ্যে একশত পঞ্চাশ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু অস্পৃশ্য। হেমচন্দ্র, বঙ্কিম, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ, ইঁহারা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বাঙ্গালীদের মুখপাত্র ও শিক্ষক; জাতীয়তাজ্ঞান, জাতীয়তাবিকাশ, জাতিগঠন, জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত সমবেত চেষ্টা, ইহাই ছিল ইঁহাদের আশা। দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে, সত্যের নামে, ভগবানের নামে তাঁহারা শিক্ষা দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যশিক্ষিত-সম্প্রদায়দিগের ইহাই হইল সাধনার মন্ত্র, কিন্তু ফলে ইহা দিবাস্বপ্ন রহিয়া গেল।

আমাদের ধ্বংস হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর যাইতে হয় না, ইহার কারণ জাতিভেদ। এই পৈশাচিক প্রথার জন্ম নরকে, সয়তান ইহার পিতা, আর মিথ্যা ইহার মাতা। যেমন সমুদ্র-তীরে পর্ব্বতশ্রেণীতে আঘাত লাগিয়া সমুদ্রতরঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া

যায়, সেইরূপ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সকল চেষ্টা এই নারকীয় প্রথার সংঘর্ষে নষ্ট ও নিষ্ফল হইয়াছে। আমাদের দুর্গতি দেখিয়া অনেক বিদেশীয় লোক দুঃখপ্রকাশ করে, কেহ কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে, কিন্তু তাহারা যখন শোনে যে আমরা শতকরা ষাট জন স্বদেশী স্বধর্ম্মী স্বজাতিকে স্পর্শ করিতে পর্য্যন্ত ঘৃণা বোধ করি, তাহাদের সহানুভূতি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। পলাশী ব্যাপারের সময় ইংলণ্ডের জনসংখ্যা ষাটলক্ষ ছিল, যখন আমেরিকাবাসীরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাহাদের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ ছিল, প্রথম নেপোলিয়ানের সময়ে ফ্রান্সের জনসংখ্যা দুইশত লক্ষের ন্যূন ছিল, আর আমরা অন্যূন দুই শত চল্লিশ লক্ষ বাঙ্গালী নিজেদের সম্পত্তি এবং নিজেদের ভগ্নী, কন্যার সতীত্ব রক্ষা করিতে পারি না। জাতিভেদ ও জাতীয়তা পরস্পরবিরোধী শব্দ। ত্রিকোণ গোলাকার যেমন এক নিরর্থক অসম্ভব কথা, সেইরূপ জাতিভেদের সহিত জাতীয়তা একটি অসম্ভব ও অর্থহীন কথা। যে দেশে জাতীয়তা-জ্ঞান আছে সে দেশে জাতিভেদ থাকে না, আর যে স্থানে জাতিভেদ আছে সেস্থানে জাতীয়তার ভাব সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ কোথাও নাই। এ দুই এক করিবার চেষ্টা করা মনকে চোখঠারা মাত্র, পাগলের প্রলাপ। আজ অন্ততঃ আশী বৎসর বাঙ্গালাদেশে একজাতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে। গত ত্রিশ বৎসরে কত সহস্র হিন্দু নরনারী বালক-বালিকা এই মোহে পড়িয়া আত্মাহুতি দিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণশাসিত বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ কণামাত্র বিচলিত হয় নাই। হিন্দু বাঙ্গালী জাতি ধ্বসিয়া, পচিয়া, গলিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে পৃথিবীতে ইহার অনুরূপ ঘটনা কখন ঘটে নাই, চখের সাম্‌নে একটি

বৃহৎ জাতি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। সকলেই মনে মনে জানি যে আমাদের মধ্যে একতার অভাবে এই কাণ্ড ঘটিতেছে, একতা না হইলে কখন একজাতি হয় না একথা সকলেই জানি, সকলেই বুঝি ও পৃথিবীতে সকল স্থানেই দেখি, কিন্তু এমন ক্ষমতা নাই যে হস্তপ্রসারণ করি। ইটালিদেশে এক প্রকার গাছ জন্মে, তাহাকে হেম্‌লক্ বলে; গরু ছাগলে তাহার পাতা খায়, তাহাতে এক অদ্ভুত ফল হয়, জন্তুগুলির নড়িবার শক্তি থাকে না, কিন্তু যন্ত্রণা-অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে। কসাইরা এই প্রকার জীবন্ত ছাগলের চামড়া ছাড়াইয়া লয়, যন্ত্রণায় তাহাদের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়ে, কিন্তু বিষের প্রভাবে তাহারা পলাইতে পারে না। এমন কি নড়িবার পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষমতা থাকে না, সেই অবস্থাতেই মরিয়া যায়। আমাদেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। সংবাদপত্র খুলিলে একই কথা দেখিতে পাই, হিন্দুদিগের মন্দির ভাঙ্গিতেছে, দেবদেবী ভাঙ্গিতেছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুটিতেছে, হিন্দুর গৃহ ভাঙ্গিতেছে হিন্দুকে প্রহার করিতেছে, হিন্দুকে বধ করিতেছে, হিন্দু স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ করিতেছে, হিন্দু স্ত্রীলোককে গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে; মনে কষ্ট পাই, লজ্জা বোধ করি, আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু প্রতিকারের কথা মুখে আনিতে পর্য্যন্ত সাহস হয় না। দেশের লোকগণনার ফল বাহির হয়, দেখি যে হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা অহিন্দুগণের তুলনায় হ্রাস হইতেছে, যে সকল স্থানে পূর্ব্বে হিন্দু ছিল সে সকল স্থান হইতে হিন্দু লোপ পাইতেছে, একমতে বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে প্রতিদিন একশত করিয়া হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে, মুসলমানদের মতে প্রতিদিন এক সহস্র হিন্দু মুসলমান হয়। অনেক সময়ে এক গ্রামবাসী

সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, বাঙ্গালাদেশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু, খৃষ্টান হইয়াছে এবং খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িতেছে। নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, ধ্বংস, এখন আমরা অনিবার্য্য ভাগ্যলিপি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

অনেকে বলিবেন আমাদের এই দুর্দ্দশা ব্রাহ্মণদিগের জন্য ঘটিয়াছে যে, জাতিভেদ ব্রাহ্মণেরাই সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদেরই স্বার্থের জন্য এই প্রথা রক্ষিত হইয়াছে, যাহাই কেন হউক না, ব্রাহ্মণেরা কোন মতেই হিন্দুদিগের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে দিবেন না।

একথাগুলি সম্পূর্ণ ভুল, ধর্ম্মব্যবসায়ী অথবা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের দেড় সহস্র বৎসর-ব্যাপী অজ্ঞতার ফলে তাহাদের মস্তিষ্ক, শুষ্ক-তর্কের কথা বাদ দিলে, গোময় সদৃশ হইয়া গিয়াছে, কোন প্রকার জ্ঞানের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই। যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী, তাহাদের সংখ্যা এখন দুই লক্ষ হইবে, বাস্তবিক হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে লইয়া এক জাতি গঠন করিবার সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের এমন কোন শক্তি নাই যে, সে চেষ্টা বিফল করিতে পারে। যে জীবনীশক্তিবলে মহারাষ্ট্রীয় ও জাঠদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই শক্তির ফলে বাঙ্গালী হিন্দুজাতি গঠিত হইতে পারে।

প্রকৃত অবস্থাটা কি ? সহস্র বৎসর কিংবা ততোধিক কালব্যাপী বৌদ্ধ এবং অপরাপর অবৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধের ফলে ব্রাহ্মণের যে প্রকার মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল, স্মৃতি' গুলিতে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। সে মানসিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা

হইতে ব্রাহ্মণ আর উঠিতে পারে নাই। বরঞ্চ সময়-প্রভাবে সেই অধঃপতন গভীরতর হয়; এখন বোধ হয় তাহার চরম অবস্থা। বাতুলাশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে কখন কেহ একথা বলে না যে, একশত পঞ্চাশ লক্ষ স্বধর্ম্মী হিন্দুদিগের মধ্যে এমন পাপ-রাশি সঞ্চিত আছে যে, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে সেই পাপ স্পর্শ-কারীর দেহে সংক্রামিত হইবে। সাধারণ বুদ্ধি অথবা লজ্জা অনুভব করিবার লেশমাত্র ক্ষমতা থাকিলে কেহ কখন বলে না যে তাহার পূর্ব্বপুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, স্বয়ং ভগবান্ গর্ভস্থ ব্রাহ্মণ নমস্কার করেন (১০—১৫৩ অঃ অনু), ব্রাহ্মণ শত দোষে অপরাধী হইলেও পূজনীয়, আর ব্রাহ্মণের পদাঘাতচিহ্ন স্বয়ং ভগবান্ নিজবক্ষে ধারণ করেন! শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ নিজে ইহা বিশ্বাস করে ও তাহার শিক্ষার ফলে দেশের লোকও সেই কথা বিশ্বাস করে, ব্রাহ্মণ নিজে অজ্ঞ, আর তাঁহার রাজত্ব অজ্ঞানমধ্যে স্থাপিত।

হিন্দু বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রতিভার অভাব ছিল না, শিক্ষকের অভাব ছিল না, পথপ্রদর্শকের অভাব ছিল না। দেশের জন্য আত্ম-বলিদান করিতে নরনারী, এমন কি, বালকবালিকার পর্য্যন্ত অভাব ছিল না। কিন্তু এই হিন্দু বাঙ্গালী জাতি চক্ষের উপর ধ্বংস পাইতেছে; অকথ্য লাঞ্ছনা, অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ধ্বংস পাইতেছে। যে অবসাদ যে অজ্ঞানতার ফলে ব্রাহ্মণদিগের আজ এই দুর্দ্দশা, সেই অজ্ঞানতা সেই জড়তা হিন্দুদিগের সকল স্তরেই প্রবেশ করিয়াছে, সত্য কথা বলিবার শক্তি নাই; সৎসাহস, সৎচেষ্টা, সমস্তই মনের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের মন অজ্ঞানতায়, অসত্যে পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত, সমাচ্ছন্ন

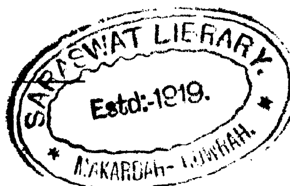
ও পরিষিক্ত হইয়া আছে। চেষ্টা করা দূরে থাক্ প্রতিবাদ করিবারও শক্তি নাই। যখন জাপানদেশের লোকেরা আপনাদের জাতিগঠনের চিন্তা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য ছিল, তাহারা তাহা প্রথমে দূর করে। সামুরাই সম্প্রদায় সে-দেশমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিত। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য তাহারা নিজেদের সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করিল। যখন গুরু গোবিন্দ স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি রক্ষা করিতে শিষ্যসম্প্রদায় গঠিত করিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে রাজপুত-দিগের সিংহ পদবী দিলেন, যাহারা সমাজে সর্ব্বনিম্ন স্থানে এতদিন পড়িয়া ছিল, তাঁহারা শিখ হইয়া এই পদবীতে আরোহণ করিল, যাহারা ব্রাহ্মণ ছিল তাহারা ধর্ম্ম ও দেশের ডাকে নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সকল শিখেদের সহিত রাজপুতদিগের সিংহ উপাধি গ্রহণ করিল। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে মনের বল কোথায়?

যাহাদের মন অজ্ঞানতায় ও অসত্যে পরিপুষ্ট তাহাদের মানসিক বল থাকা সম্ভব নহে। আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি? পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যাঁহাদিগকে আমরা গুরু ও শিক্ষক বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় অন্য জাতি ও অন্য দেশের লোকেদের তুলনায় নিজেদের প্রকৃত অবস্থা কিছু বুঝিতে পারিয়াছে, যাহা বুঝিয়াছে তাহাতে জন কতক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু ধীর, সংযতভাবে নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিতে, চিন্তা করিয়া সেই পথ আবিষ্কার করিতে ও পথনির্ণয় করিয়া সেই পথ অনুসরণ করিতে শক্তি এখনও আমাদের জন্মে

নাই। আমরা একটা রাক্ষসের প্রভাবে অবশ হইয়া আছি ; এক পদ অগ্রসর হইবার আমাদের শক্তি নাই। সেই রাক্ষসের নাম অজ্ঞতা।

লিখিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ হয় যে আমরা হিন্দু-মুসলমান একতার নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও আমাদের এমন সাহস জন্মে নাই যে, মুখে বলি সব হিন্দু এক। আমাদের পক্ষে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন অথবা হিন্দু-ইংরেজ প্রশ্ন বিশেষ ভাবিবার সামগ্রী নয়, আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মণশূদ্র-প্রশ্ন অর্থাৎ দুই হাজার বৎসরের বৈদিক-অবৈদিক প্রশ্ন একমাত্র ভাবিবার সামগ্রী—হিন্দুজাতির অস্তিত্ব অথবা লোপ এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে।

সমাপ্ত



নির্ঘণ্ট